ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের
গুরু পরম্পরা

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

"পরম্পরায় এত দীর্ঘবিরতি নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমরা ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব মধ্বাচার্যকে এ জ্ঞান প্রদান করেন। এখানে ব্যাসদেব ও মধ্বাচার্যের মধ্যে কালগত একটি বড় ব্যবধান আছে। কথিত আছে, ব্যাসদেব এখনো এ পৃথিবীতে আছেন এবং তিনি সরাসরি মধ্বাচার্যকে এ জ্ঞান প্রদান করেন।

একইভাবে আমরা ভগবদ্গীতায় দেখতে পাই, যদিও লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে কৃষ্ণ সূর্যদেব বিবস্বানকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং জ্ঞানের প্রবাহের কথা উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই ভগবদ্গীতায় কেবল তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন– বিবস্বান, মনু ও ইক্ষ্বাকু। তাই এ ব্যবধান পরম্পরাক্রমে আগত জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো বিষয় নয়। আমাদের পরম্পরা ধারায় আগত প্রধান প্রধান আচার্যগণকে অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া পরম্পরার বহু শাখা রয়েছে এবং এত শাখা-উপশাখা লিপিবদ্ধ রাখাও সম্ভব নয়। আমরা যে সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত সে সম্প্রদায়ের আচার্যের নির্ধারিত পরম্পরা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।"
(দয়ানন্দকে পত্র, ১২ এপ্রিল, ১৯৬৮)

আকাশে অনেক নক্ষত্র থাকলেও তার মধ্যে কেবল অল্প কিছু নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তার অর্থ এই নয় যে, আর বাকি নক্ষত্রগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। ঠিক তেমনি পরম্পরায় অনেক আচার্য থাকলেও আমরা কেবল কতিপয় আচার্যের নাম পরম্পরার তালিকায় দেখতে পাই। পরম্পরার অনেক আচার্য আবার দীনতাবশত নিজেকে প্রকাশ করেননি। সেকারণেও অনেকের নাম উহ্য রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রী ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের

গুরু পরম্পরা

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের
অনুকম্পিত
শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের
শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী কর্তৃক
সংকলিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায় :
ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক :
শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

গ্রন্থসত্ব :

সংকলন ও সম্পাদনা :
শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী

অনুপ্রেরণায় :
শ্রী পুষ্পশীলা শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী দ্বিজেশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী

সম্পাদনা সহযোগী :
শ্রী উত্তম নরহরি দাস ব্রহ্মচারী
শ্রী পতিতপাবন গুরু দাস ব্রহ্মচারী
অক্ষয় লীলামাধব দাস
সুদর্শন নিমাই দাস

প্রুফ সংশোধন : সুভাষ চন্দ্র রায়
কম্পোজ : সুভাষ দত্ত
পৃষ্ঠাসজ্জা ও বর্ণবিন্যাস : দশরথ রাজবংশী

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি, ১৯ দামোদর ৫২৮ গৌরাব্দ,
৯ কার্তিক ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ২৭ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায় :
ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, ইস্‌কন
৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৯১৪৫৭৩২৯৪ ইমেইল : arsandhane@gmail.com

উৎসর্গ
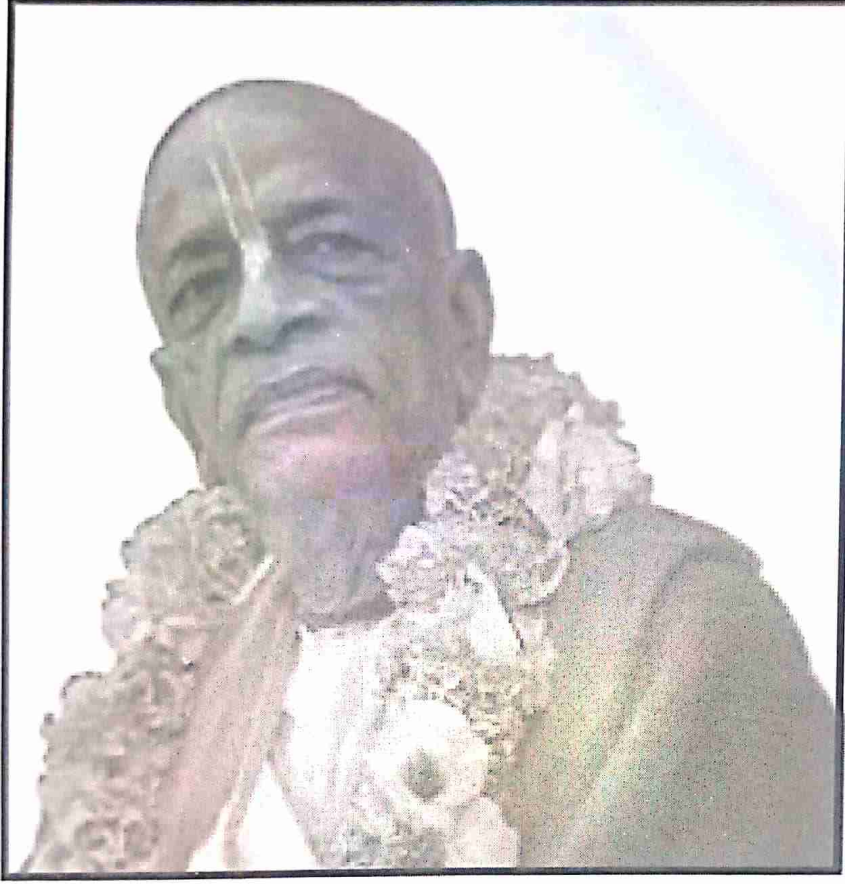
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখাকে
যিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন, মহাপ্রভুর সেই সেনাপতি ভক্ত
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী
প্রভুপাদের করকমলে।

সূচিপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রীল জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি এবং পুরুষোত্তম তীর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বিধায় তাঁদের জীবনী উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।
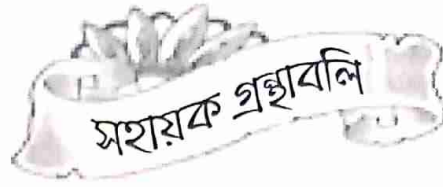
১. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত – শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

২. শ্রীচৈতন্য ভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

৩. শ্রী ভক্তিরত্নাকর – শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর

৪. প্রমেয় রত্নাবলী – শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

৫. গৌরগণোদ্দেশদীপিকা – শ্রী কবিকর্ণপুর

৬. শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক – শ্রী কবিকর্ণপুর

৭. শ্রীচৈতন্য মঙ্গল – শ্রী লোচন দাস ঠাকুর

৮. অমৃত প্রবাহভাষ্য (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) – শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

৯. অনুভাষ্য (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) – শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

১০. শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত – শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

১১. শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ চরিতাবলী – গৌড়ীয় মিশন

১২. চার আচার্যের জীবনী – মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

১৩. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী – মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

১৪. শ্রীমদ্ভাগবত – শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকৃত ভাষ্য

১৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ – শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকৃত ভাষ্য

১৬. গুরুদেব ও শিষ্য – শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

১৭. শ্রীগুরুকৃপা লাভের পন্থা – শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

১৮. প্রভুপাদ – শ্রীল সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী মহারাজ

১৯. ভগবান কে? – শ্রীল ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

২০. শ্রীবৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী – শ্রী তারক ব্রহ্ম দাস

২১. শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বচরিত মাহাত্ম্য – শ্রী তারক ব্রহ্ম দাস

২২. শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান – শ্রী হরিদাস দাস

২৩. Srila Prabhupada Siksamrita

২৪. www.gaudiyahistory.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীল বদ্রীনারায়ণ দাস গোস্বামী মহারাজ,
শ্রীপাদ বেণুধারী দাস ব্রহ্মচারী,
শ্রী দ্বিজমণি গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী,
শ্রী তেজোগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণমুরারি দাস,
রসিক কানাই দাস, অনাদি আনন্দ নিতাই দাস
তাপস বিশ্বাস, সুমন বিশ্বাস, সুদীপ দাস ও রঞ্জন পাল।
এছাড়াও যে সকল ভক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের
প্রতিও আমি একান্ত কৃতজ্ঞ।
সকল ভক্তকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা
জ্ঞাপন করছি এবং প্রার্থনা করছি
পূর্বতন আচার্যগণ যেন তাঁদের
প্রেমভক্তি দান করেন।

–প্রকাশক

মুখবন্ধ

কোনো বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য যেমন সে বিষয়ে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির শিক্ষা ব্যতিরেকে তা যথাযথভাবে লাভ করা যায় না, তেমনি পরমার্থজ্ঞান লাভ করার জন্যও পরমার্থতত্ত্ববেত্তা পুরুষের আশ্রয় গ্রহণের বিকল্প নেই। সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষই হলেন গুরুদেব। একান্তভাবে আশ্রিত, যথার্থ ও যোগ্য শিষ্যের মধ্যেই এ জ্ঞানের ধারা অক্ষতভাবে প্রবাহিত হয়। যথার্থ শিষ্য পরম্পরায় এভাবেই আদিগুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরমার্থতত্ত্ব-জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা একাধিক ধারা বা পরম্পরার রূপ নিয়েছে। যথার্থ এসব ধারার অন্তর্ভুক্ত আচার্যগণকে নিয়ে গড়ে উঠেছে শুদ্ধ ভাগবত সম্প্রদায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর প্রশিষ্য হিসেবে আমরাও।

শুদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কখনোই পরমার্থজ্ঞান লাভ করা যায় না। ঠিক যেমন উৎস থেকে আগত যথার্থ পরিবাহীর সাথে যুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা বিদ্যুৎ লাভ করতে পারি না। সম্প্রদায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে তাই পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে–

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃকলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথার্থ সম্প্রদায় বা গুরুপরম্পরা থেকে বিযুক্ত, সে যে মন্ত্রই জপ করুক না কেন, তা নিষ্ফল বলে বিবেচিত হয়।

গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান নেমে আসার কথা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় উল্লেখ করেছেন– "*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ,* অর্থাৎ এভাবেই পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত এ পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন।"

তত্ত্ববিদগণের মতে চার শুদ্ধ সম্প্রদায় বর্তমান, যথা : শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও কুমার। এর বাইরে বিভিন্ন সময় যত সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে, তার সবই অপসম্প্রদায়। এসব অপসম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে কেউ কখনো পরমার্থজ্ঞান লাভ করতে পারে না। অথচ তথাকথিত এসব সম্প্রদায়ের আচার্য সেজে ভণ্ড প্রতারকেরা শুদ্ধ সম্প্রদায়েরও নিন্দা করার দুঃসাহস করে। আর এতে যুক্ত হয়ে মানুষ শুধু প্রতারিতই হয় না, বিপথে পরিচালিত হওয়ার ফলে মানবজীবনের লক্ষ্য সাধনের সম্ভাবনাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সে সকল মতকে অবৈষ্ণব মত বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, তাদের উপদেশ ও কার্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদও অপসম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করার সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণসহ কঠোর বাক্যও প্রয়োগ করেছিলেন।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা ছাড়া ভক্তিলাভ ও জড়বন্ধন থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। শুদ্ধ ভক্তগণের দিব্য গুণমহিমার কথা শ্রবণ-কীর্তন করার ফলেই কেবল বদ্ধজীব

সত্যিকার অর্থে পরিশুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং পরিশুদ্ধতা, পরমার্থজ্ঞান ও ভক্তি লাভ করে মানবজীবনকে সত্যিকার অর্থে সফল করার জন্য শুদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণসহ তাঁদের দিব্য চরিতকথা শ্রবণ ও কীর্তন করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমালোচকদের ভুল ব্যাখ্যা আর যুক্তি খণ্ডন করে সর্বসাধারণের কাছে আচার্যগণের জীবনী এবং সে সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্বসমূহ সঠিক ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে এ বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেরও।

এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং একইসাথে ভাগবত পরম্পরার আচার্যগণের দিব্য চরিতকথা শ্রবণ-কীর্তন করে ধন্যাতিধন্য হওয়ার জন্য গুরু-গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ ও আচার্যগণের দীন সেবক হিসেবে আমরা 'ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা' নামক গ্রন্থটি সংকলনের প্রয়াস করেছি মাত্র। এক্ষেত্রে তাঁদের কৃপা-আশীর্বাদই ছিল আমাদের সহায়। এ কাজে যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের যেকোনো পর্যায়ে ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। সেজন্য যেকোনো সজ্জন ব্যক্তির যেকোনো যৌক্তিক পরামর্শ ও মতামত আমরা একান্তভাবে কামনা করছি এবং সেই সাথে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করছি।

সবশেষে, পরম্পরার গুরুত্ব এবং তাতে অধিষ্ঠিত মহান ভাগবতগণের মহিমা প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের কিছুমাত্র কৃপা লাভের পাশাপাশি যদি সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনে গ্রন্থটি ভূমিকা রাখতে পারে, তবেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সফল হয়েছে বলে মনে করব। প্রত্যেকের পারমার্থিক কল্যাণ কামনায় শেষ করছি। 'হরেকৃষ্ণ'।

বৈষ্ণবচরণরেণু প্রার্থী
শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকৃত
পরম্পরা বন্দনা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥
নৃহরি মাধ্ব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়-তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়-ধর্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥

জয়ধর্মদাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তা' হতে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সুরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হৈতে মাধবেন্দ্রপুরী ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌর-মহাপ্রভু ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগজনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণ দাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িত দাস নাম।
তাঁর প্রধান অনুগামী, শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী,
পতিতজনের দয়া ধাম ॥
তাঁ সবার পাদপদ্ম, ভকত-জনের পদ্ম,
সেই মোর একমাত্র ঠাম ॥
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্ট মোর কাম ॥

প্রথম ভাগ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা

উপক্রমণিকা

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন–

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্য দাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণের দাসত্বই জীবের 'স্বরূপ ধর্ম'। কিন্তু জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমানের ফলে জীব এ জড় জগতে পতিত হয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করছে। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যার ফলে মায়া তাঁকে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। এ জড়-জগতে জীব কখনো স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে জাগতিক সুখ ভোগ করে এবং কখনো নরকে অধঃপতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করে। ঠিক যেমন রাজা অপরাধীকে নদীর জলে চুবায় এবং অল্পক্ষণের জন্য জল থেকে তুলে আবার দণ্ড দান করে। মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করে অনিত্য মায়িক সুখে মত্ত হয়ে পরিণামে মায়ার দ্বারা ত্রিতাপ জ্বালায় ক্লিষ্ট হচ্ছে।

এর কারণ হলো জীব তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে মায়ারচিত বিষয়সমূহকেই তার স্বরূপ বলে মনে করছে। আমরা ভগবদ্গীতায় দেখতে পাই যখন অর্জুন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মোহে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ভুলে গিয়েছিল, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেছিলেন–

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ (ভ.গী. ৪/৩৬)

অর্থাৎ "তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকো, তাহলেও এ জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে।" শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন–

"এ জড় জগতকে কখনো অবিদ্যার সমুদ্র আবার কখনো দাবানলের সাথে তুলনা করা হয়। অতি সুদক্ষ সাঁতারুও যেমন সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হতে পারে না, ঠিক তেমনি জড় জগতের যে জীবন সংগ্রাম তা দুরতিক্রমণীয়। মাঝ সমুদ্রে যে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে তার একমাত্র উপায়– যদি কেউ এসে তাকে তুলে নেয়। এ ভবসমুদ্রে আমরাও ঠিক তেমনি হাবুডুবু খাচ্ছি। এখন কেউ যদি কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের সেখান থেকে তুলে নেয়, তাহলেই কেবল আমরা উদ্ধার পেতে পারি। ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ, আমাদের উদ্ধারকারী নৌকা।"

অর্থাৎ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভই জীবের প্রকৃত স্বরূপে স্থিত হওয়ার পন্থা। আর তা কেবল মনুষ্য শরীরেই সম্ভব। কেননা মনুষ্য মস্তিষ্কেই রয়েছে উন্নত বুদ্ধিমত্তা যার দ্বারা সে পরম তত্ত্বকে জানার প্রয়াস করতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোথা থেকে এ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়? এ জ্ঞান লাভের পন্থাই বা কী?

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে– "*শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভগবদারাধনবিধিং*" অর্থাৎ শ্রুতিসমূহ হচ্ছে মানবের মাতা। আমরা যেমন মায়ের কাছ থেকে আমাদের পিতার পরিচয় জানতে পারি, ঠিক তেমনি শ্রুতি বা বৈদিক শাস্ত্ররূপ মাতার মাধ্যমে আমাদের পরম পিতার পরিচয় জানতে পারি।

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত সাহিত্যকর্ম নয় যে, তা ব্যক্তির মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা কল্পনার দ্বারা রচিত হয়েছে। বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য ভগবান স্বয়ং এ সকল শাস্ত্র প্রবর্তন করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান ব্রহ্মাকে প্রথম এ জ্ঞান দান করেন। বৈদিক শাস্ত্রে কোনো ভ্রান্ত মতবাদ দেয়া হয়নি। আমরা শাস্ত্রকে তখনই প্রামাণিক বলতে পারি যখন তাতে লিখিত সকল বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন–

ডালটন মাত্র দু'শ বছর আগে পরমাণু আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে এ তথ্য দেয়া হয়েছে যে, পরমাণু অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণা। ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫/৩৫) বলা হয়েছে যে, শৃঙ্খলাযুক্ত জড় পদার্থের বিন্যাসে বৃহত্তম ইউনিট বা একক হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরমাণু। আইনস্টাইন কিছুকাল আগে স্থান-কালের আপেক্ষিকতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন; কিন্তু ভাগবত পুরাণে কুকুদ্মি মুনির আপেক্ষিকতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। বৈদিকশাস্ত্রে বিভিন্ন অবতারসমূহ বা মহাপুরুষগণের বিশদ বিবরণসহ তাঁদের আবির্ভাবের নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এমন কয়েকজনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে– বুদ্ধদেব (১/৩/২৪), শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (১১/৫/৩২), চাণক্য (১২/১/১১) প্রমুখ।

জ্ঞান লাভের পন্থা

জ্ঞান লাভের দুটি পন্থা– ১. আরোহ পন্থা, ২. অবরোহ পন্থা। আরোহ পন্থা হচ্ছে কোনো প্রামাণিক অস্তিত্বের স্বীকার না করে নিজের প্রচেষ্টায় অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা। যেমন: পিতার পরিচয় মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা না করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা। আর অবরোহ পন্থা হচ্ছে প্রামাণিক অস্তিত্ব স্বীকার করে শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা। যেমন: পিতার পরিচয় মাকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে জানা।

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অপূর্ণ, তাই এর দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরম সত্যকে জানা সম্ভব নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতীত কোনো জ্ঞান লাভ করতে হলে অবশ্যই প্রামাণিক উৎস থেকে শ্রবণ অর্থাৎ অবরোহ পন্থার অনুসরণ করতে হবে। বৈদিক জ্ঞান এভাবেই গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় শ্রৌত পন্থায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই অবরোহ পন্থায় গুরু পরম্পরা ধারায় আগত জ্ঞান লাভ করা উচিত।

গুরুতত্ত্ব

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে (৭ম অধ্যায়) বলা হয়েছে–

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবের অন্ধকার নাশ করে আলোকরূপ জ্ঞান প্রদান করেন, তিনিই গুরু। গুরুদেব ভগবানের কৃপাশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। জীবের প্রতি বিশেষ করুণার ফলে ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। গুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধ জ্ঞান দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩/২১) বলা হয়েছে–

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

অর্থাৎ "হে অর্জুন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ সম্পূর্ণরূপে জানে না।"

কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালের সমস্ত কিছুই অবগত, কিন্তু কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানেন না। শুধু তাই নয়, তাঁকে লাভ করার জন্য সাধ্য ও সাধন বিষয়েও তিনি ছাড়া পূর্ণরূপে অন্য কেউই জানেন না। সুতরাং, সমস্ত জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করার জন্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তগণকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হন।

কখনো স্বয়ং ভগবান, কখনো তাঁর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ আবার কখনো কোনো জীবের মধ্যে তাঁর শক্তির আবেশ ঘটিয়ে তিনি গুরুরূপে বদ্ধজীবদের শিক্ষা প্রদান করেন। আবার তিনি চৈত্যগুরুরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে থেকে জীবকে পরম তত্ত্ব প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৯/৬) বলা হয়েছে –

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

অর্থাৎ "হে ঈশ্বর, তুমি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে দেহধারী জীবের অশুভ অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়-বাসনা নাশ করে তার গতি প্রদান করো। অতএব তোমাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কবিগণ কল্পান্তকাল তোমার সেবায় নিযুক্ত থেকেও তোমার উপকারের কথা স্মরণ করে কিছুতেই ঋণমুক্ত হতে পারেন না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ২২/৪৭) বলা হয়েছে–

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥

"চৈত্যগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যখন কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করেন, যেন তিনি স্বয়ং তাকে বাইরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেন।"

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥

–চৈ.চ. আদি ১/৫৮

সুতরাং বোঝা গেল যে, অন্তর্যামী গুরুর সাথে বাহ্যত সাক্ষাৎ হয় না; তিনি অন্তরে থেকে কেবল প্রেরণার দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'মহান্তস্বরূপে' অর্থাৎ সাধু-সজ্জন বা ভক্তগণের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে থাকেন– প্রকারান্তরে তিনি কৃষ্ণই।

গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

আমরা সরাসরি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না। কেবল ভগবদ্ভক্তের কৃপার মাধ্যমেই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব। আবার, বৈদিক শাস্ত্রে যেসকল জ্ঞান রয়েছে তা-ও আমাদের সীমিত মস্তিষ্কের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে যিনি আমাদের শাস্ত্রের গূঢ় অর্থসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবেন। ঠিক যেমন গ্রন্থে অনেক বিদ্যা থাকলেও অভিজ্ঞ শিক্ষকের আনুগত্যে এ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কেবল পারমার্থিক জ্ঞান বা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নয়; এ জগতের যেকোনো জ্ঞান অর্জন করতে গেলেই আমাদের গুরু গ্রহণ করতে হয়।

আপনি যদি সঙ্গীত, নৃত্যকলা, অ্যাথলেটিক্স কিংবা কারাতেও শিখতে চান, তখনও আপনি কোনো কোচের তত্ত্বাবধানে সেগুলোর শিক্ষালাভ করে থাকেন। এভাবে আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে শিক্ষাই গ্রহণ করি না কেন, আমরা কোনো না কোনো গুরু গ্রহণ করে থাকি।

এমনকি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি সান্দীপনি মুনিকে গুরুরূপে বরণ করার মাধ্যমে গুরু গ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য বশিষ্ঠ মুনিকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। আবার, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও গুরু গ্রহণের গুরুত্ব স্থাপন করার জন্য ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সকল জ্ঞানের পরম উৎস পরমপুরুষ ভগবানও গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য স্বয়ং গুরু গ্রহণ করে থাকেন।

গুরুদেবের যোগ্যতা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রামাণিক উৎস কীভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কারা এ বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিক উৎস– সে সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের শাস্ত্রের শরণাগত হতে হবে। অর্থাৎ শাস্ত্রে গুরুদেবের যেসকল যোগ্যতার বর্ণনা করা হয়েছে, তা কারো থাকলে আমরা তাঁকে প্রামাণিক উৎস হিসেবে স্বীকার করে নিতে পারি।

যিনি স্বয়ং ভগবান হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভগবৎ প্রদত্ত

ব্রহ্মা যখন ধ্যানমগ্ন হলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁর কর্ণে বৈদিক মন্ত্র ওঙ্কাররূপে প্রবিষ্ট হল। এভাবে ব্রহ্মা পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন এবং সমস্ত জীবের প্রথম গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। (পৃষ্ঠা-৪৯)

বদরিকাশ্রমে মধ্বাচার্য সরাসরি ব্যাসদেবের কাছ থেকে সমস্ত বেদ, বেদান্তসূত্র, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য, সিদ্ধান্তসার সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করেন। (পৃষ্ঠা-১৫)

শ্রীশ্রী ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়

গুরু পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ · শ্রীব্রহ্মা · শ্রীনারদ · শ্রীব্যাসদেব
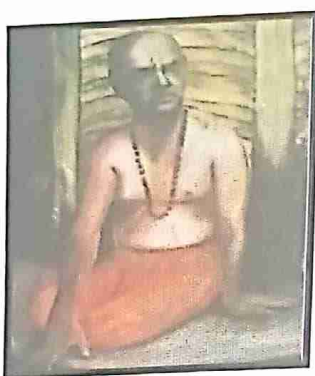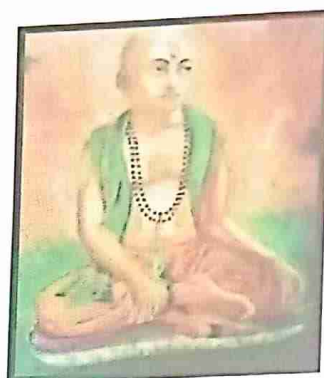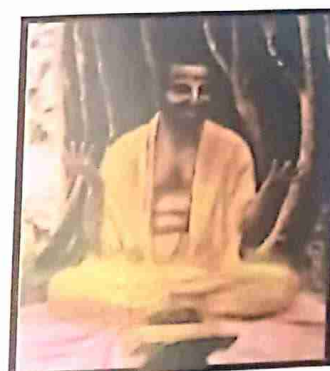
শ্রীঅক্ষোভ্য · শ্রীজয়তীর্থ · শ্রীজ্ঞানসিন্ধু · শ্রীদয়ানিধি
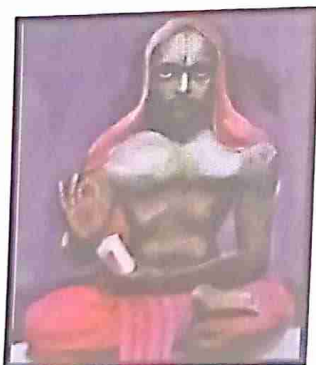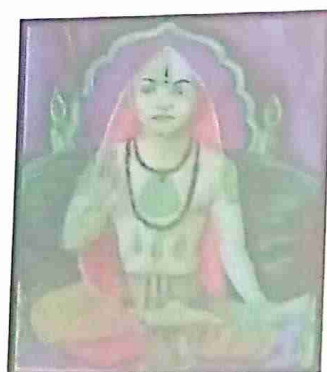
শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ · শ্রীব্যাসতীর্থ · শ্রীলক্ষ্মীপতি · শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
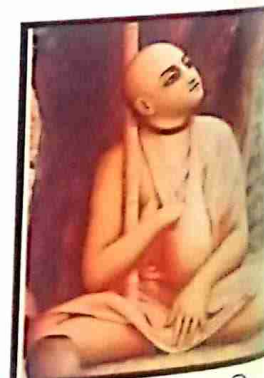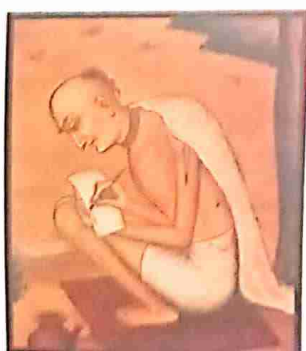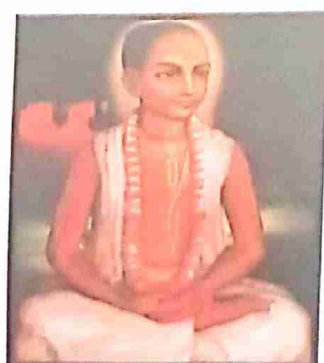
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী · শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর · শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর · শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবা
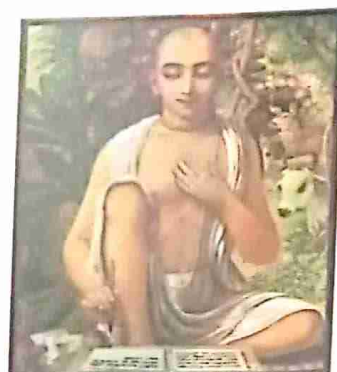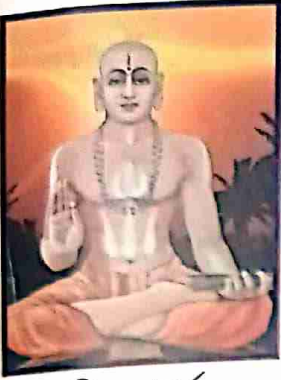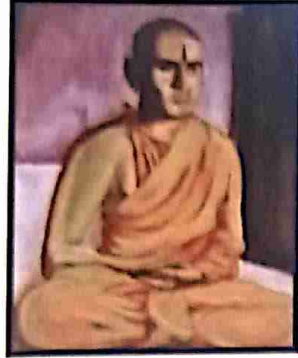
শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীপদ্মনাভ শ্রীনৃহরি শ্রীমাধব
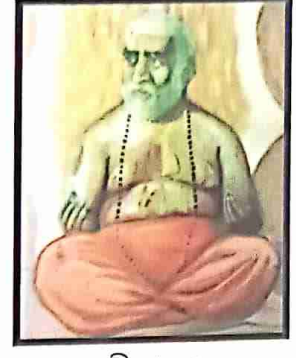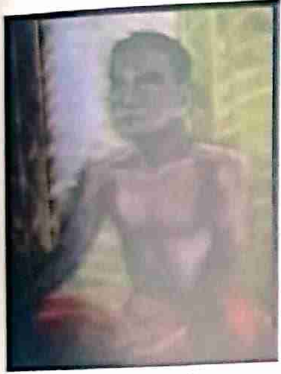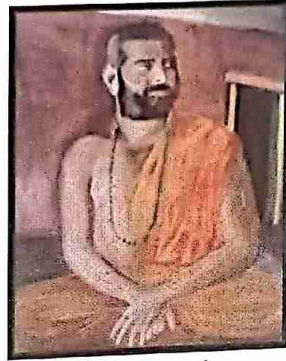
শ্রীবিদ্যানিধি শ্রীরাজেন্দ্র শ্রীজয়ধর্ম শ্রীপুরুষোত্তম
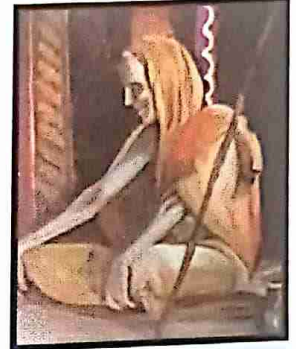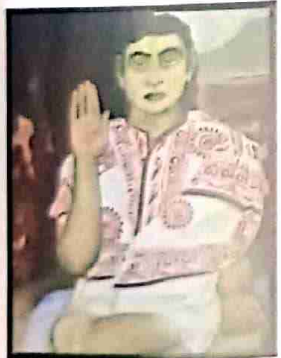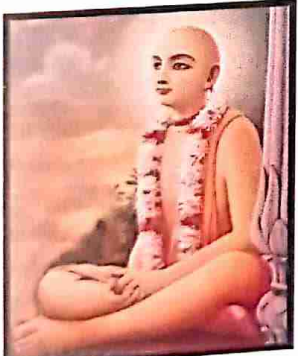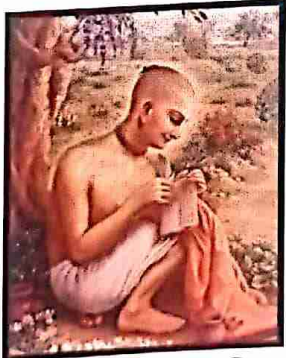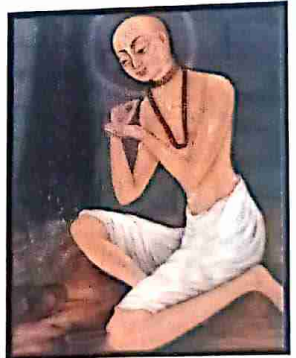
শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
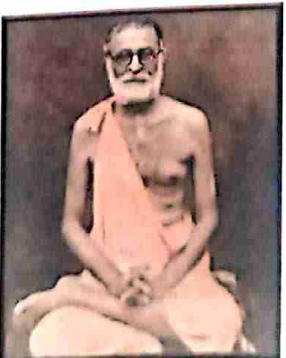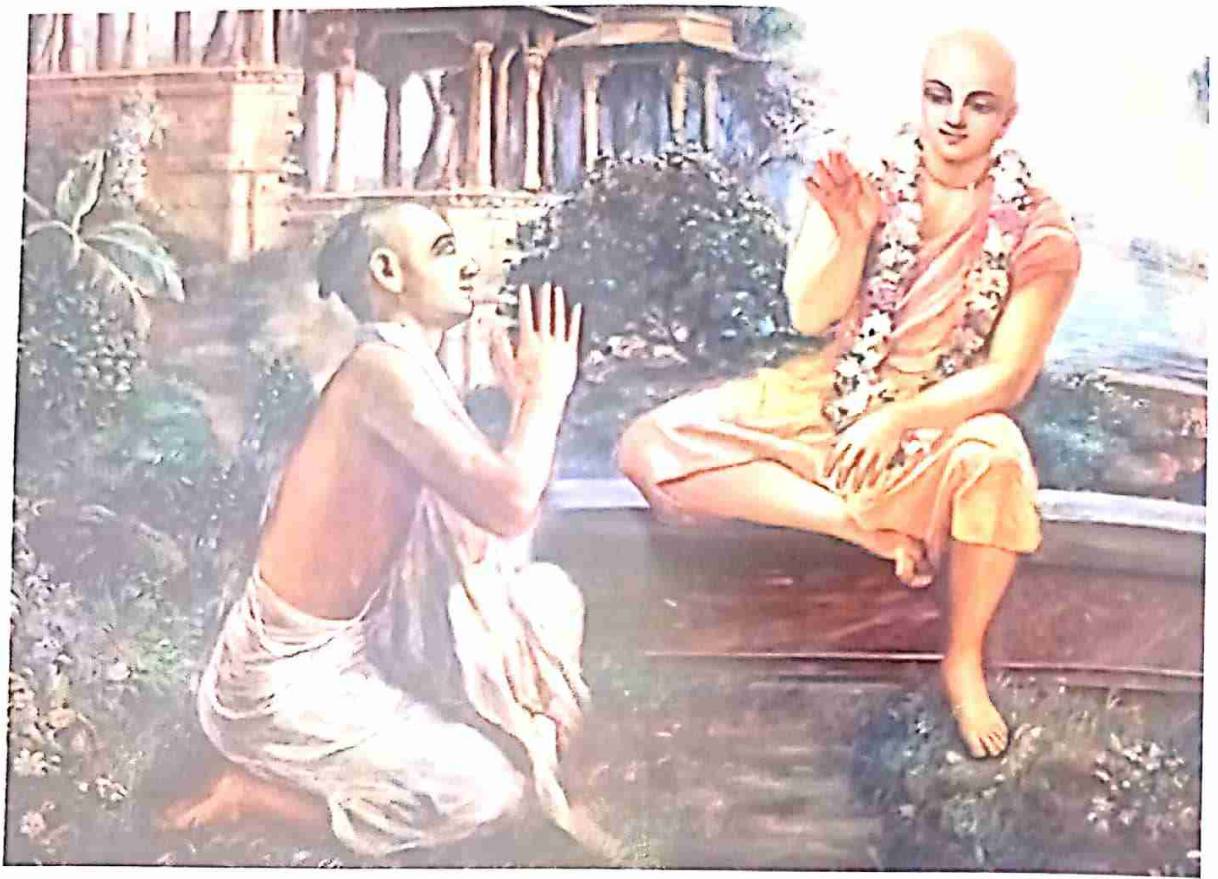
মহাপ্রভু বললেন– "শ্রীরূপের প্রতি আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য তাঁর মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে তাঁকে আমি আলিঙ্গন করেছি। (পৃষ্ঠা-২২)

বৃন্দাবনে রাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ আবির্ভূত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদকে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেন। (পৃষ্ঠা-৩০৯)

পরম তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করে সে জ্ঞান কোনোরকম পরিবর্তন না করে অভ্রান্তভাবে প্রদান করেন তিনিই যথার্থ গুরু। তিনি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব– বদ্ধজীবের এ চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩/২১) বলা হয়েছে–

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

অতএব কেউ যদি আন্তরিকভাবে প্রকৃত জ্ঞান লাভের অভিলাষ করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি গভীরভাবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং অন্যদেরও সেসব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদনে সক্ষম। যাঁরা জড় সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছেন, সে ধরনের মহান ব্যক্তিদেরই যথার্থ গুরু বা সদ্‌গুরু বলে জানতে হবে।

গুরুদেব অবশ্যই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহের সুগভীর তত্ত্ববোধ বা উপলব্ধি অর্জন করেছেন। কেননা, তিনি পরমতত্ত্ব বা পরমসত্য সম্বন্ধে শ্রবণ করেছেন, তাঁকে বুঝতে পেরেছেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভজনে ব্রতী হবেন। তিনি শাস্ত্রোক্তির দ্বারা এবং বর্তমান ও পূর্বতন সত্যদ্রষ্টা মহাজনগণের উক্তির দ্বারা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের সত্যতা, প্রামাণিকতা প্রতিপাদন করতে সমর্থ হবেন।

তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো অবশ্যই তাঁর বশীভূত থাকবে, তিনি হবেন সংযতেন্দ্রিয়। যদি গুরুদেবের ইন্দ্রিয়গুলো অসংযত থাকে এবং তিনি যদি তাঁর শিষ্যদের ইন্দ্রিয় সংযমের শিক্ষা না দেন, তাহলে তিনি গুরু হবার যোগ্য নন।

ষোড়শ শতাব্দীর এক বৈদিক দার্শনিক এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অগ্রগণ্য শিষ্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে সদ্‌গুরুদেবের বিশেষ ছয়টি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন– "যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ– এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।" তিনি হবেন সত্যনিষ্ঠ, সকলের সুহৃদ, অনিন্দুক এবং সকল জীবের কল্যাণকামী। তিনি নিজে তাঁর ইন্দ্রিয়জ জল্পনা দ্বারা কোনোরকম মনোধর্মী তত্ত্ব উদ্ভাবন করবেন না; তিনি কেবল তাঁর গুরুদেবের নিকট হতে প্রাপ্ত বাণী যথাযথ ও নির্ভেজালভাবে উপস্থাপন করবেন।

প্রখর বুদ্ধিমত্তা থাকলেও যদি কারো চরিত্র সন্দেহজনক হয়, তিনি যদি স্বার্থ-বাসনাযুক্ত ও ভোগলিপ্সু হন, তিনি গুরুপদবাচ্য নন। যেহেতু ভগবানই গুরু-পরম্পরার আদি উৎস যিনি পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে সমর্থ এবং যেহেতু ভগবান হতে পরম্পরা ধারায় ঐ একই জ্ঞান অবিকৃতভাবে প্রবাহিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায়, সেজন্য সে জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সেই পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের জীবন সার্থক করতে পারি। সভ্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এরূপ প্রামাণিক ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা, তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করা এবং এভাবে জীবনকে সফল করে তোলা। ঠিক যেমন আলো জ্বালানো মাত্রই ঘন অন্ধকার ঘর নিমেষেই আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি

দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃপ্রভার দ্বারা অজ্ঞান-তমসাবৃত হৃদয়-কন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরীক্ষা ও সামঞ্জস্যবিধানের ব্যবস্থা রয়েছে– গুরু-সাধু-শাস্ত্র। গুরুদেবের শিক্ষা অবশ্যই সাধুর (অর্থাৎ গুরু-পরম্পরার পূর্বতন আচার্যগণের) সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্রানুগ হতে হবে। কেউ তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে যে জ্ঞান শ্রবণ করেছেন, তিনি তার প্রামাণিকতা যাচাই করতে পারেন– ঐ তত্ত্ব পরম্পরা ধারার অন্যান্য পূর্বতন আচার্যবৃন্দ প্রদত্ত জ্ঞানের সঙ্গে এবং শাস্ত্রধৃত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসামঞ্জস্য কি না, তা বিচারের মাধ্যমে।

গুরু পরম্পরা

বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান কৃষ্ণ থেকে অবরোহ পন্থায় গুরুদেবের মাধ্যমে শিষ্যের কাছে প্রবাহিত হয়। এভাবে জ্ঞান প্রবাহের পর্যায়ক্রমিক শৃঙ্খলকে বলা হয় গুরু-পরম্পরা বা গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারা। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন–

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এভাবে পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত এ পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।" এভাবে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কেবল শিষ্যের নিজ গুরুদেবের সঙ্গেই নয়; তার সম্পর্ক তার গুরুদেবের গুরু, তাঁর গুরুদেব, তাঁর গুরুদেব– এভাবে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাক্রমে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে। শ্রীল প্রভুপাদ গুরু পরম্পরা প্রসঙ্গে বলেছেন– "যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় পরম্পরা; অর্থাৎ যে জ্ঞান শ্রদ্ধা সমন্বিত শরণাগতির মাধ্যমে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অবরোহ পন্থায় লাভ হয়। পরম্পরা ধারায় মহান আচার্যদের চিন্তাধারা গ্রহণ করা মানসিক জল্পনা-কল্পনার পন্থা থেকে অনেক সহজ। পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ স্বীকার করে তা অনুসরণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তখন ভগবদুপলব্ধি এবং আত্মোপলব্ধি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এ সহজ পন্থাটি অনুসরণ করার ফলে জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অনায়াসে দুঃখদুর্দশাপূর্ণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জড়-জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত জীব বা পরমহংসদের সঙ্গ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, আচার্যদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে জড়-জগতের সমস্ত কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকা যায় এবং এভাবে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়ে জীবন সার্থক করা যায়।"

এভাবেই বৈদিক জ্ঞান যুগ যুগ ধরে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে–

কয়েকজন ব্যক্তি একটি আমগাছে উঠে আম পেড়ে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের দিচ্ছেন। কিন্তু আমগুলো সুপক্ক ও সুকোমল হওয়ায় মাটিতে ফেললে নষ্ট হয়ে যাবে, তাই গাছে ওঠা ব্যক্তিদের মধ্যে সরাসরি হস্তান্তরের মাধ্যমে একে একে তা নিচে থাকা ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করা হচ্ছে। তারা আবার তা সরাসরি অন্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করছে।

বৈদিক জ্ঞান হলো সুপক্ক আম্রফলের মতো; কোনো প্রকার সংযোজন-বিয়োজন

ছাড়াই যত্ন সহকারে তা সরাসরি বিভিন্ন শাখায় অবস্থানরত গুরুবর্গের হাতে অর্পিত হতে হতে ভক্তগণের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। যাঁরা সে জ্ঞান গ্রহণ করছেন, তাঁরা আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা সাধারণের মাঝে বিতরণ করছেন। সেক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা থাকলেও তা একই গাছের ফল। যেসকল ভাগ্যবান ব্যক্তি এ ধারার সাথে যুক্ত, তাঁরাই এ সুপক্ব ফল আস্বাদন করতে পারবেন। বৈদিক জ্ঞান অবিকৃত ও ধারাবাহিকভাবে অর্পণের এ শৃঙ্খলকেই বলে পরম্পরা। আর ভিন্ন ভিন্ন শাখা থেকে যে পরম্পরা নেমে এসেছে, তাকে বলা হয় সম্প্রদায়। সুতরাং বৈদিক জ্ঞান লাভ করার জন্য অবশ্যই পরম্পরায় অধিষ্ঠিত হতে হবে।

সম্প্রদায়

গুরুদেব যে বিশেষ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলা হয় তার সম্প্রদায়। পদ্মপুরাণে সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে–

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
অতঃকলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক বৈষ্ণব ক্ষিতিপাবন।
চত্বারস্তে কলৌ ভব্য হি উৎকলে পুরুষোত্তম ॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি যথার্থ সম্প্রদায় বা গুরু-পরম্পরা হতে বিযুক্ত, সে যে মন্ত্রই জপ করুক না কেন, তা নিষ্ফল হয়। অতএব কলিযুগে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবির্ভূত হবেন। জগতের পবিত্রতা সম্পাদনকারী বিষ্ণুভক্ত শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক– এই কলিযুগে চারটি সম্প্রদায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অথবা উৎকল দেশ পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র হতে আবির্ভূত হবে।" পদ্মপুরাণের এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের অবশ্যই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে থাকা উচিত।

ভগবান বিভিন্ন সময় তাঁর বিভিন্ন ভক্তকে আবির্ভূত করিয়ে একেক সম্প্রদায়ের আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত করে বৈদিক জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত করেন। একেকটি সম্প্রদায়ে একেকজন মুখ্য আচার্য থাকেন, যাঁর শিক্ষা, আদর্শ বা নীতিসমূহ তাঁর অধস্তন বা উত্তরসূরিরা পালন করে থাকেন। পদ্মপুরাণের উপরোক্ত শ্লোকটির পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে–

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামীনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥

অর্থাৎ "উক্ত চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, বিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, বিষ্ণুসখা রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং বিষ্ণুপৌত্র চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নিম্বার্ককে নিজ নিজ সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে স্বীকার করবেন।" এ চার সম্প্রদায়-আচার্যের মাধ্যমে কলিযুগে বৈদিক জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে। যথা :

১. রামানুজাচার্য (শ্রী সম্প্রদায়)
২. মধ্বাচার্য (ব্রহ্ম সম্প্রদায়)
৩. বিষ্ণুস্বামী (রুদ্র সম্প্রদায়)
৪. নিম্বার্কাচার্য (কুমার সম্প্রদায়)

এ চার সম্প্রদায় হচ্ছে ভগবৎপ্রদত্ত বৈদিক জ্ঞান বিতরণের অনুমোদিত ও প্রামাণিক সংস্থা, যেখান থেকে নির্ভেজাল ও অবিকৃতভাবে সে জ্ঞান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ জ্ঞানের উৎস পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং– যিনি সবরকম ত্রুটি, ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার অতীত। নিম্নে এ চার সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

রামানুজাচার্য : শ্রী সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য শ্রীরামানুজাচার্য আনুমানিক ৯৩৮ শকাব্দে আবির্ভূত হন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এ সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষণীয়। রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশেষ তিলক রয়েছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব ও জগৎ সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। জীব বদ্ধও হতে পারে আবার মুক্তও হতে পারে। জগৎ যদিও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত হয়, তবুও জগৎ সত্য এবং নিত্য। বদ্ধজীবের স্বরূপ অজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় জীব বৈকুণ্ঠে ভগবৎসেবায় যুক্ত থাকে। পার্থক্য কেবল ভগবানের প্রতি শরণাগতির। ঈশ্বর পাঁচ স্বরূপে প্রকাশিত : ১. পর, ২. ব্যূহ, ৩. বিভব, ৪. অন্তর্যামী ও ৫. অর্চাবতার। শ্রীরামানুজাচার্য বেদার্থ সংগ্রহ, বেদান্ত সূত্রের শ্রীভাষ্য, ভগবদ্গীতা ভাষ্য, বেদান্ত সার, বেদান্ত দীপ, নিত্যগ্রন্থ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শ্রী-বৈষ্ণবদের জন্য ৭৪টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ৭০০ সন্ন্যাসী, ১২০০০ ব্রহ্মচারী এবং হাজার হাজার গৃহস্থ শিষ্য ছিল।

নিম্বার্ক : কুমার সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য শ্রীনিম্বার্ক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দর্শন প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, তিনি নারদ মুনির শিষ্য এবং তাঁর জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় তিনি নৈমিষারণ্যে অতিবাহিত করেছেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য শ্রুতিকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার করেন। শ্রুতির অনুগত শাস্ত্রও প্রমাণ বলে গৃহীত। চতুঃসন নারদমুনিকে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ প্রদান করেছেন, তা-ই শ্রৌত পরম্পরায় নারদের কাছ থেকে পেয়ে নিম্বার্কাচার্য জগতে প্রচার করেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু থেকে অসদ্বস্তুর উদয় হতে পারে না। বস্তুবিজ্ঞানই সকল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব। তা শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে জানা যায়। কোনো স্থানে দ্বৈত এবং কোনো স্থানে উভয়নিষ্ঠ বাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবল অদ্বৈতবাদ স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্র বিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শাস্ত্রানুসারে গ্রহণীয়।

শ্রীনিম্বার্ক আচার্যের রচনাসমূহের মধ্যে বেদ ও উপনিষদের ভাষ্য, বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, সদাচার প্রকাশ, গীতা ভাষ্য, রহস্য ষোড়শী, কৃষ্ণ স্তব রজ, প্রপন্ন কল্প বল্লী ও প্রাতঃস্মরণ অন্যতম।

বিষ্ণুস্বামী : বিষ্ণুস্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য। তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী অদ্বয়জ্ঞান বা অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অদ্বয়জ্ঞান বিরোধী বিদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হলে সাত্বত আচার্যগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' এবং মায়াবাদীগণের বিদ্ধ মতবাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বলে আখ্যা প্রদান করেন।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মতে, বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য জগৎ, এরা সকলেই বস্তু পদবাচ্য, কেউ বস্তু থেকে পৃথক নয়।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রের আনুগত্যে নৃপঞ্চাস্যের উপাসক। বর্তমানে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সর্বজ্ঞ সূক্তের প্রচারও বিরল। ভাগবত পুরাণের বিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

মধ্বাচার্য : মধ্বাচার্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য। তিনি ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে আবির্ভূত হন। মাধ্ব সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ছিল উড়ুপিতে। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বর, জীব এবং জগৎ পরস্পর ভিন্ন। ঈশ্বর সর্বদাই স্বতন্ত্র, আর জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম ইত্যাদি সবই পরতন্ত্র। এই ভিন্নতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, ২. জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ, ৩. ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ, ৪. জীবে জড়ে ভেদ, ৫. জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ। যদিও জগৎ কখনো ব্যক্ত আবার কখনো অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তবুও এ পাঁচ প্রকার ভেদ সত্য। জীবসকলকেও আবার গুণের ভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে– সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

সর্বমূল বলে কথিত মধ্বাচার্যের ৩৭টি গ্রন্থ চার ভাগে বিভক্ত– ১. প্রস্থান ত্রয়, ২. দশ প্রকরণ, ৩. স্মৃতি প্রস্থান, ৪. রীতিনীতি এবং সন্ন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতাবলি।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা

চারটি সম্প্রদায়ের দর্শন বা জ্ঞান আবার সেই সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণের দ্বারা প্রবাহিত হচ্ছে। গুরু পরম্পরার এ অব্যাহত ধারায় মধ্বাচার্য হতে যে পরম্পরা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তা বর্তমানে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলে পরিচিত।

শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাখা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', 'প্রমেয় রত্নাবলী' ও শ্রী গোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ভক্তিরত্নাকরেও তার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীমাধ্ব-শাখা সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে–

"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ। তস্য শিষ্যো হভবৎ পদ্মনাভাচার্য মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যেহভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মাহনিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্মস্য শিষ্যোহভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্র যদ্ধর্মোহয়ং প্রবর্তিতঃ। তস্য শিষ্যোহভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ ॥ কলয়ামস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥"

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 'কপিল শিক্ষামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন–

"গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করি। এ গুরুশিষ্য পরম্পরা, অর্থাৎ বৈধ সম্প্রদায় চারটি; যথা : ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, লক্ষ্মীদেবী থেকে শ্রী-সম্প্রদায়, কুমার থেকে কুমার-সম্প্রদায় এবং রুদ্র থেকে রুদ্র-সম্প্রদায়। আজকাল মাধ্ব-সম্প্রদায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, আর আমরা মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের মূল সম্প্রদায় মধ্বাচার্য থেকে আগত। আমাদের এ সম্প্রদায়ে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ছিলেন এবং ছিলেন তাঁর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। এভাবে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরা পেয়েছি। তাই আমাদের সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে অভিহিত। আমরা মনগড়া কৃত্রিম এক সম্প্রদায় তৈরি করেছি তা নয়, পক্ষান্তরে আমাদের এ সম্প্রদায় ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত।"

ব্রহ্মা থেকে বৈদিক জ্ঞান যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছে তা ব্রহ্ম সম্প্রদায় বলে পরিচিত। সৃষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মাকে এ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, ব্রহ্মা তা নারদ মুনিকে প্রদান করেন এবং নারদ মুনি ব্যাসদেবকে প্রদান করেন। এভাবে এ জ্ঞান পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়

মধ্বাচার্য থেকে যে পরম্পরা প্রবাহিত হয়েছে তা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাই মাধ্ব-সম্প্রদায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্বকারী সম্প্রদায়। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্যাসদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে। কিন্তু মধ্বাচার্য আবির্ভূত হয়েছেন ১০৪০ শকাব্দে। তাহলে কীভাবে মধ্বাচার্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

প্রকৃতপক্ষে, মধ্বাচার্য কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। মধ্বাচার্যের আবির্ভাব প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্মে ভীষ্মদেব পঞ্চপাণ্ডবকে বলেছিলেন যে, কলিযুগ শুরুর চারহাজার বছর পর পাণ্ডবগণের পুনরায় জগতে আবির্ভাব হবে। ভীষ্মের এ উক্তি অবলম্বনে ভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ে দেখা যায়–

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎসরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনঃ বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহি ॥

অর্থাৎ কলিযুগের চারহাজার তিনশত (৪৩০০) বছর অতিক্রান্ত হলে, পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতনুরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে দৈত্যকর্তৃক আচ্ছাদিত বিষ্ণুতত্ত্ব প্রচার করবেন। এ উক্তি অনুসারে ভীমসেনই মধ্বাচার্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন। তার একটি হচ্ছে ব্যাসদেব কর্তৃক সরাসরি বৈদিক জ্ঞান লাভ। মধ্বাচার্যের জীবনীতে বর্ণনা করা হয়েছে–

"কতিপয় শিষ্যপরিবৃত হয়ে শ্রীমধ্বাচার্য বদরিকাশ্রমের নিকটবর্তী একটি প্রদেশে এসে শিষ্যগণের কাছে নিজকৃত গীতাভাষ্য উপদেশ করতে লাগলেন। তখন শিষ্যগণ দেখলেন, আকাশমার্গে একটি অপূর্ব তেজপুঞ্জ বিচরণ করতে করতে শ্রীমধ্বাচার্যের মুখজ্যোতির সাথে

মিলিত হলো। মধ্বাচার্য বুঝতে পারলেন ব্যাসদেবই তাঁকে বদরিকাশ্রমে আহ্বান করেছেন। তারপর তিনি একাকী ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বেদ, বেদান্তসূত্র, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য, সিদ্ধান্তসার সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করলেন। তারপর তিনি নর-নারায়ণ আশ্রমে নারায়ণ দর্শন করে ব্যাসদেব ও নর-নারায়ণের আজ্ঞায় পুনরায় শিষ্যদের কাছে ফিরে গেলেন।"

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধ্বাচার্য সরাসরি ব্যাসদেবের কাছ থেকেই পরম্পরাক্রমে বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মধ্বাচার্যই হলেন ব্রহ্ম-পরম্পরার প্রতিনিধি। তাঁর মাধ্যমেই ভগবান গুরু পরম্পরায় নেমে আসা বৈদিক জ্ঞান ব্যাসদেবের পর পুনরায় জগতে প্রচার করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"বর্তমান মাধ্ব সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর আমরা মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের মূল সম্প্রদায় মধ্বাচার্য থেকে উদ্ভূত।" এ কারণে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের নাম শ্রীমধ্বাচার্যের নামানুসারে ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়।

ব্রহ্ম-মাধ্ব থেকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়

শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শাখার কথা 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', 'প্রমেয় রত্নাবলী' ও গোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৬/৪২, তাৎপর্য) শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন– "শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দুজন প্রধান শিষ্য হলেন শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এ সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ তত্ত্ব গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ও প্রমেয়-রত্নাবলী আদি প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। গোপাল গুরু গোস্বামীও তা স্বীকার করেছেন। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (শ্লোক-২২) স্পষ্টভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরম্পরার বর্ণনা করে বলা হয়েছে– "ব্রহ্মা পরব্যোমনাথ শ্রীবিষ্ণুর শিষ্য। তাঁর শিষ্য নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব এবং ব্যাসদেবের শিষ্য শুকদেব গোস্বামী ও মধ্বাচার্য। পদ্মনাভ মধ্বাচার্যের শিষ্য এবং নরহরি পদ্মনাভ আচার্যের শিষ্য। মাধব হচ্ছেন নরহরির শিষ্য, অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্য এবং জয়তীর্থ অক্ষোভ্যের শিষ্য। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং তাঁর শিষ্য দয়ানিধি। দয়ানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি এবং রাজেন্দ্র বিদ্যানিধির শিষ্য। জয়ধর্ম রাজেন্দ্রের শিষ্য। পুরুষোত্তম জয়ধর্মের শিষ্য। লক্ষ্মীপতি ব্যাসতীর্থের শিষ্য, ব্যাসতীর্থ পুরুষোত্তমের শিষ্য। আর মাধবেন্দ্রপুরী হলেন লক্ষ্মীপতির শিষ্য।" শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য, পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, রঙ্গপুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রঘুপতি উপাধ্যায় প্রমুখ (শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী)।

সুতরাং মাধবেন্দ্রপুরী ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লক্ষীপতির শিষ্য। আর মাধবেন্দপুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। আর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করে লীলাবিলাস করার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে জগৎগুরুরূপে জগতে প্রেমভক্তির শিক্ষা প্রদান করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমভক্তির প্রচার করলেও মাধবেন্দ্রপুরীই ছিলেন এ ব্রহ্মা-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রেমভক্তির প্রথম অঙ্কুর। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন– "শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর প্রশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে এর পূর্বে প্রেমভক্তির কোনো লক্ষণ ছিল না। মাধবেন্দ্রপুরী রচিত 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকে মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমতত্ত্ব বীজরূপে ছিল।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন– "শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। এর পূর্বে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার রসাত্মিকা ভক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।"

অর্থাৎ মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্বে মাধ্ব সম্প্রদায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্মের শিক্ষা ছিল না। সে সূত্রে মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্যমেই গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্রহ্মা-মাধ্ব সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত। তাই মহাপ্রভু প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মা-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়।

ব্রহ্মা-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে রূপানুগ ধারা

মহাপ্রভুর পর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্য হলেন শ্রীল রূপ গোস্বামী। শ্রীল রূপ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর। নরোত্তম দাস ঠাকুরের পরম্পরার চতুর্থ অধঃস্তন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পরে উদ্ধব দাস, তাঁর অনুগত শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি (সূর্যকুণ্ডে 'সিদ্ধবাবাজি' নামে প্রসিদ্ধ)। শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজের পারমহংসবেশ-শিষ্য হলেন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন– "ভাষ্যকারের (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের) অনুগত শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পারমহংসপথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্মের প্রচার করেছেন। তা-ই শ্রীগৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।"

জগন্নাথ দাস বাবাজির শিক্ষা-শিষ্য সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজির বেশ শিষ্য শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজির কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থে নিম্নোক্ত গুরু-পরম্পরা উল্লেখ করেছেন।

১. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
২. শ্রীব্রহ্মা
৩. শ্রীনারদ মুনি
৪. শ্রীল ব্যাসদেব
৫. শ্রীল মধ্বাচার্য
৬. শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ
৭. শ্রীনৃহরি তীর্থ
৮. শ্রীমাধব তীর্থ
৯. শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ
১০. শ্রীজয়তীর্থ
১১. শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
১২. শ্রীদয়ানিধি
১৩. শ্রীবিদ্যানিধি তীর্থ
১৪. শ্রীরাজেন্দ্র তীর্থ
১৫. শ্রীজয়ধর্ম তীর্থ
১৬. শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থ
১৭. শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ
১৮. শ্রীব্যাসতীর্থ
১৯. শ্রীলক্ষ্মীপতি
২০.শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী
২১. শ্রীলঈশ্বরপুরী, (শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য)
২২. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
২৩. শ্রীল রূপ গোস্বামী (শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী)
২৪. শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী
২৫. শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
২৬. শ্রীল জীব গোস্বামী
২৭. শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর
২৮. শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর
২৯. (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ), শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ
৩০. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
৩১. শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ
৩২. শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
৩২. শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

পরম্পরা নির্ধারণ

গুরু-পরম্পরা দু'ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা : ১. পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা (দীক্ষার মাধ্যমে) ও ২. ভাগবত পরম্পরা (শিক্ষার মাধ্যমে)

১. পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা : পঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসরণপূর্বক গুরুদেব কর্তৃক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এ পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে দীক্ষার মাধ্যমে গুরু গ্রহণ করে শিষ্য গুরুদেবের মাধ্যমে ইষ্টদেবের (পঞ্চরাত্র) সেবা অধিকার লাভ করে এবং গুরুদেবের দেওয়া বিধি-নিষেধসমূহ পালন করে থাকে। সাধন-ভজনের মাধ্যমে সাধ্য লাভের জন্য দীক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

২. ভাগবত পরম্পরা : এ পরম্পরায় দীক্ষা মুখ্য বিষয় নয়; বরং বেদ বা ভাগবতের জ্ঞান যথাযথভাবে প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত হয়। আদি গুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বপ্রথম এ জ্ঞান ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, সেকথা তিনি নিজেই উদ্ধবের কাছে স্বীকার করে বলেছেন–

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎসূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ (ভা. ৩/৪/১৩)

অর্থাৎ পুরাকালে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমি আমার অপ্রাকৃত মহিমা বা লীলাব্যঞ্জক পরম জ্ঞান উপদেশ করেছিলাম, যাকে সাধুগণ 'ভাগবত' বলে কীর্তন করেন।

ব্রহ্মা তা নারদকে দিলেন; নারদ দিলেন তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবকে। শুকদেব গোস্বামী ব্যাসদেবের কাছ থেকে ভাগবতের জ্ঞান লাভ করলে তাঁর মাধ্যমে পরীক্ষিত মহারাজসহ সূত গোস্বামী প্রাপ্ত হলেন, যেখানে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষার প্রয়োজন হয়নি। ব্যাসদেবের কাছ থেকে মধ্বাচার্যের জ্ঞান লাভের কথাও ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, যাঁর মাধ্যমে মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সূচনা হয়।

পরম্পরার ক্ষেত্রে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রবাহ বজায় রাখাই মুখ্য বিষয়

উচ্চতর স্তর থেকে নিম্নতর স্তরে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রবাহই গুরু-পরম্পরা। নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে প্রবাহ সম্পন্ন হতে পারে না। কোনো কারণে এ প্রবাহে বিঘ্ন হলে পরম্পরার শুদ্ধধারা বজায় থাকে না, এমনকি দীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও। নিচে এ সম্বন্ধে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

১. গুরুদেব ও শিষ্যের মধ্যে রসভেদ হলে

পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা হওয়া সত্ত্বেও যদি সিদ্ধ স্বরূপে গুরু এবং শিষ্য একই রসের না হন, তবে গুরুদেব শিষ্যকে সেই রস সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান না করে সেই রসের কোনো উন্নত ভক্তের নিকট শিষ্যকে প্রেরণ করেন। তখন গুরুদেবের নির্দেশে শিষ্য সমরসের কোনো বৈষ্ণবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। যেমন, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– হস্তিনাপুরে

এক ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করার বাসনা করলে নারদ মুনি তাঁকে নন্দ মহারাজের আনুগত্যে ভজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও নারদ মুনি সেই ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করতে পারতেন, তবুও তিনি তাঁকে বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠভক্ত নন্দমহারাজের কাছে প্রেরণ করেন। আবার হৃদয়চৈতন্য প্রভু কৃষ্ণলীলায় সখ্য রসের ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁর শিষ্য শ্যামানন্দ প্রভু মাধুর্য রসের ভক্ত ছিলেন। সেজন্য হৃদয়চৈতন্য প্রভু নিজেই শ্যামানন্দ প্রভুকে শ্রীল জীব গোস্বামীর কাছে প্রেরণ করেন।
এভাবে গুরুদেব উচ্চতর ভজন শিক্ষার জন্য শিষ্যকে যে উত্তম বৈষ্ণবের নিকট প্রেরণ করেন, সেই বৈষ্ণব ভাগবত পরম্পরার গুরু হন।

২. অযোগ্য গুরুর ক্ষেত্রে

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধি সম্পন্ন হলেও গুরুদেব সদাচারী না হওয়ায় শিষ্য যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না, তখন বাধ্য হয়ে অন্য কোনো সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। গুরুদেবের যোগ্যতা শিষ্যের চেয়ে কম হলেও শিষ্যকে উচ্চতর ভজন শিক্ষার জন্য কোনো উত্তম বৈষ্ণবের শরণাগত হতে হয়; তখন সে বৈষ্ণব ভাগবত পরম্পরার গুরু হন। সুতরাং যোগ্যতাই ভাগবত পরম্পরার ভিত্তি এবং কেবল যোগ্য ব্যক্তিই পরম্পরার আচার্য পদে অভিষিক্ত হওয়ায় তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য, এমনকি তা সুসম্পন্ন হলে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা সম্পন্ন না হলেও পরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে।

৩. মহাপ্রভু কারো পঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু নন

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎগুরু হিসেবে স্বীকৃত হলেও তিনি কাউকে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা প্রদান করেননি। তিনি যদিও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কাউকে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা প্রদান করেননি; তাই সে অনুসারে তিনি কারো গুরু নন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রই নিজেদের মহাপ্রভুর অনুগামী মনে করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন, অর্থাৎ মহাপ্রভু থেকে যে পরম্পরা এসেছে, তা ভাগবত পরম্পরা।

৪. ভাগবত পরম্পরা অনুসারেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রূপানুগ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজেদের রূপানুগ বলে মনে করেন। তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাগবত পরম্পরা অনুসারে। কারণ শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ না করলেও তাঁর কাছ থেকে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করে পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে তা বিতরণ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কোথাও তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর শিক্ষাগুরুগণের নাম উল্লেখ করেছেন–

এই ছয় গুরু, শিক্ষাগুরু যে আমার।
তা সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শেষে তিনি লিখেছেন–

রূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

এ শ্লোকে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু বলে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পরম্পরা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভাগবত পরম্পরা বা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রবাহ বজায় রাখাই মুখ্য।

ভাগবত পরম্পরা অনুসরণে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়

অনেকেই মন্তব্য করেন যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভাগবত পরম্পরা নামে সম্পূর্ণ নতুন এক পরম্পরার ধারণা উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের যথার্থতা সম্বন্ধে 'গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য শ্রীল বলদেব' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধের আলোকে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো–

সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে অথর্ববেদে বলা হয়েছে–

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ

অর্থাৎ "ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে জগতে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান তিনি যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন তিনি শ্রীকৃষ্ণই।"

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁর কর্ণে বৈদিক মন্ত্র ওঙ্কাররূপে প্রবিষ্ট হয়। এভাবে ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান লাভ করে এ জগতে প্রথম গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার কাছ থেকে নারদ মুনি এবং নারদ মুনির কাছ থেকে ব্যাসদেব সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হন। মধ্বাচার্য বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হন ব্যাসদেবের কাছ থেকে (ব্যাসদেবের কাছ থেকে মধ্বাচার্যের জ্ঞানপ্রাপ্তির কথা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে)। মধ্বাচার্যের পর তাঁরই চার শিষ্য পরপর মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য পদে অভিষিক্ত হন। তাঁরা হলেন– পদ্মনাভ তীর্থ, নরহরি তীর্থ, মাধব তীর্থ ও অক্ষোভ্য তীর্থ। অক্ষোভ্য তীর্থের শিষ্য জয়তীর্থ, জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু। জ্ঞানসিন্ধুর কাছ থেকে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন দয়ানিধি এবং দয়ানিধির সেবক ছিলেন বিদ্যানিধি। বিদ্যানিধি তীর্থের শিষ্য ছিলেন রাজেন্দ্র তীর্থ। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম, জয়ধর্মের শিষ্য পুরুষোত্তম ও ব্রহ্মণ্যতীর্থ। শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থের শিষ্য ব্যাসতীর্থ, ব্যাসতীর্থের শিষ্য শ্রীলক্ষ্মীপতি। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য। শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, পরমানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, রঙ্গপুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রঘুপতি উপাধ্যায় এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

উক্ত পরম্পরায় দেখা যায় যে, মধ্বাচার্য অচ্যুতপ্রেক্ষের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেও তিনি পরম্পরা প্রাপ্ত হয়েছেন ব্যাসদেবের কাছ থেকে; যেহেতু ব্যাসদেব ছিলেন তাঁর ভাগবত-শিক্ষাগুরু। মধ্বাচার্যের পর ভাগবত বিধি অনুসরণেই পরম্পরার পরবর্তী আচার্য হয়েছিলেন তাঁরই চার শিষ্য। মহাপ্রভুর পরও ভাগবত পরম্পরাই বজায় ছিল।

শ্রীল রূপ, সনাতন ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী : মহাপ্রভুর অনুগামীদের অন্যতম ছিলেন শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী। শ্রীল রূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে (১.৫) তাঁর গুরু হিসেবে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নাম উল্লেখ করেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১.৫৯৮-৬০২) শ্রীল সনাতন গোস্বামীর গুরু বলে বিদ্যাবাচস্পতির কথা উল্লেখ আছে। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী চৈতন্যানন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁদের দীক্ষাগুরু আলাদা আলাদা হলেও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীল রূপ গোস্বামীকে আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১/৭৩) স্বয়ং মহাপ্রভু বলছেন–

প্রভু কহে– তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈলু সর্বশক্তি সঞ্চারিয়া।

মহাপ্রভু বললেন– "শ্রীরূপের প্রতি আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য তাঁর মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে তাঁকে আমি আলিঙ্গন করেছি।" অর্থাৎ রূপ গোস্বামী পরম্পরা প্রাপ্ত হলেন স্বয়ং মহাপ্রভুর কাছ থেকে।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী : পরম্পরার তালিকায় শ্রীল রূপ গোস্বামীর পর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নাম উল্লেখ রয়েছে। অদ্বৈতাচার্য প্রভুর শিষ্য যদুনন্দন আচার্য রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেব হওয়া সত্ত্বেও পরম্পরায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং স্বরূপ দামোদর গোস্বামী উভয়েই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ তিনিও ভাগবত পরম্পরাতেই এসেছেন।
পরম্পরায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাশেই এক সারিতে শ্রীল জীব গোস্বামী। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ শিষ্য।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী : শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কোনো দীক্ষাগুরুর নাম কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর প্রধান শিক্ষাগুরু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর : পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা অনুসারে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর গুরুদেব হিসেবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা জানি যে, পঞ্চরাত্রিক প্রণালী অনুসারে মহাপ্রভুর কোনো দীক্ষিত শিষ্য নেই। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর পঞ্চরাত্রিক প্রণালী অনুসারে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু ভাগবত পরম্পরা অনুসারে তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীল জীব গোস্বামীর আনুগত্যেই নরোত্তম দাস ঠাকুর ভজন শিক্ষা লাভ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর : শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী এবং পরম গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর দত্তক পুত্র (মতান্তরে শিষ্য) ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর সারার্থদর্শিনীটীকায় স্বীয় গুরু-পরম্পরার কথা এভাবে লিখেছেন-

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূননুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুং নৌমি ॥

শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম-শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম-শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর গুরু শ্রীগঙ্গাচরণ। 'নাথ'শব্দে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী; তিনি গৌড়ীয় পরম্পরার মধ্যকালীন আচার্য। ব্রজবাসী গোস্বামীগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিধারা শ্রীনিবাস আচার্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য-পরম্পরার চতুর্থ অধস্তন। নরোত্তম দাস ঠাকুরের পর অধস্তন আরো তিনজন শিষ্য থাকলেও ভাগবত পরম্পরা অনুসারে সরাসরি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ : শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কন্যাকুব্জের ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব শ্রীরাধাদামোদর দাসের কাছ থেকে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা অনুসারে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরম্পরা নিম্নরূপ-

নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য গৌড়ীদাস পণ্ডিত, গৌড়ীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য, হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ, শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ দেব, রসিকানন্দ দেব গোস্বামীর শিষ্য রাধা দামোদর, রাধা দামোদরের শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ।

কিন্তু ভাগবত পরম্পরা অনুসারে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিক্ষা শিষ্য হওয়ায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পর বলদেব বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ : উদ্ধার দাস (মতান্তরে উদ্ধব দাস) শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের শিষ্য ছিলেন। উদ্ধব দাসের শিষ্য ছিলেন শ্রীমধুসূদন দাস। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি শ্রীমধুসূদন দাস প্রভুর শিষ্য। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি তৎকালীন মথুরা মণ্ডল, ক্ষেত্র মণ্ডল ও গৌর মণ্ডলের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সে কারণে তিনি তখন বৈষ্ণব সার্বভৌম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর : পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা অনুসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দীক্ষাগুরু জাহ্নবা ঠাকুরাণীর পরম্পরার অন্তর্গত শ্রী বিপিনবিহারী গোস্বামী। অথচ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজির আনুগত্যে ভজন করতেন। আবার জগন্নাথ দাস বাবাজি ছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণের পরম্পরায় শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজির শিষ্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভাগবত পরম্পরা অনুসারে সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে তাঁর ভজন শিক্ষা গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের নির্দেশানুসারেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান আবিষ্কার করেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি : পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা অনুসারে গৌর কিশোর দাস বাবাজি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর ধারার অন্তর্গত। তিনি শ্রীমৎ ভাগবতদাস বাবাজি মহারাজের নিকট পরমহংস বাবাজির বেশ গ্রহণ করে 'শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ' নামে খ্যাত হন। শ্রীমৎ ভাগবতদাস বাবাজি মহারাজ– বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের বেশ-শিষ্য ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজির শিক্ষাগুরু। সে সূত্রে ভাগবত পরম্পরা অনুসারে গৌরকিশোর দাস বাবাজি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর : শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা অনুসারে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর এবং ভাগবত পরম্পরা অনুসারে জগন্নাথ দাস বাবাজির পরম্পরার অন্তর্গত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জীবনীতে এটা সুস্পষ্ট যে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনাদর্শ এবং ভজন প্রণালীই তাঁর পাথেয় ছিল। আর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ : ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ছিলেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশীর্বাদেই তিনি বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এ বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যদি আবির্ভূত না হতেন, তবে গৌড়ীয় রূপানুগ ধারা অপসম্প্রদায়ের করালগ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য শিষ্য, মহাপ্রভুর সেনাপতি ভক্ত শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তা হতে না দিয়ে উল্টো বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনার প্রচার করেছেন, সার্থক করেছেন মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী– "*পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥*"

এক্ষেত্রে তিনি একাই শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তিনি বিশিষ্ট। তিনি ভাগবত ও পঞ্চরাত্রিক উভয় পন্থারই প্রয়োগ সাধন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইস্‌কন জিবিসি মণ্ডলী এবং তাঁরাই বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চরাত্রিক পরম্পরার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা পরম্পরাও অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভাগবত বিধির গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পরম্পরা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, দীক্ষা বিষয়ে নয়। এমন নয় যে, দীক্ষাগুরু পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না বা যাঁরা ভাগবত পরম্পরায় আচার্য হবেন তাঁদের দীক্ষার প্রয়োজন নেই। তবে যদি কেবল দীক্ষার ভিত্তিতে পরম্পরা নির্ধারিত হয়, সেক্ষেত্রে শিষ্য যোগ্য না হলেও পরম্পরা অনুসারে তাঁকে গুরুপদে আসীন করা হয়। তার ফলে

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রবাহ নষ্ট হয়। দীক্ষা লাভ করে পরম্পরাসূত্রে নিজেকে গুরু বলে দাবি করলেও যদি জ্ঞানে ও ভজনে পরিপক্ক না হন, তবে পরবর্তী শিষ্যরা ঐ গুরুকে অনুসরণ করতে গিয়ে বৈষ্ণবীয় ধারা থেকে বিচ্যুত হবে। অধঃপতিত ব্যক্তিরাও পরবর্তীতে গুরু হয়ে নিজেকে পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত গুরু বলে জাহির করে দীক্ষা প্রদান করবে। তাই পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভাগবত পরম্পরায় তথাকথিত গুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং অপরিণত ও অপরিপক্ক ব্যক্তিও গুরু হওয়ার সুযোগ পায় না। এখানে শিক্ষা লাভ করে যোগ্যতা অর্জনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এজন্যই গৌড়ীয় ভক্তগণের মধ্যে দুটি দীক্ষার প্রচলন আছে, যথা: হরিনাম দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ দীক্ষা। হরিনাম দীক্ষা হয় ভাগবত বিধি অনুসারে এবং গায়ত্রী দীক্ষা হয় পঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে। হরিনামে সর্বসিদ্ধি হলেও পরমার্থ অনুশীলনের জন্য পঞ্চরাত্রিক দীক্ষার আবশ্যকতা আছে। আচার্যগণেরও স্ব-স্ব দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সদ্‌গুরু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে–

দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥

অর্থাৎ হরিনাম এত মহিমাময় যে, নাম গ্রহণের জন্য দীক্ষা গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না; কেবল নাম উচ্চারণের মাধ্যমেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ 'অর্চন দীপিকা'-তে লিখেছেন– "হরিনাম হচ্ছে ভাগবত স্বরূপ, রাধাকৃষ্ণের মূলস্বরূপ; সেজন্য শিক্ষাষ্টকে বলা হচ্ছে 'পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্'। অর্থাৎ হরিনামের মাধ্যমে ব্রজপ্রেম থেকে শুরু করে সবকিছু পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় যখন কোনো ভক্ত নাম গ্রহণ করে তখন সে অনেক অপরাধ করে থাকে এবং বিভিন্ন অনর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়; তখন তার পক্ষে শুদ্ধ নাম করা সম্ভব হয় না। তার অপরাধ স্তরে নাম হয়। তাই অপরাধশূন্য হয়ে শুদ্ধনাম গ্রহণের জন্য অবশ্যই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক।"

শ্রীল জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে বর্ণনা করেছেন–

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্ ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদেঃ ॥

যে নির্বাহ দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করে এবং সব ধরনের পাপ (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে নাশ করে, ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেজন্য এ জ্ঞানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

'দী' মানে দিব্যজ্ঞান আর 'ক্ষা' মানে সকল অপরাধের বিধৌতকরণ। দীক্ষা সংস্কার ছাড়া কৃষ্ণের সাথে কারো সম্বন্ধজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় না। সকল অনর্থ দূর করে শুদ্ধনাম গ্রহণের জন্য তাই দীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরম্পরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইষ্টদেবের (পঞ্চরাত্র) ধারণা ও আরাধনা এবং তা অনুসরণের জন্য দীক্ষা গ্রহণ। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সাধনার মূল বিষয়

হলো নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিপূর্বক নির্দিষ্ট ভাব গ্রহণ করে আরাধ্যের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন। ভজনের এ ধারণা ও পন্থা গুরু-পরম্পরায় অধিষ্ঠিত গুরুদেবের মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়। এজন্য দীক্ষা গ্রহণ অনিবার্য। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ দীক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বলেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অনুসারে পঞ্চরাত্র ও অন্যান্য অর্চন মার্গের সাহায্য ছাড়াই যেকেউ কেবল শরণাপত্তির মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলেও নারদসহ অন্যান্য ভক্তগণের মতো ভগবানের সাথে তাঁর নির্দিষ্ট সম্বন্ধ (দিব্য জ্ঞানের সারকথা) দীক্ষার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকেই লাভ করতে হয়।

যদি দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন না থাকতো তবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁকে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন না। ব্রহ্মা কৃষ্ণের কাছ থেকে স্বয়ং গোপাল মন্ত্র ও কামগায়ত্রী গ্রহণ করেন এবং তিনি তা নারদমুনিকে প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে হরিনাম ও গোপালমন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন।

পরম্পরার আচার্যগণও কোনো না কোনো সদ্‌গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, ষড়গোস্বামীগণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, নারদ মুনি, চতুষ্কুমারগণ সকলেই পঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভাগবত পরম্পরায় অধিষ্ঠিত সকল আচার্যেরই পঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু ছিলেন। কিন্তু বংশানুক্রমিক কোনো পরম্পরা হয় না। অযোগ্য হলে আচার্যের বংশপরম্পরায় থাকলেও আচার্য বলে কেউ গণ্য হতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে কেবল গোপাল মন্ত্র প্রদান করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামী এবং তাঁর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী আমাদের সম্প্রদায়ের বর্তমান ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁরা ব্রহ্ম গায়ত্রী, গুরু মন্ত্র, গুরু গায়ত্রী, গৌর মন্ত্র, গৌর গায়ত্রী, কৃষ্ণমন্ত্র (গোপাল মন্ত্র) এবং পরিশেষে কাম গায়ত্রী প্রদান করেছেন।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভাগবত পরম্পরা অনুসরণে সম্প্রদায়ের অনুসারী ভক্তদের হরিনাম ও পঞ্চরাত্রিক দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর শিষ্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও সেই ধারায় বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছেন এবং সম্প্রদায়ের শিক্ষা অবিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) পরিচালকমণ্ডলী তথা জি.বি.সি. প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইস্‌কন জি.বি.সি. মণ্ডলীর দ্বারা স্বীকৃত আচার্যগণ বর্তমানে পরম্পরাকে ধারণ করে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করে যাচ্ছেন।

পরম্পরায় এত দীর্ঘ বিরতি কেন?

বৈদিক জ্ঞান অনন্তকাল ধরে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হয়ে আসছে। সেজন্য পরম্পরাক্রমে বহু আচার্যের নাম থাকার কথা; কিন্তু আমরা কেবল কয়েকজন আচার্যের নাম পরম্পরায় দেখতে পাই কেন? শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন–

"পরম্পরায় এত দীর্ঘবিরতি নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমরা ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব মধ্বাচার্যকে এ জ্ঞান প্রদান করেন। এখানে ব্যাসদেব ও মধ্বাচার্যের মধ্যে কালগত একটি বড় ব্যবধান আছে। কথিত আছে, ব্যাসদেব এখনো এ পৃথিবীতে আছেন এবং তিনি সরাসরি মধ্বাচার্যকে এ জ্ঞান প্রদান করেন (ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

একইভাবে আমরা ভগবদ্গীতায় দেখতে পাই, যদিও লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে কৃষ্ণ সূর্যদেব বিবস্বানকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং জ্ঞানের প্রবাহের কথা উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই ভগবদ্গীতায় কেবল তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন– বিবস্বান, মনু ও ইক্ষাকু। তাই এ ব্যবধান পরম্পরাক্রমে আগত জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো বিষয় নয়। আমাদের পরম্পরা ধারায় আগত প্রধান প্রধান আচার্যগণকে অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া পরম্পরার বহু শাখা রয়েছে এবং এত শাখা-উপশাখা লিপিবদ্ধ রাখাও সম্ভব নয়। আমরা যে সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত সে সম্প্রদায়ের আচার্যের নির্ধারিত পরম্পরা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।" (দয়ানন্দকে পত্র, ১২ এপ্রিল, ১৯৬৮)

আবার এ প্রসঙ্গে একটি উপমার উল্লেখ করা যেতে পারে– আকাশে অনেক নক্ষত্র থাকলেও তার মধ্যে কেবল অল্প কিছু নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তার অর্থ এই নয় যে, আর বাকি নক্ষত্রগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। ঠিক তেমনি পরম্পরায় অনেক আচার্য থাকলেও আমরা কেবল কতিপয় আচার্যের নাম পরম্পরার তালিকায় দেখতে পাই। পরম্পরার অনেক আচার্য আবার দীনতাবশত নিজেকে প্রকাশ করেননি। সেকারণেও অনেকের নাম উহ্য রয়ে গেছে।

অন্যদিকে, আমাদের গণনা অনুসারে এ কালগত ব্যবধান অনেক দীর্ঘ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নিত্যকালের তুলনায় এ বিরতি অত্যন্ত নগণ্য। যেমন, আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা এবং ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ব্যবধান, তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তা আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং, পরম্পরায় দীর্ঘবিরতি নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই।

উপসংহার

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণের জীবনী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যে পরম্পরা ধারায় অবিকৃতভাবে বৈদিক জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে তাতে পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা ও ভাগবত পরম্পরা উভয়ই যুক্ত থাকলেও ভাগবত পরম্পরাকে পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, ভাগবত পরম্পরার মধ্যে পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা নিহিত রয়েছে। ভাগবত পরম্পরায় কালগত কোনো প্রতিবন্ধকতা

নেই। শুদ্ধভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পঞ্চরাত্রিক বিধি এবং ভাগবত বিধি একই শিক্ষা বহন করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

এই 'শুদ্ধভক্তি'– ইহা হৈতে 'প্রেম' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং অন্যান্য আচার্যগণের জীবনী পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা ভাগবত পরম্পরার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

পরম্পরা ধারায় আগত শিক্ষা প্রদান করাই গুরু-পরম্পরার উদ্দেশ্য। অন্যথায় গুরু-পরম্পরা কেবল একটি শারীরিক পরম্পরা বলে গণ্য হবে। তখন জাত ব্রাহ্মণ, জাতগোসাইসহ বিভিন্ন অপসম্প্রদায়গুলো তাদের গুরু নামধারী ব্যবসা চালিয়ে যাবে। কারণ, বংশগতভাবে তারা একের পর এক মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে যাবে, কিন্তু তাদের মন্ত্রে কোনো ক্রিয়া হবে না। তাই গুরু নির্বাচনের পূর্বে আমাদের অবশ্যই গুরুদেবের পরম্পরা বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত।
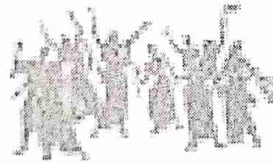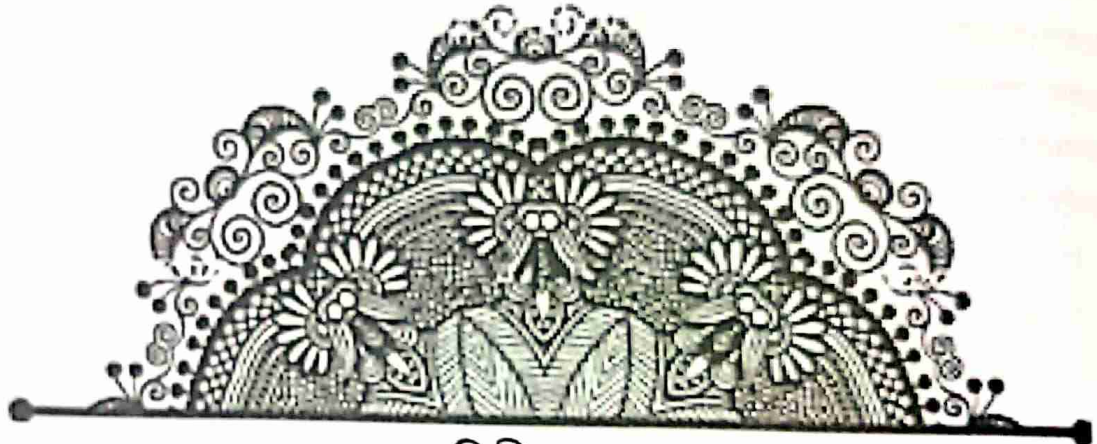
দ্বিতীয় ভাগ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণের

অপ্রাকৃত জীবনচরিত
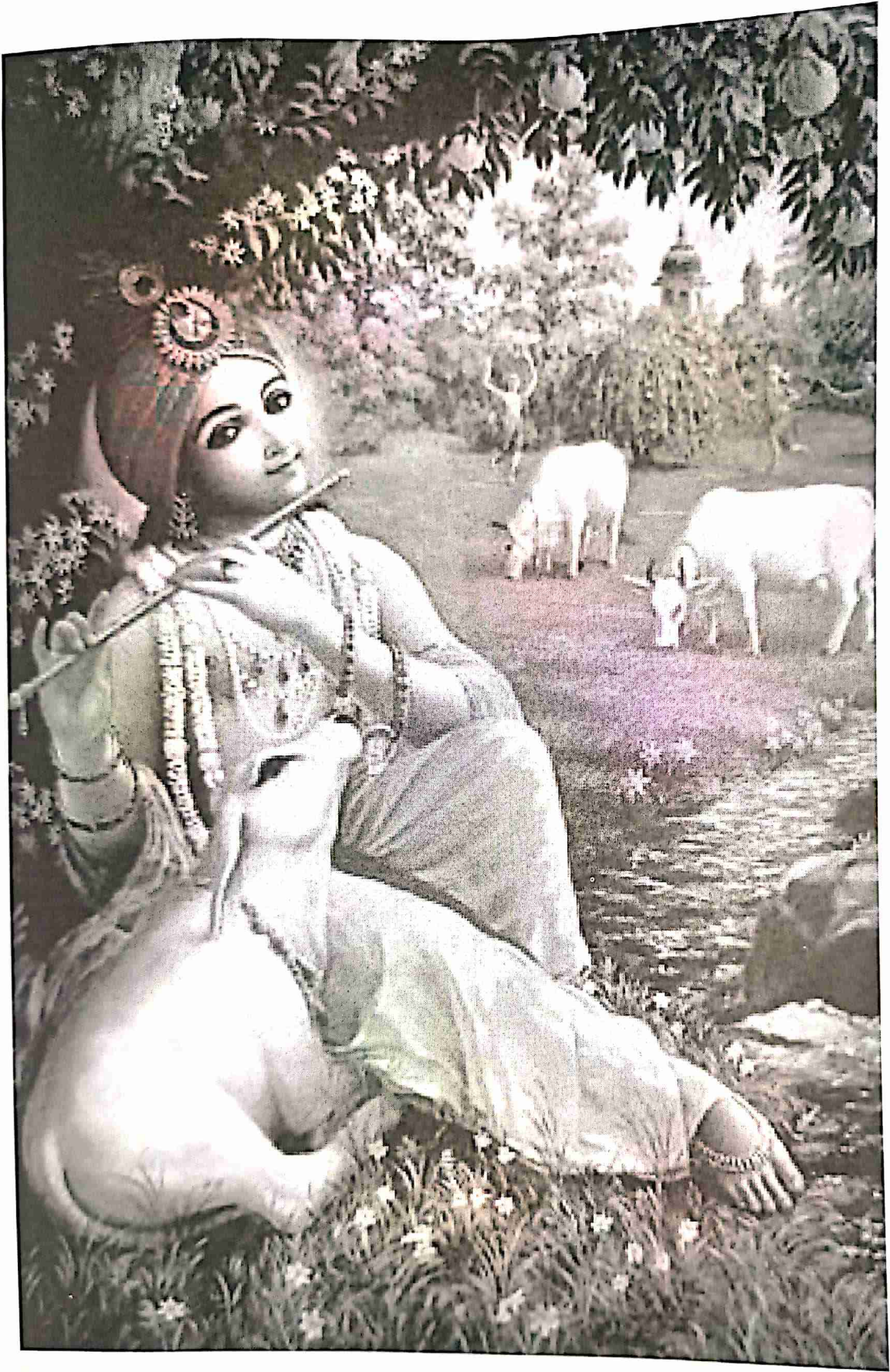
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

সমান আলোকসম্পন্ন একটি দীপ থেকে আরো অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত হলেও প্রথমটি ঠিক তেমনই থাকে। তেমনি পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে অনন্ত রূপে প্রকাশ করলেও তিনি সর্বকারণের পরম কারণরূপেই বর্তমান থাকেন। "*অনাদি অনন্তরূপম্ আদ্যং পুরাণ পুরুষম...॥*" ভগবানের রাম, নৃসিংহ, বামন, কূর্ম আদি অনন্ত রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতি, স্মৃতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান। ভক্তপ্রবর অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির কথা শ্রবণ করে স্বয়ং তা স্বীকার করে বলেছেন–

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥

–গীতা ১০/১২-১৩

"তুমি পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা সেভাবেই তোমাকে বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছো।" তিনি হচ্ছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও প্রলয়ের কর্তা; যদিও তিনি স্বয়ং এ সকল কার্য করেন না। জগতের সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় করেন যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তবে তাঁরা এ সকল কার্য শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছানুসারে করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় হয়ে থাকে।

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বের সৃজন সংহার ॥
তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করেন পালন ॥
তব ইচ্ছা মতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছা মতে মায়া সৃজে কারাগার ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র গুণাবলি

শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে তাঁর গুণের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হয়ে থাকে। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে ৬৪টি প্রধান গুণ বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মার গুণ পঞ্চাশটি। স্বল্পমাত্রায় তা প্রতিটি জীবের মধ্যে দেখা যায়। তাসহ শিবের মধ্যে আরো পাঁচটি গুণ বেশি আছে যেগুলো ব্রহ্মা কিংবা অন্য জীবের মধ্যে নেই। তাছাড়াও ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে আরো পাঁচটি গুণ বিদ্যমান।

অর্থাৎ বিষ্ণুর ৬০টি গুণ। কিন্তু কৃষ্ণ হলেন অসমোর্দ্ধ। তাঁর মধ্যে বিষ্ণুর ষাটটি গুণ ছাড়াও আরো ৪টি বিশেষ গুণ বর্তমান। পদ্মপুরাণে দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীর কাছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এ গুণগুলো অন্যকোনো ভগবৎস্বরূপে প্রকাশিত হয় না। সমস্ত গুণের পূর্ণ প্রকাশ কেবল শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর কৃষ্ণের সেই স্বতন্ত্র চারটি গুণ হলো–

১. লীলামাধুরী : তিনি নানারকম অদ্ভুত লীলাবিলাস করে থাকেন, বিশেষ করে বাল্যলীলা।
২. প্রেমমাধুরী : তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তদের সাথে নিবিড় প্রেমময় সময় অতিবাহিত করেন।
৩. বেণুমাধুরী : তিনি তাঁর চিন্ময় বেণু বাজিয়ে সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করেন।
৪. রূপমাধুরী : তাঁর অপরূপ রূপ-মাধুর্য অপ্রাকৃত, যার কোনো তুলনা হয় না।

চরম উৎকর্ষে কৃষ্ণের সার্বভৌম-শ্রেষ্ঠত্ব আরো মৌলিক; শক্তির উপর প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব আর ঐশ্বর্যের উপর মাধুর্যের শ্রেষ্ঠত্বই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের মূল।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

পরমতত্ত্বের তিনটি প্রকাশ– ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা বা নিরাকার স্বরূপ, পরমাত্মা হচ্ছে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের অংশপ্রকাশ, আর এ দুই স্বরূপের উৎস হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি তাঁর চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান। তাই পরমতত্ত্ব মূল স্বরূপে কৃষ্ণ, যাঁর মধ্যে সমস্ত গুণ এবং শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু বামন, রাম, নৃসিংহ আদি অবতারে বিভিন্ন মাত্রায় শক্তি অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। তা জেনে ভক্ত অনাদির আদি গোবিন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন। এ সম্পর্কে ব্রহ্মসংহিতায় অনন্ত ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে–

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেনতিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি যিনি এ জগতে শ্রীরাম-আদি বিভিন্ন অংশ বা কলা (অংশের অংশ) অবতার রূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু তাঁর পূর্ণ প্রকাশিত রূপ হলো শ্রীকৃষ্ণ।"

চিদাকাশে অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠধাম রয়েছে। এর প্রতিটিতে তিনি নারায়ণ রূপে ঐশ্বর্যভাবে লীলাবিলাস করছেন। আর চিৎ জগতের সর্বোচ্চ লোক গোলোকে তিনি তাঁর আদি রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে মাধুর্যভাবে রস আস্বাদন করছেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে– ভগবান জীবের সঙ্গে ৫টি মুখ্য রসের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়ে থাকেন : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে জীব মাত্র আড়াইটি রসের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে– শান্ত, দাস্য এবং সখ্যের অর্ধেক; সেখানে ঐশ্বর্যের আধিক্যহেতু ভক্তের ভগবানের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্ভ্রম থাকার ফলে সখ্যভাব পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

কৃষ্ণলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে অবস্থান করেন। দ্বারকায় ঐশ্বর্য, মথুরায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য এবং বৃন্দাবনে শুদ্ধ মাধুর্য ভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং বৃন্দাবনে তাঁর স্বরূপটি হচ্ছে পূর্ণতম ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৫/১৪২) বর্ণনা করা হয়েছে– *"একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য"* অর্থাৎ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর, আর অন্য সকলেই তাঁর সেবক। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা বলেছেন–

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

" যে কৃষ্ণকে আমরা গোবিন্দ বলি তিনিই পরমেশ্বর। তাঁর দেহ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনিই সবকিছুর আদি উৎস এবং সর্ব কারণের পরম কারণ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮) বর্ণনা করা হয়েছে– *"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"*। এভাবে, যশোদা-নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে সকলেরই আরাধ্য–তা সিদ্ধ হলো। *"আরাধ্য ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবন"* (চৈতন্যমত্তমঞ্জুষা) আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন ব্রজেশ তনয় কৃষ্ণ। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতি যথার্থ ধারণা ও যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে, জীবের আত্যন্তিক মুক্তি লাভ হয়ে থাকে।

'শিব পুরাণে' শিব পার্বতীকে বলেছেন– *"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম।"* অর্থাৎ, সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই পরম। আবার ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে–

যস্যৈকনিশ্বাসিতকালমথাবলম্ব্য।
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ॥
বিষ্ণুর্মহান স ইহ যস্য কলাবিশেষো।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসে লোমকূপ থেকে অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় এবং আবার তাঁর শরীরে প্রবেশ করে, এই মহান বিষ্ণু হচ্ছেন গোবিন্দের অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণই যে আদি নারায়ণ, তা প্রমাণ করতে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন, "এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপী যে শরীর তা আপনার শক্তিরই একটি প্রকাশ। গর্ভসমুদ্রের জলে বিশ্রাম করেন বলে আপনার এ বিশ্বরূপকেও নারায়ণ বলা হয় এবং আমরা সকলেই এ নারায়ণ রূপের গর্ভে অবস্থান করছি, আপনার বিভিন্ন নারায়ণরূপ আমি সর্বদাই দর্শন করছি। আমি জলে আপনাকে দর্শন করছি, আমার হৃদয়ে আপনাকে অনুভব করছি এবং এখন আমার সামনে আপনাকে দণ্ডায়মান দেখতে পাচ্ছি। আপনিই হচ্ছেন আদি নারায়ণ।" ঋক বেদে বলা হয়েছে–

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈকার্যঃ কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ কৃষ্ণোহনাদিস্তস্মিন্ন জাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মাঙ্গলং তল্লভতে কৃতী ॥

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণই সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণই আদিপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কর্মের মূল, সর্বকার্যের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ সকলের একমাত্র প্রভু,

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবগণেরও প্রভু এবং পূজ্য। শ্রীকৃষ্ণ আদিরও আদি (অনাদি)। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাইরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি সে সমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণেই লাভ করে থাকেন।"

এভাবে কৃষ্ণের ভগবত্তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন–

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥

–চৈ.চ. আদি ২/১০৬, ৯৬

শ্রীকৃষ্ণই পরম্পরা ধারায় আগত জ্ঞানের পরম উৎস

কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালের সমস্ত কিছুই অবগত, কিন্তু কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানেন না। শুধু তাই নয়, তাঁকে লাভ করার জন্য সাধ্য ও সাধন বিষয়েও তিনি ছাড়া পূর্ণরূপে অন্য কেউই জানেন না। সুতরাং, সমস্ত জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করার জন্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে সৃষ্টির আদিতে প্রথম জীব ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে– *"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"* অর্থাৎ, তিনিই আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অথর্ববেদে বলা হয়েছে–

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥

অর্থাৎ "ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে জগতে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান তিনি যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন তিনি শ্রীকৃষ্ণই।" সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যখন ধ্যানমগ্ন হলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তখন তাঁর কর্ণে বৈদিকমন্ত্র ওঙ্কাররূপে প্রবিষ্ট হলো। এভাবে ব্রহ্মা পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন এবং সমস্ত জীবের প্রথম গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ব্রহ্মা হতে এ জ্ঞান পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে।

শ্রীকৃষ্ণ কখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন?

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৪/৭) বলা হয়েছে– *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥* "হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন না, তাঁর বিভিন্ন অবতার যথা– পুরুষাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার ও মন্বন্তর অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি– এ চার যুগকে একত্রে এক দিব্যযুগ বা চতুর্যুগ বলা হয়, একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয় আর চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়।

১ মন্বন্তর = একাত্তর চতুর্যুগ
১৪ মন্বন্তর = (৭১X১৪) চতুর্যুগ = ৯৯৪ চতুর্যুগ বা প্রায় একহাজার চতুর্যুগ।
কলি যুগের সময়সীমা– ৪,৩২,০০০ বছর।
দ্বাপর যুগের সময়সীমা– ৮,৬৪,০০০ বছর।
ত্রেতা যুগের সময়সীমা– ১২,৯৬,০০০ বছর।
সত্য যুগের সময়সীমা– ১৭,২৮,০০০ বছর।
এক চতুর্যুগের সময়সীমা– ৪৩,২০,০০০ বছর।
৭১ চতুর্যুগ অর্থাৎ = ৪৩,২০০০০ X ৭১ = ৩০৬,৭২,০০০০ বছর = এক মন্বন্তর।
১৪ মন্বন্তর অর্থাৎ = ৩০,৬৭,২০০০০ X ১৪ = ৪২৯,৪০,৮০,০০০ বছর ব্রহ্মার একদিন।
কোথাও কোথাও ব্রহ্মার একদিন ৪৩২,০০,০০০০০ বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একবার আসেন, কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে এক হাজার দিব্য চতুর্যুগ বা চার হাজার যুগে প্রায় চার হাজার যুগাবতার অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর, প্রতি মন্বন্তরে একাত্তর চতুর্যুগ। তবে শ্রীকৃষ্ণ কোন মন্বন্তরে কোন চতুর্যুগের কোন যুগে অবতীর্ণ হন? তিনি বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের আটাশতম চতুর্যুগের দ্বাপর যুগের শেষে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে–

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥
'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥

–চৈ.চ. আদি ৩। ৫-১০

জ্যোতির্বিদদের গণনা অনুসারে খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০১ সাল থেকে কলিযুগের আরম্ভ, বর্তমানে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ চলছে, তাহলে কলিযুগের বর্তমান বয়স ৩১০১+২০১৪ = ৫১১৫ বছর। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের দিন কলির আবির্ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর প্রকট লীলা করেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ৫১১৫+১২৫ = ৫২৪০ বছর পূর্বে হয়েছিল। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫২৪০ বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, তাঁর জন্ম ও কর্ম সবই দিব্য এবং কেউ যখন তত্ত্বগতভাবে তা জানতে পারেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের জন্ম কোনো সাধারণ মানুষের মতো নয়। সাধারণ মানুষের জন্ম হয় কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। কর্মের ফলস্বরূপ সে এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়। ভগবানের জন্মের কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় আবির্ভূত হন।

যখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় হলো, তখন কাল সর্বগুণ সমন্বিত হয়ে পরম সুন্দর হয়ে উঠল এবং পৃথিবীও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিথি, যোগ এবং নক্ষত্র তখন সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বসুলক্ষণ যুক্ত হয়ে উঠল এবং সর্বসুলক্ষণযুক্তা রোহিণী নক্ষত্র তখন তুঙ্গে প্রকাশিত হলো। ব্রহ্মা স্বয়ং এ রোহিণী নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, নক্ষত্রের অবস্থান ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান ও প্রভাবের ফলে শুভ এবং অশুভ তিথি ও যোগ বিচার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে সমস্ত গ্রহ মঙ্গলময় অবস্থা ও শুভ ইঙ্গিত প্রদর্শন করে বিরাজ করতে লাগল।

তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাতের গভীর অন্ধকারে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করে দেবকী-বসুদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। পূর্ণচন্দ্র যেভাবে উদিত হয়, ঠিক সেভাবেই পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হলেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল অষ্টমী তিথিতে, তাহলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো কী করে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই চন্দ্র সেই রাতে অপূর্ণ থাকলেও সেই বংশে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেদিন পূর্ণ হয়ে উঠলেন।

'খমাণিক্য' নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে ভগবানের আবির্ভাব সময়কালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই শুভ মুহূর্তে যে শিশুটির জন্ম হলো, তিনি হলেন পরম-ব্রহ্ম।

বসুদেব দেখলেন যে, সেই অদ্ভুত শিশুটি চতুর্ভুজ। তিনি তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে আছেন। বক্ষে তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভ শোভিত কণ্ঠহার, পরনে পীতবসন, উজ্জ্বল মেঘের মতো তাঁর গায়ের বর্ণ, বৈদুর্য মণিভূষিত কিরীট তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছে, নানারকম মহামূল্যবান মণি-রত্ন শোভিত সমস্ত অলঙ্কার তাঁর দিব্য দেহে শোভা পাচ্ছে, তাঁর মাথা ভর্তি কুঞ্চিত কালো কেশরাশি। এই অদ্ভুত শিশুটিকে দেখে বসুদেব অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি ভাবলেন কীভাবে একটি নবজাত শিশু এ রকম সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হলো? তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তখন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বসুদেব তখন ভাবতে লাগলেন, যদিও তিনি একজন সাধারণ মানুষ এবং বাহ্যিক দিক থেকে কংসের কারাগারে আবদ্ধ, তবুও পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তাঁর স্বরূপ ধারণ করে তাঁর সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কোনো মনুষ্যশিশু এভাবে চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে অলঙ্কার এবং সবরকম দিব্য সাজে সজ্জিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত লক্ষণযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না।

বসুদেব বারবার সেই শিশু সন্তানটির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন কীভাবে তাঁর এরকম সৌভাগ্যের মুহূর্তটি তিনি উদ্‌যাপন করবেন। তিনি ভাবলেন, "সাধারণত যখন পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, মানুষ তখন মহোৎসব করে, আর পরমেশ্বর ভগবান আজ আমার গৃহে আমার সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কত মহা আড়ম্বরেই না এ উৎসব পালন করা উচিত।"

বসুদেবের মনে আর যখন কোনো সংশয় রইল না যে, এ নবজাত শিশুটিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তখন তিনি করজোড়ে প্রণিপাত করে তাঁর বন্দনা করতে শুরু করলেন।

বসুদেব তখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে কংসের ভয় থেকে মুক্ত হলেন। শিশুটির অঙ্গকান্তিতে সেই ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বসুদেব তখন প্রার্থনা করতে লাগলেন– "হে প্রভু, আমি জানি আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং পরম সত্য। আপনি আপনার নিত্য স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যা আমি এখন সরাসরি দর্শন করতে পারছি। আমি বুঝতে পারছি যে, যেহেতু আমি কংসের ভয়ে ভীত, তাই সে ভয় থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্য আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি এই প্রকৃতির অতীত, আপনিই সেই পরম পুরুষ, যিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ জড় জগৎ প্রকাশিত করেন। হে প্রভু, পরম নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও আপনি কৃপা করে আমার পুত্ররূপে অবতরণ করেছেন। বর্বর কংস ও তার দুরাচারী সঙ্গীরা, যারা রাজবেশ ধারণ করে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছে, সে সমস্ত অসুর ও তাদের অনুচরদের সংহার করার জন্যই আপনি অবতরণ করেছেন। আপনি যে তাদের সংহার করবেন, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কথা জানতে পেরে কংস আপনার পূর্বজাত ভাইদের হত্যা করেছে। এখন সে কেবল আপনার জন্ম-সংবাদের প্রতীক্ষা করছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই সে আপনাকে হত্যা করার জন্য এখানে সশস্ত্র উপস্থিত হবে।"

তারপর মাতা দেবকীও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। দেবকীর প্রার্থনা শুনে ভগবান বললেন, "হে মাতা, স্বায়ম্ভুব মনুর সময় আমার পিতা বসুদেব সুতপা নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন আর আপনি ছিলেন তাঁর পত্নী। আপনার নাম ছিল পৃশ্নি। সে সময় ব্রহ্মা প্রজা বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। তখন আপনারা আপনাদের ইন্দ্রিয় সংযম করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। প্রাণায়াম করে আপনি এবং আপনার পতি জড়া প্রকৃতির সমস্ত নিয়মগুলো সহ্য করেছিলেন– বর্ষার বর্ষণ, গ্রীষ্মের তাপ, ঝড়-ঝঞ্ঝা সব আপনারা সহ্য করেছিলেন, হৃদয় নির্মল করেছিলেন এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তপশ্চর্যা পালন করে আপনারা কেবল গাছের ঝরা পাতা আহার করে জীবন ধারণ করেছিলেন, তারপর আপনারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে একাগ্রচিত্তে আমার আরাধনা করে আমার কাছ থেকে কোনো অদ্ভুত বর প্রার্থনা করেছিলেন।

আপনারা দেবতাদের গণনা অনুসারে ১২,০০০ বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তখন আপনাদের চিত্ত কেবল আমাতেই সমাহিত ছিল। আপনারা যখন ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করছিলেন এবং আপনাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ আমারই ধ্যান করছিলেন, তখন আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য এ রূপ নিয়েই অবির্ভূত হয়েছিলাম। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি কী কামনা করেন?' আপনি বলেছিলেন, আমি যেন আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি। যদিও আপনি তখন আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন, তবুও আমার মায়ার প্রভাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা না করে আপনি কেবল আমাকে আপনার পুত্ররূপে কামনা করেছিলেন।"

এভাবে তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলে ভগবান নিজেকে একটি ছোট্ট শিশুতে পরিণত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বসুদেব সূতিকাগার থেকে তাঁর সন্তানটিকে গোকুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সে সময় গোকুলে নন্দ এবং যশোদার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া। যোগমায়ার প্রভাবে কংসের প্রাসাদের প্রতিটি বাসিন্দা বিশেষ করে প্রহরীরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলো এবং কারাগারের সবকটি দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল, যদিও সেগুলো খিল দেওয়া ছিল এবং লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। সেই রাতটি ছিল ঘোর অন্ধকারময়। কিন্তু যখনই বসুদেব তাঁর শিশুসন্তানটিকে কোলে নিয়ে বাইরে এলেন, রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গেল এবং তিনি সবকিছু দিনের আলোর মতো দেখতে পেলেন।

ঠিক সে সময় গভীর বজ্রনিনাদের সঙ্গে প্রবল বর্ষণ হতে শুরু করল। বসুদেব যখন তাঁর শিশুসন্তান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান অনন্তদেব সর্পরূপ ধারণ করে সেই বর্ষণ থেকে বসুদেবকে রক্ষা করার জন্য বসুদেবের মাথার উপর তাঁর ফণা বিস্তার করলেন। বসুদেব যমুনার তীরে এসে দেখলেন যে, যমুনার জল প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হচ্ছে, তার বিশাল তরঙ্গগুলো ফেনিলোচ্ছল হয়ে উঠছে। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর রূপ সত্ত্বেও যমুনা বসুদেবকে যাওয়ার পথ করে দিলেন, ঠিক যেমন ভারত মহাসাগর রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের সময় তাঁর জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। এভাবে বসুদেব যমুনা পার হয়ে অপর পাড়ে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, সমস্ত গোপ-গোপী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সেই সুযোগে তিনি নিঃশব্দে যশোদা মায়ের গৃহে প্রবেশ করে তাঁর পুত্রসন্তানটিকে সেখানে রেখে যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে এলেন এবং দেবকীর কোলে কন্যাটিকে রাখলেন। তিনি নিজেকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন যাতে কংস বুঝতে না পারে। এভাবে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্য জন্ম লীলা প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলা

এদিকে, কংস তার ভবিষ্যৎ হত্যাকারীর অনুসন্ধান করা অসম্ভব দেখে মথুরার সমস্ত শিশুকে হত্যা করার আদেশ দেন। পুতনা রাক্ষসীর সাহায্যে কংস অসংখ্য শিশুকে হত্যা করেন। পুতনার বিষাক্ত স্তন পান করলেই শিশুরা মৃত্যুমুখে পতিত হতো; কিন্তু কৃষ্ণ এই পুতনার স্তন এমন কঠোরভাবে পান করেন যে, যন্ত্রণায় পুতনা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কংস এবার বুঝতে পারলেন যে, কৃষ্ণই তার প্রধান শত্রু; সেজন্য নানা উপায়ে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করতে থাকেন। কংস কর্তৃক প্রেরিত বকাসুর, অঘাসুর, অরিষ্টাসুর প্রভৃতি অসুর কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। এ সময় কৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করে কালিন্দীর জল বিষমুক্ত করেন। কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ ইন্দ্রের পূজা ত্যাগ করে তাদের গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধন পর্বতের পূজা করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে গোবর্ধনপর্বত নিমজ্জিত করার জন্য ভীষণ বৃষ্টি ও প্লাবনের সৃষ্টি করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর সাত দিন-সাত রাত গোবর্ধনপর্বত ধারণ করে ইন্দ্রকে পরাভূত করে গোধনসহ ব্রজবাসীদের সুরক্ষা প্রদান করেন।

অসুরবধ ছাড়াও কৃষ্ণ বৃন্দাবনে মাধুর্য, সখ্য, বাৎসল্য আদি রস আস্বাদনের জন্য

বিভিন্ন লীলাবিলাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসহচরী শ্রীমতি রাধারাণী ও ব্রজগোপীদের সাথে তিনি মাধুর্যরসাত্মক যেসকল লীলাবিলাস করেন, তার মধ্যে ব্রজগোপিকাদের বস্ত্রহরণ ও রাসনৃত্য অন্যতম। এছাড়া মা যশোদার সঙ্গে দামবন্ধনলীলা, সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠলীলা এবং ব্রহ্মবিমোহনসহ আরো বিভিন্ন লীলা তিনি বৃন্দাবনে সংঘটিত করেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত বিক্রমে ক্রোধিত হয়ে কংস কৃষ্ণ-বলরামকে নিমন্ত্রণ করার জন্য অক্রূরকে পাঠান। অক্রূর কৃষ্ণকে কংসের নিমন্ত্রণ ও গুপ্ত অভিসন্ধির কথা জানান। কৃষ্ণ ও বলরাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মাত্র ১০ বছর ৮ মাস বয়সে মথুরায় চলে যান।

মথুরায় দুই ভাই ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে কংস চানুর ও মুষ্টিক নামে দুজন মল্লযোদ্ধাকে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বললেন। তাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল যে, তারা কৃষ্ণ-বলরামকে পরাজিত করে হত্যা করবে। কংস গোপনে একটি হাতিকে নিযুক্ত করেন, যেন প্রয়োজন হলে হাতিটি তাঁদের উভয়কেই পদদলিত করতে পারে।

মল্লযোদ্ধারা কৃষ্ণ-বলরাম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হয়। তারপর কংসের রক্ষীদের হত্যা করে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেন ও কারারুদ্ধ উগ্রসেনকে মুক্ত করে মথুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এরপর কৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে থাকেন। তারপর সান্দীপনি মুনির কাছে কৃষ্ণ-বলরাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি পঞ্চজন নামে এক অসুরকে বধ করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। দ্বারকায় বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী কৃষ্ণকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করে এক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে তাঁর নিকট সংবাদ পাঠান। রুক্মিণীর আবেদনে কৃষ্ণ বিদর্ভদেশে এসে অম্বিকাদেবীর মন্দির থেকে রুক্মিণীকে হরণ করেন। রুক্মিণী রাজা শিশুপালের বাগদত্তা ছিলেন। সেজন্য শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে প্রস্থান করেন। রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন প্রমুখ দশ জন পুত্র ও চারুমতি নামে এক কন্যা হয়। রুক্মিণী ছাড়াও কৃষ্ণের জাম্ববতী, সুশীলা, সত্যভামা ও লক্ষ্মণাসহ ষোল হাজার একশ আটজন স্ত্রী ছিলেন এবং প্রত্যেকের জন্যই ছিল আলাদা আলাদা প্রাসাদ।

এ কথা শুনে কেউ হয়তো বিস্মিত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর পক্ষে তা মোটেও অসম্ভব নয়। একবার নারদমুনি দ্বারকায় এসে কৃষ্ণকে পৃথকভাবে একইসময়ে সকল রাণীর প্রাসাদেই দেখতে পেয়েছিলেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

ধর্মসংস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক পাণ্ডবগণকে সহায়তা

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলপুত্র আর কুন্তীদেবী হলেন কৃষ্ণের পিসি। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভাতেই পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম আলাপ-পরিচয় ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। পূর্বেই কৃষ্ণের বহু মহিমা শ্রবণ করার ফলে তারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পাণ্ডবরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন, এ অভিমত ব্যক্ত করে কৃষ্ণ সমবেত রাজাদের পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেন। কৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই বনবাসকালে অর্জুন কৃষ্ণের বোন

সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করেন। সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল বাস করেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের ঘোর শত্রু ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পূর্বে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ছদ্মবেশে মগধে যান ও সেখানে কৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী ভীম মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করেন। জরাসন্ধ সে সময় বহু রাজাদের অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছিলেন। জরাসন্ধকে বধ করার মাধ্যমে কৃষ্ণ সে সমস্ত রাজাদের উদ্ধার করেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ভীষ্মদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করার পরামর্শ দিলে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই চেদিরাজ শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হয়ে কৃষ্ণের নিন্দা করতে শুরু করেন। এর আগেও শিশুপাল বহুবার কৃষ্ণের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু শিশুপালের মায়ের কাছে তার শত অপরাধ মার্জনা করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এবার শিশুপালের শত অপরাধ অতিক্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করেন। পাণ্ডব-কৌরবদের দ্যূতক্রীড়া সভায় কৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি শাল্বরাজের সৌভনগর বিনাশ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। দ্যূতক্রীড়া সভায় দুর্যোধন তার ভাই দুঃশাসনকে অন্যায়ভাবে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার আদেশ দেন। অসহায় দ্রৌপদী সভায় উপস্থিত তাঁর পাঁচ স্বামীসহ সকলের কাছে তাঁকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁদের তথাকথিত ধর্মের বেড়াজালে বন্দী থাকার ফলে কেউ দ্রৌপদীকে সাহায্য করতে পারেনি। এমতাবস্থায় কোনো উপায়ান্তর না দেখে দ্রৌপদী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্বক দুহাত তুলে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ অলৌকিকভাবে তখন অপরিমেয় বস্ত্র দানের মাধ্যমে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু-পাণ্ডু উভয়পক্ষই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আসেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত ছিলেন। প্রথমে দুর্যোধন কৃষ্ণের মাথার কাছে একটি উৎকৃষ্ট আসনে এসে বসেন। কিছুক্ষণ পর অর্জুন এসে কৃষ্ণের চরণের কাছে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কৃষ্ণ জাগ্রত হয়ে প্রথমে অর্জুন ও পরে দুর্যোধনকে দেখেন। তখন উভয়পক্ষই কৃষ্ণকে তাদের পক্ষে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ তখন বললেন যে, যদিও দুর্যোধন আগে এসেছে, তবুও অর্জুনকেই তিনি আগে দেখেছেন। তবে উভয়পক্ষকেই তিনি সাহায্য করবেন। একদিকে কৃষ্ণের দশকোটি নারায়ণী সেনা ও অপর দিকে তিনি স্বয়ং নিরস্ত্র। এ দুইয়ের মধ্যে তিনি আগে অর্জুনকেই বেছে নিতে বললেন। অর্জুন কৃষ্ণকেই বরণ করলেন, আর দুর্যোধন নিলেন নারায়ণী সেনা। যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবদের অনুরোধে কৃষ্ণ একবার শান্তিদূত হিসেবে হস্তিনাপুরে গিয়ে পাণ্ডবদের জন্য কেবল পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ না করার জন্য শান্তি-প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের আসুরিক বৃত্তি আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রমোহের কারণে শান্তি-প্রস্তাব নিষ্ফল হলো। তখন দুর্যোধন ক্রোধিত হয়ে কৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা করলে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের রাজসভায় তাঁর বিশ্বরূপের কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করেন (যা অর্জুনকে প্রদর্শিত বিশ্বরূপ থেকে ভিন্ন)।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথির ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করে জগজ্জীবের উদ্দেশ্যে পরম জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, যা

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থ মানব সমাজের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এ যুদ্ধে তিনি বন্ধুর মতো পরামর্শ দিয়ে ধর্মসংস্থাপনের জন্য পাণ্ডবদের জয়ে সাহায্য করেন। এমনকি ধর্ম সংস্থাপনার্থে তিনি দ্রোণ-বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের পরামর্শ ও অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের পরাক্রম দেখে তিনি স্বয়ং রথের চাকা হাতে ভীষ্মকে বধ করতে অগ্রসর হন। ভীষ্ম সানন্দে কৃষ্ণের হাতে তাঁর মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীষ্মকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হন। জয়দ্রথ, দ্রোণ ও কর্ণ-বধ কৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন হতো না। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিৎকে হত্যা করতে চাইলে কৃষ্ণ তাঁকে সেই ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করে গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন যে, এই জ্ঞাতিক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ হয়েও যেহেতু কৃষ্ণ তা নিবারণ করেননি, তাই এ যুদ্ধের পর যদুবংশের ধ্বংস হবে। যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয়লাভের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি পুনরায় হস্তিনাপুরে আসেন ও যজ্ঞ শেষে আবার দ্বারকায় ফিরে যান।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও যদুবংশ ধ্বংস

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দেখে যাদবগণকে প্রভাসে সরস্বতী নদীর তীরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করতে আদেশ করেন। তাঁরা কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে তাঁরা উৎসবে মগ্ন হন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে মদিরা পান করে নেশাগ্রস্ত হন। এভাবে বুদ্ধিহারা হয়ে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেন এবং অবশেষে তাঁরা কেউ জীবিত ছিলেন না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখেছেন– "ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদরা ভূ-ভার হরণ করার জন্য দেবতাদের সাহায্য করতে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাই তাঁর বিশ্বস্ত দেবতাদের যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মহানকার্য সাধনে তাঁকে তাঁরা সাহায্য করেন। সেই কার্য সম্পাদন হওয়ার পর ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সেই দেবতারা সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে সংহার করেছিলেন। এভাবে ভগবান তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।"

তারপর শ্রীবলরাম সমুদ্র তীরে গমন করে অলৌকিক যোগশক্তিবলে নিত্যধামে গমন করেন। বলদেবের অন্তর্ধান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে ভূমিতে উপবেশন করেন। তারপর জরা নামক এক শিকারি ভগবানের বাম পদতলকে হরিণ মনে করে তীর বিদ্ধ করে। শিকারি তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পতিত হয়ে দণ্ড গ্রহণের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করতে থাকে। তারপর ভগবান তাঁকে বলেন যে, সে যা করেছে তা তাঁর (ভগবানের) নিজ ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শিকারিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করে তিনি তাঁর নিত্যধামে প্রবেশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– "এ জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাঁর পরম ইচ্ছার উপর। সাধারণ জীবের মতো তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়ে কোনো উন্নত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে অন্য কোনো স্থানে তাঁর আবির্ভাব কিংবা তিরোভাব ব্যাহত না করেও যেকোনো স্থানে যেকোনো সময়ে আবির্ভূত হতে পারেন। সূর্যের যেমন জন্ম বা মত্যু হয় না, কেবল উদয় বা অস্ত হয়, তেমনি ভগবানেরও জন্ম বা মৃত্যু হয় না; তিনি কেবল তাঁর লীলা বিস্তারের জন্য এ জগতে আবির্ভূত বা অন্তর্হিত হন। "

পঞ্চবিংশতি বর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকংমুনে।
তিষ্ঠন জগাম্ গোলোকম্ পৃথিবীংশ পুরাতনঃ ॥

পুরাণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একশত পঁচিশ বছর এ ধরাধামে অবস্থান করে গোলোকে গমন করেছেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন– "*মাঘশ্রী তেষু তেষু তদ্ অন্তর্ধানম্ কলি প্রবেশম্।*" মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃষ্ণ এ জগৎ থেকে অন্তর্হিত হয়ে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন।
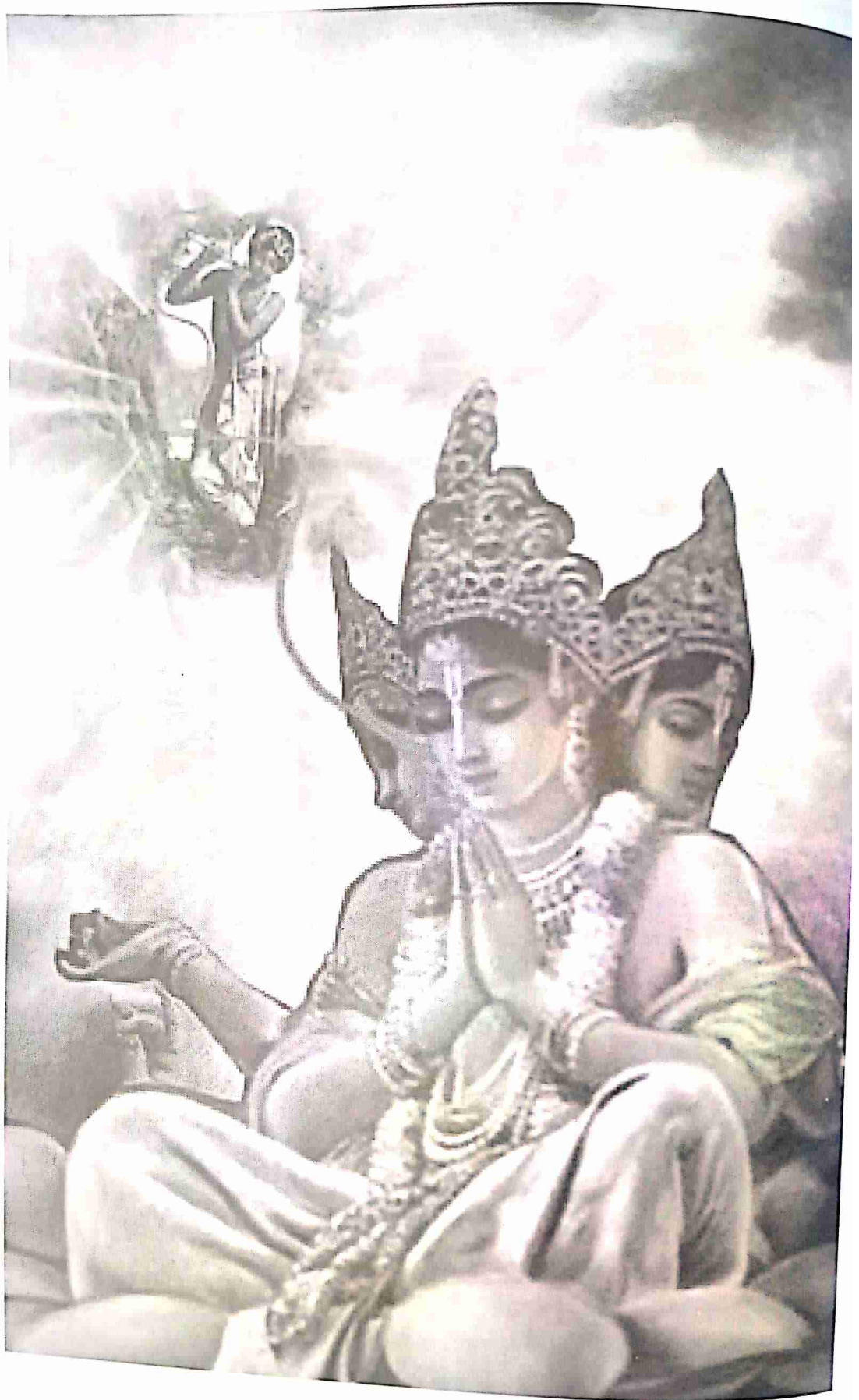
শ্রীব্রহ্মা

শ্রীব্রহ্মা

ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরীণ সৃষ্টিকার্য পরিচালনার দায়িত্বে যিনি নিযুক্ত, তিনি হলেন শ্রীব্রহ্মা। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটিতেই রয়েছেন পৃথক পৃথক ব্রহ্মা। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির। তাই ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতিভেদে ব্রহ্মার মস্তকসংখ্যারও তারতম্য হয়ে থাকে। বিশ, পঞ্চাশ, শত, সহস্র এমনকি লক্ষ মস্তকবিশিষ্ট ব্রহ্মা রয়েছেন। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডটি সবচেয়ে ছোট, তাই আমাদের ব্রহ্মার চারটি মস্তক। পদ্মযোনি ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে তাঁর উৎপত্তির উৎস খুঁজতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তার ফলে তিনি চারটি মুখ প্রাপ্ত হলেন। তিনি তাঁর চতুর্মুখে নিরন্তর শ্রীভগবানের দিব্য নাম ও গুণমহিমা কীর্তন করেন। এ জগতের সৃষ্টিকার্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তিনি সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিমগ্ন।

পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্ট এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব হলেন ব্রহ্মা। সৃষ্টির প্রারম্ভে কোনো পিতামাতা ব্যতীত সরাসরি ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই তাঁকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ বা অজ। অজ হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ প্রকাশ জীবতত্ত্ব; ভগবানের অত্যন্ত পুণ্যবান ভক্ত হওয়ার ফলে তাঁর কৃপায় তিনি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। কিন্তু কোনো কল্পে সেরকম যোগ্যতাসম্পন্ন জীব না পাওয়া গেলে, ভগবান নিজেই ব্রহ্মার রূপ পরিগ্রহ করেন। তিনি রজোগুণের অধিষ্ঠাতা বিগ্রহ এবং ভগবানের গুণাবতার। আবার, ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান বা আবিষ্ট হয়ে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন বলে তাঁকে শক্ত্যাবেশ অবতারও বলা হয়। জীব ও জগতের মূল উপাদানসমূহ ভগবান কর্তৃক সৃষ্টির পর তিনি জড় সৃষ্টিকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত হন; তাই তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু হলেন তাঁরও আদি বা পরম সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির আদিতে তাঁরই নিকট থেকে ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন। অথর্ববেদে সেকথা বলা হয়েছে–

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥

অর্থাৎ "ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে জগতে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান তিনি যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন তিনি শ্রীকৃষ্ণই।" সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যখন ধ্যানমগ্ন হলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তখন তাঁর কর্ণে বৈদিকমন্ত্র ওঙ্কাররূপে প্রবিষ্ট হলো। এভাবে ব্রহ্মা পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান লাভ করেন এবং সমস্ত জীবের প্রথম গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন।

ব্রহ্মার আবির্ভাব

ব্রহ্মার বিস্ময়কর অবির্ভাব ও কার্যকলাপ অমল পুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে– আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার হলেন

কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু, যাঁর লোমকূপ থেকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয় এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। তারপর তাঁর দেহ-নিঃসৃত স্বেদ জল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ বা 'গর্ভ' পূর্ণ করে সেই গর্ভোদকে (উদক = জল) তিনি শয়ন করেন। এই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি-সরোবর থেকে একটি পদ্ম উত্থিত হয় এবং ভগবানের ইচ্ছায় তা সূর্যের মতো সবকিছুকে উদ্ভাসিত করে বিশাল আকার ধারণ করে। সেই পদ্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষে পৌঁছায়, আর পদ্মের মৃণালটি (বোঁটা) বহুগুণে বিস্তৃত হয়ে এর ব্যাস ব্রহ্মাণ্ডের গাত্র স্পর্শ করে। সেই সর্বলোকময় বিকশিত পদ্মে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু স্বয়ং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন। তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীব্রহ্মা সেই পদ্ম থেকে আবির্ভূত হন।

ব্রহ্মার আত্ম-অনুসন্ধান ও তপস্যা

শ্বেতবরাহ কল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষ্ণুর নাভিকমল হতে আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মা কেবল নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পারছিলেন না; সমগ্র জগৎ শূন্য দেখছিলেন। পদ্মাসীন ব্রহ্মা সৃষ্টি সম্বন্ধে, সেই পদ্ম সম্বন্ধে, এমনকি নিজের সম্বন্ধেও যথাযথ বুঝতে পারলেন না। ব্রহ্মা তাঁর অজ্ঞানতাবশত ভাবতে লাগলেন– "আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম? কেন আমি এই জটিল অবস্থায় পতিত হয়েছি? কীভাবে আমি এ অবস্থা থেকে মুক্ত হব?"

"ব্রহ্মসূত্রে এ অনুসন্ধানকে বলা হয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। মানুষের মনুষ্যত্বের সূচনা তখনই হয়, যখন তার মনে এসমস্ত প্রশ্নের উদয় হতে শুরু করে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যতীত মানব জীবনে সমস্ত কর্মকেই ব্যর্থ বা অর্থহীন বলে গণ্য করা হয়।" (শ্রীল প্রভুপাদকৃত মুখবন্ধ, ভ.গী.)

"তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যিনি তাঁর নিজের ও সমগ্র জগতের অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং এভাবে তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার প্রয়াস করেন। তাঁর প্রচেষ্টা যদি তপস্যা ও অধ্যবসায় সহযোগে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবেন।" (শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, ভা. ৩/১২/৫৭) ব্রহ্মার ক্ষেত্রে এমনটিই হয়েছিল। এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পর প্রথমে তাঁর হৃদয়ে এ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল।

তারপর তিনি ভাবলেন, এ পদ্মের নিচে জলের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে যা থেকে পদ্মটি উদ্ভূত হয়েছে। এই ভেবে ব্রহ্মা পদ্মনালের ভেতর প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই নালের ভেতর প্রবেশ করে বিষ্ণুর নাভির নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, প্রথম গুরু এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা তাঁর কমলাসনের উৎস খুঁজে পেলেন না। পুনরায় তিনি পদ্মের উপর ফিরে গেলেন। এরপর জড় জগৎ সৃষ্টি করার বিষয়ে তিনি যখন চিন্তা করেছিলেন তখন তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কীভাবে এ কার্য শুরু করা যায়। তখন তিনি জলের মধ্য থেকে দুটি অক্ষর দুবার উচ্চারিত হতে শুনতে পেলেন। এ শব্দতরঙ্গ তাঁর কাছে দিব্য বলে মনে হয়েছিল। সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের ষোড়শ অক্ষর অর্থাৎ 'ত' এবং দ্বিতীয় বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের একবিংশতম অর্থাৎ 'প'। এই 'তপ' শব্দটি নিষ্কিঞ্চন ত্যাগীর একমাত্র ধন বলে পরিজ্ঞাত। শব্দটি শোনামাত্র ব্রহ্মা চতুর্দিকে সেই শব্দের উচ্চারণকারীকে অন্বেষণের চেষ্টা

করছিলেন। কিন্তু কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর কমলাসনে উপবিষ্ট হয়ে সেই নির্দেশ অনুসারে মনোযোগ দিয়ে তপস্যা করাই সমীচীন। স্বর্গের গণনা অনুসারে ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বর্ষ তপস্যা করেছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছিলেন এবং যে তপস্যা তিনি করেছিলেন তা সমস্ত জীবের পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষা। এভাবে তিনি সমস্ত তপস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বী বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

শ্রীভগবানের দর্শন লাভ ও বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্তি

ব্রহ্মার ভক্তিময় নিষ্কপট তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে নিজের শাশ্বত দিব্য রূপ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁকে এ জগতের সমস্ত গ্রহলোকের উর্ধ্বে তাঁর পরম ধাম বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিয়েছিলেন। ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ধাম সবরকম জড় ক্লেশ এবং সংসার ভয় থেকে মুক্ত আত্মবিদদের দ্বারা পূজিত।

ব্রহ্মা দেখলেন যে, ভক্তদের প্রভু, যজ্ঞপতি, জগৎপতি, লক্ষ্মীপতি সর্বশক্তিমান ভগবান সেই বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রেমপূর্বক সেবিত হয়ে বিরাজ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান সেখানে তাঁর ভৃত্যদের প্রসাদ বিতরণের জন্য উদগ্রীব। তাঁর আকর্ষণীয় রূপ অত্যন্ত মনোহর। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল অরুণ নয়ন শোভিত, তাঁর মস্তক কিরীটশোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর বক্ষস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষিত। সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং তিনি চতুঃ, ষোড়শ ও পঞ্চ শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অন্যান্য গৌণ শক্তিসহ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর স্বীয় ধামে রম্যমান পরমেশ্বর ভগবান।

ব্রহ্মা যখন এভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর নাভি সরোবর, পদ্মফুল, প্রলয় বারি, প্রলয় বায়ু ও আকাশ দর্শন করলেন। প্রলয় জলে ব্রহ্মা এক বিশাল পদ্মসদৃশ শয্যা দেখতে পেয়েছিলেন যা ছিল শেষনাগের শরীর এবং তাতে পরমেশ্বর ভগবান একাকী শায়িত ছিলেন। চতুর্দিক শেষনাগের মাথার মণির কিরণে উদ্ভাসিত ছিল এবং সেই জ্যোতি সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল। সবকিছু তখন তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল। এভাবে রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হন এবং সৃজনোন্মুখ মনোবৃত্তির অভীষ্ট মার্গে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রার্থনা নিবেদন করেন।

ব্রহ্মা বললেন– "হে প্রভু, বহু বহু বছরের তপস্যার পর আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। কিন্তু হায়, দেহধারী জীবেরা কী দুর্ভাগা যে, তারা আপনাকে জানার অযোগ্য! হে প্রভু, আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, কেননা আপনার অতীত আর কোনো পরমতত্ত্ব নেই।"

"পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে কেবল ভগবানের কৃপার মাধ্যমেই জানা যায়, ব্রহ্মা এবং তাঁর পরম্পরায় শুদ্ধ ভক্তদেরই কেবল ভগবান কৃপা করেন। কেবল তপস্যার প্রভাবেই ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং উপলব্ধির মাধ্যমেই তিনি তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পেরেছিলেন।" –শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য ভা. ৩/৯/১

ব্রহ্মা বললেন– "হে প্রভু, আপনার এই বর্তমান স্বরূপ অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য যেকোনো স্বরূপ, সমগ্র জগতের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। যারা নরকগামী, তারা আপনার সবিশেষ রূপকে উপেক্ষা করে, কেননা তারা জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন। যেহেতু আপনি আপনার নিত্য শাশ্বত রূপ প্রকাশ করেছেন, যে রূপে আপনার ভক্তরা আপনার ধ্যান করে, তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

এভাবে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করে ব্রহ্মা আনন্দে বিহ্বল হলেন এবং দিব্য প্রেম ও আনন্দে তাঁর নেত্র প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হলো। তিনি তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন। পরমহংসদের মার্গ অনুসরণ করলেই কেবল এই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। তখন প্রেমবশ ভগবান প্রসন্ন চিত্তে উপদেশ প্রদানের যোগ্য পাত্র ব্রহ্মার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ হয়ে তাঁর হাত ধরে ঈষৎ হাস্য সহকারে সুমধুর সম্ভাষণে বলতে শুরু করলেন–

"হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা, সৃষ্টির বাসনায় তুমি যে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। কপট যোগীরা কখনো আমার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে না। হে ব্রহ্মা, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি আমার কাছে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করো। কেননা আমি একমাত্র বর প্রদানের কর্তা। শ্রেয় লাভের জন্য সকলে যে পরিশ্রম করে, আমার দর্শনই তার চরম ফল। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম দক্ষতা হচ্ছে আমার ধাম দর্শন করা এবং তোমার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে, কারণ আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি শ্রদ্ধা সহকারে কঠোর তপস্যা করেছ। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি যখন তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলে, তখন আমিই তোমাকে তপস্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই তপস্যা আমার হৃদয় এবং আমি তপস্যার আত্মা। তাই তপস্যা আমার থেকে অভিন্ন। এই প্রকার তপস্যার দ্বারা আমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করি, পালন করি এবং সেই শক্তির দ্বারাই আমি তা সংবরণ করি। অতএব তপস্যাই হচ্ছে বাস্তবিক শক্তি।"

ব্রহ্মা বললেন– "হে ভগবান, পরম নিয়ন্তারূপে আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং তাই আপনি আপনার অপ্রতিহত প্রজ্ঞার প্রভাবে সকলেরই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবগত। হে প্রভু, তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি কৃপা করে আমার বাসনা চরিতার্থ করুন। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আপনার চিন্ময় রূপ সত্ত্বেও আপনি কীভাবে জড় রূপ পরিগ্রহ করেছেন, কীভাবে আপনার বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে সংহার করেন, সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন। হে মাধব, দয়া করে সে সমস্ত বিষয় দর্শনদানের মাধ্যমে আমাকে অবগত করুন। ঊর্ণনাভের মতো আপনি আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন এবং আপনার সংকল্প অচ্যুত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, যাতে করে আমি আপনার প্রদত্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে আপনার প্রতিনিধিরূপে জীব সৃষ্টির কার্য সম্পাদন করতে পারি এবং সেই কার্যে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধ হয়ে না পড়ি। হে প্রভু, বন্ধু যেভাবে বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে, আপনিও সেভাবে আমার সঙ্গে আচরণ করেছেন (যেন আমি আপনার সমকক্ষ)। বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টির ব্যাপারে আমি যুক্ত হব, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তার ফলে আমি নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করে গর্বিত না হই।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন– "শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং তা ভক্তি সহকারে উপলব্ধি করতে হয়। সেই পন্থার আনুষঙ্গিক অঙ্গসমূহ আমি বিশ্লেষণ করছি, তুমি তা যত্ন সহকারে শ্রবণ করো। আমার সবকিছু, যথা আমার নিত্যরূপ এবং আমার চিন্ময় অস্তিত্ব, বর্ণ, গুণাবলি এবং কার্যকলাপ, আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক।"

"হে ব্রহ্মা, সৃষ্টির পূর্বে আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এ সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব। হে ব্রহ্মা, আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত কোনোকিছু যদি অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলেও তার কোনো বাস্তবতা নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো। হে ব্রহ্মা, জেনে রেখো যে, মহাভূতসমূহ যেমন উচ্চনীচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনই আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি। যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় এ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করতে হবে। হে ব্রহ্মা, তুমি একাগ্র চিত্তে আমার এ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করো, তা হলে কল্পে ও বিকল্পে কোনোরকম অহঙ্কার তোমাকে বিচলিত করবে না। আমার নির্দেশ অনুসরণ করে পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব কারণের পরম কারণ আমার থেকে সরাসরি যে দেহ তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তার দ্বারা এখন প্রজা সৃষ্টি করো।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে (তাৎপর্য ২/৯/৩১) লিখেছেন– "এ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাই ব্রহ্মাকেই ভগবান চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর চারটি মুখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যা চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে পরিচিত। ব্রহ্মার প্রশ্নগুলো ছিল– (১) জড় এবং চিন্ময় উভয় স্তরে ভগবানের রূপ কী রকম? (২) ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কীভাবে ক্রিয়া করে? (৩) ভগবান কীভাবে তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে লীলা বিলাস করেন? (৪) ব্রহ্মা কীভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবেন? সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ভূমিকাস্বরূপ ভগবান ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধীয় পরম তত্ত্বজ্ঞান যা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ভগবানের কৃপায় আত্ম-উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।"

ব্রহ্মা তাঁর আবির্ভাবের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর কৃপা লাভের জন্য মন এবং বাণীর ক্ষমতা অনুসারে প্রার্থনা করেছিলেন। ভগবান দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মা বিভিন্ন গ্রহলোকের সৃষ্টির পরিকল্পনা বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রলয়-বারি দর্শনে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গাম্ভীর্যপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তাঁর মোহ অপনোদন করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তখন বললেন– "হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা, সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের বিষয়ে তুমি বিষাদগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি আমার কাছে যা প্রার্থনা করছো, তা পূর্বেই তোমাকে প্রদান করা হয়েছে।"

হে ব্রহ্মা, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তুমি তপস্যায় ও ধ্যানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। সেই কর্মের দ্বারা তুমি তোমার হৃদয়াভ্যন্তর থেকে সবকিছু জানতে পারবে। তুমি যখন ভক্তিযোগে সমাহিত হবে, তখন তোমার সৃষ্টিকার্যে, তোমার মধ্যে ও বিশ্ব জুড়ে আমাকে দেখতে পাবে এবং তুমি দেখবে যে, তুমি, সমগ্র জগৎ ও সমস্ত জীব– সকলেই আমার মধ্যে অবস্থিত।

"ভগবান এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্রহ্মার দিবাভাগে ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করবেন। তিনি দেখবেন, কীভাবে ভগবান বৃন্দাবনে বাল্যলীলা-বিলাস করার সময় নিজেকে গোপবালক এবং গোবৎসরূপে বিস্তার করবেন; তিনি জানতে পারবেন কীভাবে মা যশোদা তাঁর বাল্যলীলা-বিলাসের সময় তাঁর মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও গ্রহ-নক্ষত্র দর্শন করবেন এবং তিনি দেখবেন যে, কোটি কোটি ব্রহ্মা রয়েছেন যাঁরা তাঁদের দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সময় তাঁর কাছে আসবেন। কিন্তু ভগবানের এ সমস্ত নিত্য শাশ্বত রূপ যদিও সর্বত্র প্রকাশিত হয়, তবুও ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় সর্বদাই পূর্ণরূপে মগ্ন শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না। ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট যোগ্যতার ইঙ্গিতও এখানে দেয়া হয়েছে।" (শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, ভা. ৩/৯/৩১)

ভক্তদের দিব্য আনন্দ প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ লোকসমূহের পরম আধিপত্যে স্থিত ব্রহ্মাকে এভাবে উপদেশ প্রদান করে তাঁর সামনে থেকে তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ অন্তর্হিত করলেন। পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে একশত দিব্য বর্ষ তপস্যা করার পর, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ব্রহ্মার কর্ণে বৈদিকমন্ত্র ওঙ্কাররূপে প্রবিষ্ট হলো। এভাবে ব্রহ্মা পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান লাভ করলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর মহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাঁকে তিনি পূর্বে দর্শন করতে পারেননি।

"ব্রহ্মার আয়ু গণনা করা হয় দিব্য যুগের মাধ্যমে, যা মানুষের সৌর বছরের গণনা থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) দিব্য বৎসরের গণনা করে বলা হয়েছে– *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ*। ব্রহ্মার একদিন এক সহস্র চতুর্যুগের (৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের) সমান। সেই গণনায় সর্ব কারণের পরম কারণকে হৃদয়ঙ্গম করার পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মা শত বৎসর ধরে ধ্যান করেছিলেন এবং তারপর তিনি ব্রহ্মসংহিতা রচনা করেছিলেন, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত হয়েছে এবং যাতে তিনি গেয়েছেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*।"(শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য ভা. ৩/৮/২২)

ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য

তারপর ব্রহ্মা দেখলেন, যে পদ্মে তিনি অবস্থান করছিলেন এবং যে জলের ভেতর থেকে সেই পদ্মটি উদ্ভূত হয়েছিল, উভয়ই প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে কম্পিত হচ্ছে। দীর্ঘ তপস্যা এবং আত্মোপলব্ধির চিন্ময় জ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রহ্মা ব্যবহারিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি জলসহ সেই বায়ু সম্পূর্ণরূপে পান করেছিলেন। তারপর

তিনি দেখলেন, যে পদ্মে তিনি সমাসীন ছিলেন তা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, পূর্বে প্রলয়ের সময় এই কমলে যে গ্রহসমূহ লীন হয়েছিল, সেগুলো তিনি কীভাবে সৃষ্টি করবেন। তখন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেই পদ্মটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং তারপর চৌদ্দটি ভাগে বিভক্ত করলেন।

ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর পরিপক্ক চিন্ময়জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ। তাই তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের বাসের জন্য চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশক তম, দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং মোহ ও ভোগের ইচ্ছা, তামিস্র বা ভোগেচ্ছার বাধা থেকে ক্রোধের সঞ্চার, অন্ধতামিস্র বা ভোগ্যবস্তুর নাশে মৃত্যু ঘটল এরূপ বুদ্ধি এবং অন্যান্য অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রকার ভ্রমোৎপাদক সৃষ্টিকে পাপীয়সী কৃত্য বলে দর্শন করে ব্রহ্মা তাঁর কার্যকলাপে তৃপ্ত হতে পারেননি এবং তাই তিনি ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল করে অন্যান্য সৃষ্টি শুরু করেছিলেন।

তারপর ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন উর্ধ্বরেতা এবং জড়জাগতিক কার্যকলাপে অনিচ্ছুক। ব্রহ্মা মহর্ষিদের সৃষ্টি করে তাঁদের বললেন– "হে পুত্রগণ, এখন তোমরা প্রজা সৃষ্টি করো"। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, মোক্ষনিষ্ঠ কুমারেরা সে কার্যে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে, ব্রহ্মার অন্তরে দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল। যদিও তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তা তাঁর ভ্রুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ নীল–লোহিত বর্ণের একটি শিশুর রূপ নেয়, যাকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়।

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে, সন্তান-সন্ততি বিস্তার করার জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও দশম পুত্র নারদ এভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ ও দিব্য ভাবনা থেকে নারদের জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল তাঁর নিশ্বাস থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি থেকে, ভৃগু তাঁর ত্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হস্ত থেকে। পুলস্ত্য কান থেকে, অঙ্গিরা মুখ থেকে, অত্রি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মার যে স্তনে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন, সেখান থেকে ধর্ম উৎপন্ন হয়েছিল এবং অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ অধর্ম থেকে লোকের ভয়াবহ মৃত্যু সংঘটিত হয়। কাম ও বাসনা ব্রহ্মার হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, ক্রোধ তাঁর ভ্রুযুগলের মধ্য থেকে, লোভ তাঁর অধরের মধ্য থেকে, বাণী তাঁর মুখ থেকে, সমুদ্র তাঁর শিশ্ন থেকে, সমস্ত পাপের উৎস সব রকম জঘন্য কার্যকলাপ তাঁর মলদ্বার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মহীয়সী দেবহুতির পতি মহর্ষি কর্দম ব্রহ্মার ছায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এভাবে জগতের সমস্ত বস্তু ব্রহ্মার শরীর অথবা মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

ব্রহ্মার বাক্ নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হয়ে তাঁকে অভিলাষ করেছিলেন, কিন্তু সেই কন্যা নির্বিকার ছিলেন। যদিও তিনি সেই পাপের কথা কেবল চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু সেই পাপ কর্মে লিপ্ত হননি। তবুও মরিচী প্রমুখ ব্রহ্মার পুত্রেরা এভাবে তাঁদের পিতাকে বিভ্রান্ত হয়ে অনৈতিক আচরণ করতে দেখে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বললেন– "হে পিতা, এ ব্রহ্মাণ্ডে আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এ আচরণ আপনার শোভা পায় না, কেননা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য জনগণ আপনার চরিত্রের অনুসরণ করে।" প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা তাঁর পুত্রদের ভর্ৎসনায় অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সেই দেহ তখন সবদিকে অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুজ্‌ঝটিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

"ব্রহ্মার নিজের কন্যার প্রতি কামাসক্ত হওয়ার এ ঘটনার কথা বর্ণনা করতে ঋষি মৈত্রেয় প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তা উল্লেখ করেছেন, কেননা কখনো কখনো এমন ঘটতে পারে এবং তার জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি হয়েও ব্রহ্মা যদি যৌন আবেদনের শিকার হতে পারেন, তাহলে জাগতিক দুর্বলতার বশবর্তী অন্যান্য জীবদের আর কী কথা? ব্রহ্মার চরিত্রের এ অস্বাভাবিক অনৈতিকতা কোনো বিশেষ কল্পে ঘটেছিল বলে শোনা যায়, তবে যেই কল্পে ব্রহ্মা সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন, সেই কল্পে তা ঘটেনি, কেননা ভগবান ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পর তিনি আর কখনো মোহগ্রস্ত হবেন না। তা থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে তিনি এ প্রকার কামার্ত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার পর, তাঁর আর এরূপ অধঃপতনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"(শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য ভা. ৩/১২/২৮)

কোনো এক সময় ব্রহ্মা চিন্তা করছিলেন কীভাবে তিনি বিগত কল্পের মতো বিশ্ব সৃষ্টি করবেন। তখন তাঁর চার মুখ থেকে বিবিধ জ্ঞান সমন্বিত চতুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের চার প্রকার উপকরণ– যজমান (মন্ত্রগায়ক), হোতা, অগ্নি এবং উপবেদের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত কর্ম প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ধর্মের চারটি স্তম্ভ– সত্য, তপ, দয়া ও শৌচ এবং চারটি বর্ণের কর্তব্য সব কিছুই প্রকাশিত হয়েছিল।

যেহেতু তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি তখন তাঁর মুখ থেকে পঞ্চম বেদ– পুরাণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি বিভাগ– কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজক ও পরমহংস; এগুলো ব্রহ্মা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তর্কবিদ্যা, বেদ নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য, আইন-শৃঙ্খলা, নীতিশাস্ত্র এবং গায়ত্রী মন্ত্র– সবই ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রণব ওঙ্কার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে।

ব্রহ্মার আত্মা থেকে স্পর্শবর্ণ, দেহ থেকে স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয় থেকে উষ্মবর্ণ, বল থেকে অন্তঃস্থবর্ণ এবং তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ থেকে সঙ্গীতের সাতটি স্বর উদ্ভূত হয়েছে।

শব্দ-ব্রহ্মের উৎসরূপে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধারণার অতীত। তিনি বিবিধ শক্তি সমন্বিত।

তারপর ব্রহ্মা অন্য আরেকটি শরীর গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, মহাবীর্যবান ঋষিদের উপস্থিতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল না, তখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। তিনি চিন্তা করলেন, নিজের দেহ থেকে এভাবে সৃষ্টি না করে, নারী-পুরুষের মাধ্যমে সংসার সৃষ্টি হোক। তখন তাঁর দেহ থেকে আরো দুই মূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা হলেন মনু ও শতরূপা।

সে সময় থেকে মৈথুনের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রজা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনু ও শতরূপা মিলিত হয়ে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি, প্রসূতি ও দেবাহূতি নামে তিন কন্যার জন্ম দেন। মনু তাঁর প্রথম কন্যা আকুতিকে রুচি নামক ঋষিকে দান করেন, মধ্যমা কন্যা দেবাহূতিকে কর্দম ঋষিকে দান করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষের নিকট দান করেন। তাঁদের দ্বারাই সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে।

বিশ্বের প্রজা সৃষ্টির ইতিহাস এখানে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন এ ব্রহ্মাণ্ডের আদি জীব, যাঁর থেকে স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর স্ত্রী শতরূপার উৎপত্তি হয়। মনু থেকে দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয় এবং তাদের থেকে বিভিন্ন লোকে আজ পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রাদুর্ভূত হচ্ছে। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন সকলের পিতামহ এবং পরমেশ্বর ভগবান, ব্রহ্মার পিতা হওয়ার ফলে, সমস্ত জীবের প্রপিতামহ নামে পরিচিত। ভগবদ্গীতায় (১১/৩৯) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে–

বায়ুর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥

"আপনি বায়ু, ধর্মরাজ, অগ্নি, বরুণ আদি সকলের প্রভু। আপনি চন্দ্র, এবং আপনি হচ্ছেন প্রপিতামহ। তাই আমি বার বার আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

সৃষ্টি করার জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে রজোগুণ দিয়েছিলেন। রজোগুণের মধ্যে রয়েছে সংকল্প, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা। চতুর্মুখ ব্রহ্মা রজোগুণ প্রভাবে স্থাবর, জঙ্গম, খেচর, ভূচর, জলচর ও উভচর প্রাণী প্রজাতির সৃষ্টি করলেন। নয় লক্ষ প্রজাতির জলজ প্রাণী, কুড়ি লক্ষ প্রজাতির গাছপালা, এগারো লক্ষ প্রজাতির কীটপতঙ্গ, দশ লক্ষ প্রজাতির পাখি, ত্রিশ লক্ষ প্রজাতির পশু এবং চার লক্ষ প্রজাতির মানুষ প্রজাতি সৃষ্টি করলেন।

"প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন জীবদের পূর্বকল্পে তাদের কর্ম অনুসারে দেহ প্রদান করার ক্ষমতা কেবল তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মাজীর কর্তব্য হচ্ছে জীবদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তাদের উপযুক্ত কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত করা। ব্রহ্মাজী তাঁর খেয়াল-খুশিমতো বিভিন্ন স্তরের জীব সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তিনি জীবদের উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর দান করার কার্যে নিযুক্ত।

এমন মহান দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই সচেতন যে, তিনি কেবল ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র এবং তিনি সর্বদাই সতর্ক থাকেন যেন কখনো তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে না করেন।" –শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য ভা. ২/৯/৩০

ব্রহ্মা-বিমোহন লীলা

শাস্ত্রে বিভিন্ন কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন প্রকার লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম ব্রহ্মা-বিমোহন লীলা। শ্রীমদ্ভাগবতে এর বর্ণনা রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে তাঁর সখাদের সঙ্গে বনভোজন উপভোগ করছিলেন, তখন এ লীলা সংঘটিত হয়।

অঘাসুরকে বধ করে, তার মুখ থেকে গোপবালক ও গোবৎসদের রক্ষা করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিয়ে একটি সরোবরের তীরে এলেন এবং সেখানে আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। খেতে খেতে বালকেরা একে অপরের সঙ্গে হাস্যরস করতে লাগল। যে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, তিনি হাসতে হাসতে, উপহাস করতে করতে, বৃন্দাবনে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এভাবে বনভোজন করছিলেন। ইতোমধ্যে অঘাসুর বধের পর স্বর্গের দেবতারা যখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সেই ঘটনা দর্শন করছিলেন, ব্রহ্মাও তা দেখতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণের মতো একটি শিশুকে এরকম অদ্ভুত কার্য করতে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও শুনেছিলেন যে, এই ছোট্ট গোপবালকটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তাঁর আরো অধিক মহিমামণ্ডিত লীলা দর্শন করার প্রয়াসী হয়ে তিনি সমস্ত গোবৎসদের এবং গোপ-শিশুদের চুরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। সে সময় গোবৎসগুলো কাছেই গোচারণ ভূমিতে ঘাস খেতে খেতে নতুন ঘাসের হাতছানিতে ধীরে ধীরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। বালকরা হঠাৎ দেখল যে, বাছুরগুলো কাছাকাছি কোথাও নেই। কৃষ্ণ তাদের বললেন, "তোমরা খাও, আমি দেখছি গোবৎসগুলো কোথায় গেল"। এভাবে কৃষ্ণ তখন উঠে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় এবং ঝোপঝাড়ে বাছুরদের খুঁজতে লাগলেন। তাদের খুঁজতে খুঁজতে তিনি বনের ভেতরেও প্রবেশ করলেন, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না। এরপর সরোবরের তীরে যেখানে বসে তাঁর সখারা বনভোজন করছিল, সেখানে তাঁর সখাদেরও দেখতে পেলেন না। তখন সর্বান্তর্যামী শিশু কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মা তাঁর গোপসখা এবং গোবৎসদের চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি তখন ভাবলেন, "আমি এখন একা কীভাবে বাড়ি ফিরে যাব? সকল গোপবালকের মায়েরা তাঁদের সন্তানদের না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।"

তাই মায়েদের দুঃখ মোচন এবং ব্রহ্মার কাছে তাঁর পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি নিজেকে গোপশিশু এবং গোবৎসরূপে প্রকাশিত করলেন, যাদের রূপ, আকৃতি, সাজসজ্জা, আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ ছিল অবিকল তাদেরই মতো। তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব, কেননা সবকিছু তাঁরই শক্তির প্রকাশ। এভাবে নিজেকে গোপশিশু এবং গোবৎসরূপে প্রকাশ করে তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণ বাড়ি ফিরে গেলেন। ব্রজবাসীরা এর কিছুই বুঝতে পারেনি। গোবৎসগুলো তাদের নিজ নিজ গোশালায় ফিরে গেল এবং বালকেরা তাদের নিজ নিজ গৃহে তাদের মায়ের কাছে ফিরে গেল।

বলরামের অনুরোধে কৃষ্ণ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন কথা বলছিলেন, ব্রহ্মা তখন তাঁর সময়ের পরিমাণে এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত গোপশিশু এবং গোবৎসদের একটা পাহাড়ের গুহায় রেখে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তাদের ঠিক আগের মতো খেলা করতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ভাবতে লাগলেন, "আমি এদের মায়াশয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। তাহলে কী করে সেই বালক ও গোবৎসরাই এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে? তার মানে কী তারা আমার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি? তারা কী গত এক বছর ধরে এভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে?" ব্রহ্মা বুঝতে চেষ্টা করলেন যে, তারা কে এবং কীভাবেই বা তারা তাঁর মায়ার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এভাবে খেলা করছে! তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি নিজেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পড়লেন।

সেই গোবৎস এবং গোপবালকেরা যে আসল গোবৎস ও গোপবালক নয়, তা ব্রহ্মাকে বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত করলেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত গোবৎস এবং গোপবালকেরা ব্রহ্মার মায়ার প্রভাবে নিদ্রামগ্ন ছিল, কিন্তু ব্রহ্মা যাদের দেখেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রকাশ। বিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, তাই ব্রহ্মার সামনে সে সমস্ত গোপবালকেরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। তাঁরা সকলেই দিব্য সৌন্দর্যে ভূষিত ছিলেন। তাঁদের দর্শন করার পর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অনেক অনেক ব্রহ্মা, শিব, দেব-দেবী, জীবসমূহ, এমনকি পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র জীব এবং অতি ক্ষুদ্র তৃণ, গুল্ম, স্থাবর, জঙ্গম সবকিছুই মূর্ত হয়ে তাঁদের ঘিরে নৃত্য করছেন। তাঁদের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মধুর সুরে গান হচ্ছে এবং বাজনা বাজছে, যেন তাঁরা সকলেই সেই বিষ্ণুমূর্তিগণের পূজা করছিলেন।

ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা কোনো যৌগিক শক্তির প্রভাবে বা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হননি। এমনকি তাঁরা বিষ্ণুমায়ার প্রভাবেও এই বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হননি। তাঁরা হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। ব্রহ্মা যখন তাঁর সীমিত শক্তি এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত সীমিত চেতনা নিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনিও জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ একটি জীবমাত্র এবং তিনি ভগবানের হাতের ক্রীড়নক। পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বুঝতে না পেরে ব্রহ্মা বিমোহিত হলেন।

ব্রহ্মার এ অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা হলো। তিনি তখন সেই দৃশ্য থেকে যোগমায়ার আবরণ সরিয়ে নিলেন। ব্রহ্মা যখন একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন তাঁর মনে হলো যেন তিনি মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হলেন। অনেক কষ্টে তিনি তাঁর চোখ খুলে ভগবানের নিত্য ধাম দর্শন করতে সক্ষম হলেন। তিনি দেখলেন যে, সেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি ছোট গোপশিশুরূপে তাঁর লীলাবিলাস করছেন। চতুর্ভুজ ব্রহ্মা তখন তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে ভগবানের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। ব্রহ্মার গায়ের রং সোনার মতো, তাই তাঁকে দেখে মনে হলো যেন একটি স্বর্ণদণ্ড শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে পড়ে আছে। ব্রহ্মার মাথার চারটি মুকুট ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে

স্পর্শ করল। আনন্দের আতিশয্যে ব্রহ্মার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল এবং সেই অশ্রুধারায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল ধৌত করলেন। তিনি বারবার ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে তাঁর অপূর্ব লীলাসমূহ স্মরণ করতে লাগলেন এবং গদগদ বাক্যে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। তারপর ব্রহ্মা গোপবালক ও গোবৎসদের ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর ব্রহ্মা তাঁর কৃত অপরাধের জন্য দণ্ড প্রার্থনা করলে ভগবান তাঁকে নবদ্বীপ ধামে গিয়ে 'গৌরাঙ্গ' নাম জপ করার নির্দেশ দেন। তখন ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানালে পরমেশ্বর ভগবান স্মিতহাস্যে ইঙ্গিত করে তাঁকে ব্রহ্মলোকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

পরবর্তীতে নবদ্বীপে ব্রহ্মা গৌরাঙ্গ নাম জপ করতে থাকলে ভগবান গৌরসুন্দর সেখানে আবির্ভূত হন। তখন ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে আশীর্বাদ দিতে চাইলে ব্রহ্মা আশীর্বাদস্বরূপ তাঁর লীলায় অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। তখন ভগবান ব্রহ্মাকে গৌরলীলায় হরিদাস ঠাকুররূপে জন্মগ্রহণ করার আশীর্বাদ প্রদান করলেন যাতে করে ব্রহ্মা তাঁর উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে দীনভাবে ভগবানের সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

নারদমুনিকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রদান

ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী পুত্রদের মধ্যে নারদ সবচেয়ে প্রিয়। দেবর্ষি ও ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁর পিতাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন এবং মায়াধীশ বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন– "হে মহারাজ পরীক্ষিত, আপনি এখন আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, পূর্বে দেবর্ষি নারদ লোকসমূহের পিতা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন দেখতে পেয়ে সে সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন।" এরপর ব্রহ্মা তাঁর পুত্র নারদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দশ লক্ষণবিশিষ্ট (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্ম বাসনা, মন্বন্তর, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়) ভাগবত-পুরাণ উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে মাত্র চারটি শ্লোকের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

ব্রহ্মা নারদমুনিকে বললেন– "হে বৎস নারদ, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমার থেকে পরতর পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অবশ্যই আমার বীর্যবতী কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হয়। ভগবান তাঁর স্বীয় জ্যোতি (ব্রহ্মজ্যোতি) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করার পর তাঁরই শক্তিতে সেই ভগবৎ প্রকাশিত বস্তুকে আমি পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করি, ঠিক যেমন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, আকাশ, প্রভাবশালী গ্রহসমূহ, নক্ষত্র আদি প্রকাশিত হয়। আমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর ধ্যান করি, যাঁর দুর্জয় মায়া অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তারা আমাকে পরম নিয়ন্তা বলে মনে করে।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। সমস্ত দেবতা তাঁরই অঙ্গ থেকে উদ্ভূত এবং তাঁরা সকলেই তাঁর সেবক; স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোকসমূহ তাঁরই জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান।

সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগ হচ্ছে নারায়ণকে জানবার বিভিন্ন উপায়, সর্বপ্রকার তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম অবস্থা হচ্ছে নারায়ণের ধামে প্রবেশ করা। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মারূপ তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তিনি পূর্বেই যা সৃষ্টি করেছেন আমি কেবল তা পুনঃপ্রকাশ করি। এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি।

হে ব্রাহ্মণ নারদ, সেই পরম দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবদের জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি সকলের, এমনকি আমারও নিয়ন্তা। সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবান, তাঁর শক্তির দ্বারা কাল, জীবের অদৃষ্ট এবং স্বভাব সৃষ্টি করেন এবং তিনি পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন।

হে নারদ, যেহেতু আমি, তুমি এবং শিব তাঁর চিন্ময় শক্তি অনুমান করতে পারি না, অন্য দেবতারা তা কী করে জানবে? আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবতার মহাবিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করেন। তাঁর শক্তি অজ্ঞেয় এবং অপরিমেয়, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানতে পারি কীভাবে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা কার্য করেন।"

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতাম্।
সংগ্রহোহয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু ॥

ব্রহ্মা বললেন, "ভাগবত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা পরমেশ্বর ভগবান আমার কাছে বিশ্লেষণ করেছেন এবং আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি খুব সুন্দরভাবে তা তুমি বিস্তার করো যাতে মানুষ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে অনায়াসে ভক্তিযোগের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।"
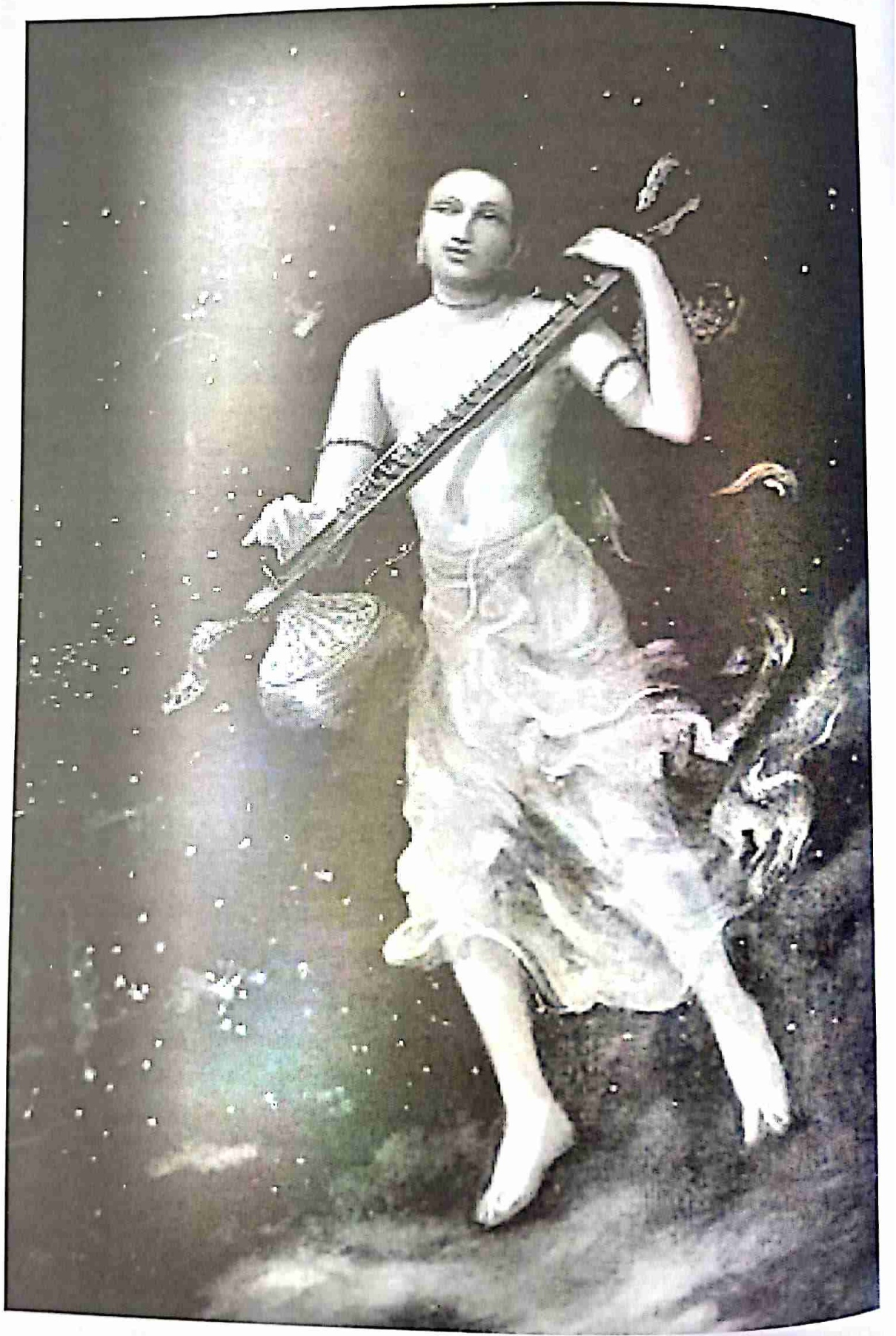
শ্রীনারদ মুনি

শ্রীনারদ মুনি

ঋষিকল্পে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর তৃতীয় শক্ত্যাবেশ অবতারে দেবর্ষি নারদরূপে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকজ্ঞ, বেদজ্ঞ তপস্বী এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। বেদের যে সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলো সংকলন করেন।

নারদ মুনি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের (৩/১২/২৫) তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন– "নারদ ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ চিন্তা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই 'পরমেশ্বর ভগবান'-কে দান করতে সমর্থ। বহু বৈদিক জ্ঞান অর্জন অথবা বহু রকমের তপশ্চর্যার দ্বারাও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু নারদ মুনির মতো শুদ্ধভক্তগণ তাঁদের সৎ ইচ্ছাক্রমে ভগবানকে দান করতে পারেন। নারদ নামটি ইঙ্গিত করে যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দান করতে পারেন। 'নার' মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান' এবং 'দ' মানে হচ্ছে 'যিনি দান করতে পারেন'। তিনি যে ভগবানকে দান করতে পারেন, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান এক রকম সামগ্রী যা যেকোনো ব্যক্তিকে দেওয়া যায়। কিন্তু নারদ মুনি যেকোনো ব্যক্তিকে ভগবানের প্রতি তার দিব্য প্রেমময়ী সেবার বাসনা অনুসারে দাস, সখা, পিতামাতা অথবা প্রেমিকরূপে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা দান করতে পারেন। অর্থাৎ নারদ মুনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার সর্বোত্তম যোগপন্থা বা ভক্তিযোগের মার্গ প্রদান করতে পারেন।"

গন্ধর্বরূপে নারদ মুনির জন্ম

ব্রহ্মা তাঁর অন্যান্য মানসপুত্রদের সঙ্গে নারদ মুনিকেও প্রজা সৃষ্টির ভার অর্পণ করেন; কিন্তু নারদ মুনি দেখলেন যে, সৃষ্টিকার্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে ভগবৎ চিন্তায় তাঁর বাধা পড়বে। তাই তিনি ব্রহ্মার এ আদেশ পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন। তাঁর অভিশাপে নারদ মুনি গন্ধমাদন পর্বতে উপবর্হণ নামে এক গন্ধর্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য গন্ধর্বেরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং দেহের গঠন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পুষ্পমাল্য এবং চন্দনে অলংকৃত নারদ মুনি ছিলেন পুর-স্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। তার ফলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি সর্বদা কামোন্মত্ত ছিলেন। তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

দাসীপুত্ররূপে নারদ মুনির জন্ম

একসময় দেবতাদের সভায় ভগবানের মহিমা কীর্তনের এক সংকীর্তন উৎসব হয়েছিল এবং প্রজাপতিরা সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নারদ মুনিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে ভগবানের মহিমা কীর্তনে

অবহেলা করে তিনি স্ত্রীপরিবৃত হয়ে দেবতাদের মহিমা গাইতে শুরু করেন। এর ফলে ভগবানের প্রতি তাঁর অপরাধ হয়েছিল। তাঁর প্রথম অপরাধ ছিল যে, তিনি কামার্তা কামিনী পরিবৃত হয়ে সংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন এবং তাঁর অন্য অপরাধ ছিল যে, তিনি দেব-কীর্তন বা সাধারণ গানকে সংকীর্তনের সমতুল্য বলে মনে করেছিলেন। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ প্রজাপতিগণ তাঁকে অভিশাপ দিলেন– "তোমার এ অপরাধের ফলে তুমি এক্ষুণি তোমার সৌন্দর্য রহিত হয়ে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করো।"

তখন নারদমুনি নরলোকে বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত কলাবতী নামে এক দাসীর গর্ভে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্ষার চাতুর্মাস্যে যখন সেই ঋষিরা একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন তিনি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই বেদজ্ঞ মুনিরা সমদর্শী হওয়ায় তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ছোট্ট একটি বালক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সংযত এবং সবরকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, তিনি দুরন্ত ছিলেন না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। একবার সেই মহাত্মাদের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করার ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন; তার ফলে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত নির্মল হয় এবং তিনি সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপ বর্ণনা করতেন, আর তাঁদের অনুগ্রহে তিনি তা শ্রবণ করতেন। এভাবে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে ভগবানের মহিমা শ্রবণে তাঁর রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁর প্রবৃত্তি ভগবদ্ভক্তির প্রতি প্রবাহিত হতে শুরু করে। তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করেছিলেন এবং দেহ ও মনের দ্বারা অবিচলিতভাবে ঋষিদের আজ্ঞা পালন করেছিলেন। দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান তাঁকে দান করেছিলেন। সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

গৃহত্যাগ

নারদ মুনির বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিল তাঁর স্নেহময়ী মাতা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য ভগবান তাঁর মাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিলেন। একসময় তাঁর মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে। নারদ মুনি সেই ঘটনাটি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করেন। গৃহত্যাগ করার পর তিনি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলেন। তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করেছিলেন এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর ও সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্গের দেবতাদের উপভোগ্য জলাশয় এবং স্থলভূমি

অতিক্রম করেছিলেন। তারপর তিনি নল, বাঁশ, শর, কুশ, লতাগুল্ম ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলেন। তিনি ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালের বিচরণ ক্ষেত্র। এভাবে ভ্রমণ করে তিনি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই পরিশ্রান্ত হয়ে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন নদীতে ও হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে তিনি তাঁর শ্রান্তি দূর করেছিলেন।

ভগবানের দর্শন লাভ

তারপর, জনমানবশূন্য একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে তিনি তাঁর বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলেন, সেই বর্ণনা অনুসারে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করলেন। তিনি যখন তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল।

আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে তিনি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং এমনকি নিজেকেও আর দর্শন করতে পারছিলেন না। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, নারদ মুনিরও সেরূপ হয়েছিল। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে পুনরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে তিনি আর দেখতে পাননি এবং এভাবে অতৃপ্ত হয়ে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলেন। সেই নির্জন স্থানে তাঁর প্রচেষ্টা দর্শন করে, তাঁর অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেই আকাশবাণীতে ভগবান বললেন–

"হে নারদ, এ জীবনে তুমি আর আমায় দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সবরকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে। হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য; কেননা তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হবে। অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্তের সেবা করা হয়, তবে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এ জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে। আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনোই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময়, এমনকি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।"

শব্দব্রহ্মরূপ ভগবানের বাণী সম্পন্ন হলে তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে নত মস্তকে

তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। এভাবে সবরকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে নারদ মুনি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করেন। কীর্তন করতে করতে তিনি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হওয়ার ফলে তিনি সমস্ত জড় বিষয় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, আর এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক চেতনায় উন্নত ভক্তের লক্ষণ। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলোকের প্রকাশ হয়, তেমনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময় দেহ লাভ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে একই সঙ্গে হয়েছিল।

নারদ মুনি রূপে আবির্ভাব

পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে নারদ মুনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে তাঁর সঙ্গ করার উপযুক্ত শরীর তিনি পাবেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে নারদ মুনি তাঁর জাগতিক দেহটি ত্যাগ করা মাত্রই চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন। আগুনের সংস্পর্শে লোহা যেমন গরম হয়ে আগুনের গুণ প্রাপ্ত হয়, ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় প্রভাবে নারদ মুনির মতো শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক শরীরও তেমনই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে শয়ন করলেন, ব্রহ্মা তখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদান নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং নারদ মুনিও তখন ভগবানের প্রশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। ৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বছর পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চতুষ্কুমার এবং রুদ্র, মরীচী, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে নারদ মুনিও ব্রহ্মার মন থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁরই প্রদত্ত (দেবদত্ত) বীণা বাজিয়ে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে করতে জড় জগতে এবং চিন্ময় জগতের সর্বত্র অপ্রতিহতভাবে ভ্রমণ করছেন।

নারদ মুনির বিশেষ গুণাবলি

বীণা বাজিয়ে গান করে তিনি সকলকে মোহিত করেন। সংবাদ ও পরামর্শদান, যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহাদি সংঘটনে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। নানাপ্রকার বার্তাদানে, দীক্ষাদানে, দৈত্য-বিনাশে, সহায়তাদানে, নিয়ম-নির্দেশ ও নীতি-পরামর্শদানে তিনি নিয়োজিত থাকেন। শিবের বিবাহে তিনি ঘটক, ধ্রুবের তপস্যায় তিনি মন্ত্রদাতা। দক্ষের দর্পনাশেও নারদ মুনি ছিলেন। এভাবে সর্বত্র বিচরণ করে তিনি একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে একের পর এক অঘটন ঘটান। তাই কেউ কেউ নারদ মুনিকে ভুল বুঝে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি তা করে থাকেন; আর তা হলো ভগবানের লীলার পুষ্টি বিধান করা। অর্থাৎ এর ফলে লীলা আরো বেশি মাধুর্যময়, রসময় ও আনন্দময় হয়ে ওঠে, যার ফলে ভগবান ও তাঁর ভক্তরা অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। অধিকন্তু, এর ফলে আমাদের মতো বদ্ধজীবও অনেক শিক্ষা পেয়ে থাকে, যার দ্বারা আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি।

ব্রহ্মার কাছ থেকে দিব্য জ্ঞান লাভ

ব্রহ্মার পরে গোপাল মন্ত্রের পরবর্তী গ্রহীতা হলেন নারদ মুনি। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনৎকুমারের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু ও শিষ্য হিসেবে তাঁদের কথোপকথন 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও 'শ্রী নারদপুরাণ' এবং 'নারদ পঞ্চরাত্র' সাহিত্যে তাঁদের আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। ধর্মীয় শাস্ত্রগুলোতে তাঁকে কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে জ্ঞান প্রদানে বা সকলের কাছে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিতে দেখা যায়। মহান মহান ভক্তদের অধিকাংশই নারদ মুনির শিষ্য। অমল পুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনার তিনিই ছিলেন মূল অনুপ্রেরণা।

যাইহোক, বিষ্ণুর নিকট তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্বের গীত শ্রবণ করে নারদ মুনি নিজের সঙ্গীতজ্ঞান অসম্পূর্ণ বোধ করেন। তখন বিষ্ণুর আদেশে উলুকেশ্বর নামে এক গন্ধর্বের কাছে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে নারদ জ্ঞানযোগ ও গীতাযোগ উপদেশামৃত শ্রবণ করে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, তিনি ব্রহ্মার নিকট থেকে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন। শুধু সঙ্গীতশিক্ষা নয়, ভগবদ্ভক্তির গুহ্যতম জ্ঞানও তিনি মূলত তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকেই লাভ করেন। এ ব্যাপারে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছেন–

"হে রাজন, জন্ম থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞান সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভগবান নিজ মুখে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, ব্রহ্মাও নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে সেকথাই বলেছিলেন।"

নারদ মুনি ব্রহ্মাকে বললেন– "হে পিতা, আপনি সমস্ত জীবের মধ্যে প্রথম জন্মা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দান করুন, যা মানুষকে আত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে।"

"হে পিতা, কৃপা করে আপনি আমাকে এই ব্যক্ত জগতের বাস্তবিক লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন। তার আশ্রয় কী? কীভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে? কীভাবে তার সংরক্ষণ হয় এবং কার নিয়ন্ত্রণে এ সব সম্পাদিত হচ্ছে? হে পিতা, আপনার জ্ঞানের উৎস কী? আপনি কার আশ্রয়ে রয়েছেন এবং কার অধীনে আপনি কার্য করছেন?"

এভাবে নারদ মুনি ব্রহ্মাকে ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর তিনি বললেন– "হে পিতা, আপনি সবকিছু বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানেন। তাই আমি আপনার কাছে যেসমস্ত প্রশ্ন করেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে তার উত্তর দিন যাতে আমি আপনার শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।"

নারদমুনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্রহ্মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন; এটিই হচ্ছে জ্ঞান লাভের পন্থা। *তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া (গীতা ৪/৩৪)*। তখন ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে বললেন– "হে বৎস নারদ, সকলের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে (এমনকি আমার প্রতিও) তুমি এসমস্ত প্রশ্ন করেছ, কেননা তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম দর্শন করে অনুপ্রাণিত হয়েছি।" তারপর ব্রহ্মা তাঁকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস।

পরমেশ্বরের শক্তিতেই তিনি ভগবৎসৃষ্ট বস্তুসমূহ পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা কেবল প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁকেই পরমতত্ত্ব বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণই হলেন সবকিছুর স্রষ্টা। বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান এমনকি সমস্ত কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা; মুক্তির উদ্দেশ্যও তা-ই।

এভাবে ব্রহ্মা একের পর এক নারদমুনির প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ, আত্মা-পরমাত্মা, সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবন এবং ভগবানের বিরাটরূপের বিস্তারসমূহ তিনি তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। এরপর বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য যে নির্দিষ্ট অবতারসমূহ, তাঁদের কথা তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– "হে নারদ, যদিও ভগবানের শক্তি অজ্ঞেয় এবং অপরিমেয়, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানতে পারি, কীভাবে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা কার্য করেন। শুদ্ধভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলে এবং ভক্তিযোগে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর আদি পাপীজীব, এমনকি পশুপাখিও ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অবগত হয়ে মায়ার মোহময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।"

তারপর ব্রহ্মা নারদমুনিকে বললেন– "হে নারদ, ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সংক্ষেপে আমাকে বলেছিলেন। এই ভগবতত্ত্ব-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এ বিজ্ঞান সম্প্রসারিত করো। নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি বর্ণনা করো যাতে সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি মানুষ অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে। ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর শিক্ষা অনুসারে কীর্তন, অভিনন্দন এবং শ্রবণ করা উচিত। নিয়মিতভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তা করা হলে জীব কখনোই মায়ার দ্বারা মোহিত হবে না।"

এভাবে নারদমুনি তাঁর পিতা ও গুরু ব্রহ্মার কাছ থেকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তীতে ব্যাসদেবকে সেই দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন।
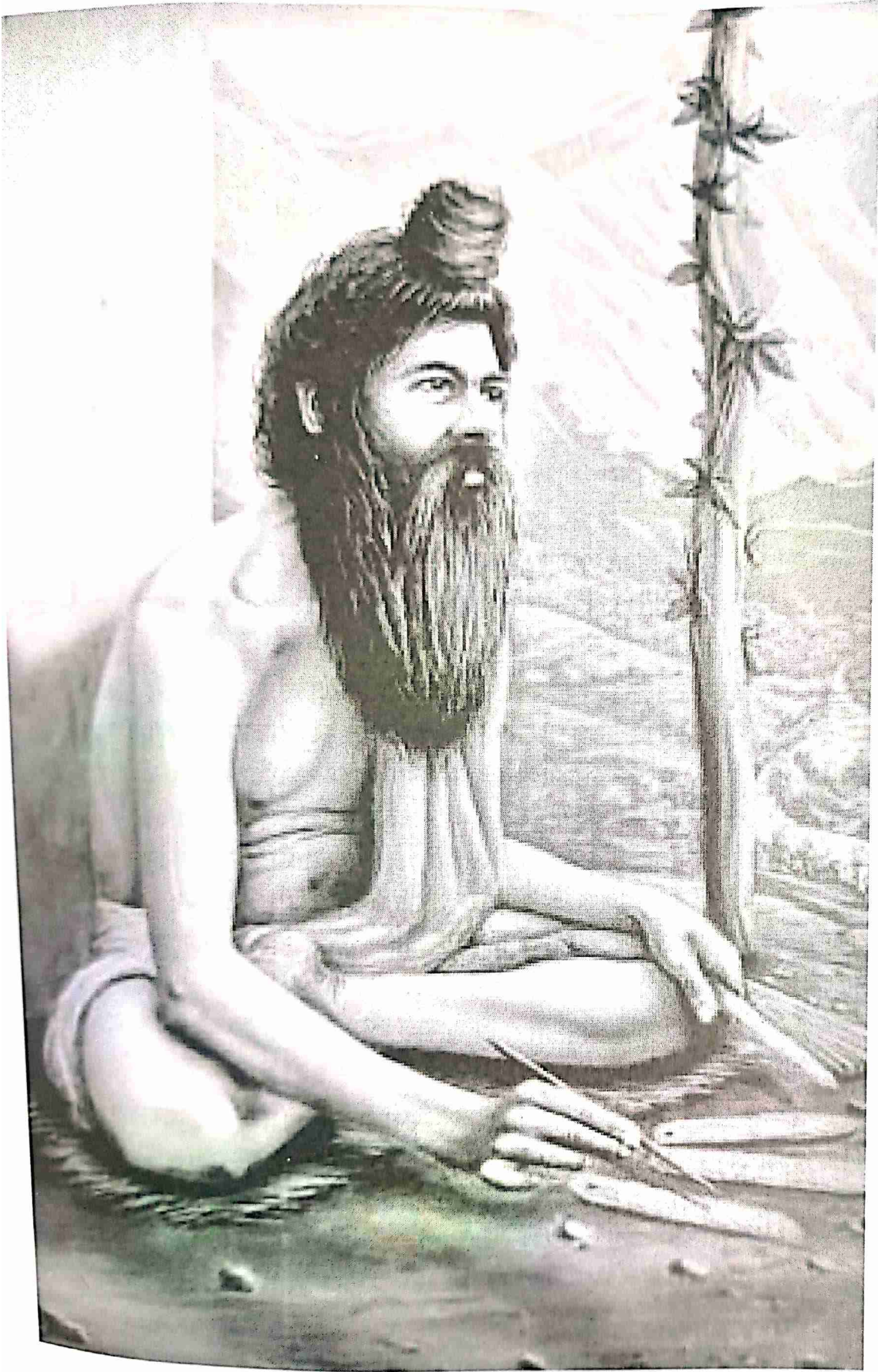
শ্রীল ব্যাসদেব

শ্রীল ব্যাসদেব

'ব্যাস' শব্দের অর্থ যিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। এটি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়– বেদ বিভাজনকারী ঋষিদের সম্মানসূচক উপাধি। কল্পে কল্পে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্ত্যাবেশ অবতারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়ে বৈদিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন। এ কল্পেও তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কলিযুগের অল্পমেধাসম্পন্ন মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে বৈদিক শাস্ত্রসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আবির্ভাব

ব্যাসদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৪/১৪) বলা হয়েছে –

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্‌যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥

"ত্রেতা ও দ্বাপরের যুগপর্যায়ে বসু-দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে মহর্ষি ব্যাসদেবের জন্ম হয়।"

শৈশবে ব্যাসদেবকে তাঁর কৃষ্ণবর্ণের জন্য 'কৃষ্ণ' এবং যেহেতু তিনি সতি এবং মতি নদীর সংগমস্থলে একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে 'দ্বৈপায়ন' বলে ডাকা হতো। 'বেদ' বিভাজনের পর তিনি 'বেদব্যাস' নামে পরিচিত হন। তাঁর আবির্ভাবের দিনটি ছিল বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথি। এ দিনটিকে বসন্তদ্বাদশী বলা হয়।

এক সময় পরাশর মুনি সত্যবতী নামে এক মৎস্যগন্ধা কুমারীর নৌকায় চড়ে নদী পার হতে যাচ্ছিলেন। নৌকায় উঠে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সে সময় তিথি নক্ষত্রসকল অত্যন্ত শুভলক্ষণযুক্ত এবং এ কুমারীর প্রতি তাঁর আশীর্বাদে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি মৎস্যগন্ধা দেবীকে এ কথা জানান।

দেবী বললেন– "হে ঋষিবর, আপনি অত্যন্ত মহান, ত্রিকালজ্ঞ, শাস্ত্রবিচারে সুনিপুণ, আমি আপনার আশীর্বাদ মাথা পেতে নেব। কিন্তু হে প্রভু, আমি যে কুমারী!"

পরাশর মুনি বললেন– "হে দেবী, আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি, আমার দিব্য স্পর্শে তুমি মৎস্যগন্ধা থেকে পদ্মগন্ধা হবে এবং এ সন্তান জন্মদানের পরও তুমি কুমারীই থাকবে। তোমার গর্ভজাত সন্তান হবে ভগবান বিষ্ণুর অংশ প্রকাশ, ত্রিলোক বিখ্যাত, শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্ত, মহাত্মা এবং সে বেদ বিভাজন করবে"।

তখন পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় দৈবপ্রভাবে এক কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং পরাশর মুনির কৃপায় দেবী মৎস্যগন্ধার কোলে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর আবির্ভাব ঘটে, যিনি মহর্ষি ব্যাসদেব নামেও ত্রিভুবনখ্যাত। জন্ম হওয়া মাত্রই ব্যাসদেব মাতার অনুমতি নিয়ে তপস্যায় রত হন। মাতাকে বলে যান যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি মাতার কাছে উপস্থিত হবেন।

মহাভারতে ব্যাসদেব

একসময় সত্যবতীর সাথে মহারাজ শান্তনুর বিবাহ হয়। তাঁর গর্ভজাত পুত্র চিত্রাঙ্গদ অল্পবয়সে ও বিচীত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে জন্মদান করেন। ব্যাসদেবকে দেখে অম্বিকা ভয়ে চক্ষু নির্মীলিত করেন বলে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আর অম্বালিকা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান বলে পাণ্ডুও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান। সত্যবতী অম্বিকাকে পুনরায় ব্যাসদেবের কাছে যেতে বলেন। কিন্তু অম্বিকা তাতে রাজি হলেন না। তখন সত্যবতী এক দাসীকে ব্যাসদেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়।

মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় ব্যাসদেব জড়িত ছিলেন। ব্যাসদেবের আশীর্বাদে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে সঞ্জয় দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে সক্ষম হন। ব্যাসদেব কৌরব ও পাণ্ডবদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। নানা বিপদকালে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়ে সহায়তা করতেন।

শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

একবার মহাদেব পার্বতীদেবীকে নিয়ে নির্জন স্থানে দিকবন্ধন করে বসে শ্রীমদ্ভাগবতম্ কীর্তন করছিলেন। ভাগবত কথার প্রারম্ভে মহাদেব পার্বতীকে শর্ত দিলেন যে, ভাগবত কথা চলাকালে পার্বতীদেবী যে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন তার প্রমাণস্বরূপ তিনি যেন'হুঁ' বলে সায় দেন। যথারীতি ভাগবত কথা শুরু হলো। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে পার্বতীদেবী ভাগবত কথা শুনতে শুনতে নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন। যে বৃক্ষের নিচে মহাদেব ভাগবত কথা বলছিলেন, সে বৃক্ষে অবস্থান করে একটি শুকপাখিও ভাগবত কথা শ্রবণ করছিল। পাখিটি দেখল যে, পার্বতী দেবী ঘুমিয়ে গেছেন; তখন ভাগবত কথা বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে পার্বতীদেবীর বদলে পাখিটিই 'হুঁ' দিতে থাকল। এদিকে মহাদেব তন্ময় হয়ে সম্পূর্ণ ভাগবত কথা শ্রবণ করালেন। চোখ খুলে দেখতে পেলেন দেবী পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন মহাদেবের মনে প্রশ্নের উদয় হলো– তাহলে 'হু' দিলো কে? চারদিকে তাকিয়ে তিনি বৃক্ষের ডালে ঐ পাখিটিকে দেখতে পেলেন। পার্বতীদেবীর পরিবর্তে পাখিটি 'হুঁ' দিচ্ছিল, তাছাড়া ভাগবতের অতি গুহ্য লীলাকথা সাধারণ একটি শুকপাখি শ্রবণ করেছে ভেবে মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশুল হাতে পাখিটিকে তাড়া করলেন। প্রাণভয়ে পাখিটি দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পলায়ন করতে লাগল। মহাদেবও তার পেছনে পেছনে ধাবিত হলেন।

এদিকে ব্যাসদেবও তাঁর স্ত্রীকে ভাগবত কথা শ্রবণ করাচ্ছিলেন। তিনিও তখন ভাগবত কথা শুনতে শুনতে হা করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঠিক তখনই শুকপাখিটি প্রাণ বাঁচানোর কোনো উপায় না পেয়ে ব্যাসদেবের স্ত্রীর মুখে প্রবেশ করল। তৎক্ষণাৎ মহাদেবও সেখানে উপস্থিত হয়ে পাখিটিকে ব্যাসদেবের স্ত্রীর মুখে প্রবেশ করতে দেখে অভিশাপ দিলেন যে, পাখিটি যেখানে প্রবেশ করেছে সেখানে তাঁকে ষোল বছর (মতান্তরে বারো বছর) থাকতে

হবে। মহাদেবকে দেখামাত্রই ব্যাসদেব প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁকে ক্রোধান্বিত দেখে ক্রোধের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন মহাদেব সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন।

ব্যাসদেব মহাদেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বললেন– "হে দেবাদিদেব, যিনি আপনার শ্রীমুখ থেকে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছেন, তিনি তো মহাভাগ্যবান এবং আপনার আশীর্বাদের যোগ্য।" আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হয়ে সেই শুকপাখিটিকে আশীর্বাদ করলেন– "পাখিটি আমার কাছ থেকে যে ভাগবতকথা শ্রবণ করেছে তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর হৃদয়ে অক্ষত থাকুক।" এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

মহাদেবের অভিশাপে ষোল বছর সেই শুকপাখিটি ব্যাসদেবের স্ত্রীর গর্ভে অবস্থান করছিল। ভাগবতের বীর্যবতী কথা শ্রবণ করার ফলে সেই শুকপাখিটি মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীতে রূপান্তরিত হলেন। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও তিনি নিত্য তাঁর পিতা ব্যাসদেবের কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ করতেন। ইতোমধ্যে ষোল বছর অতিক্রান্ত হলেও শুকদেব গোস্বামী এ জড়জগতের মায়ায় প্রবেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমতাবস্থায় ব্যাসদেব তাঁকে বুঝিয়ে বললেন– "বৎস, তুমি ভূমিষ্ট হও নতুবা তোমার মাতৃহত্যা জনিত পাপ হবে।" তাতেও শুকদেব গোস্বামীর কোনো প্রতিক্রিয়া না হলে ব্যাসদেব উপায়ান্তর না দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। তখন ভগবান স্বয়ং শুকদেব গোস্বামীকে প্রবোধ দিলেন– "এ জগতে আবির্ভূত হলেও আমার মায়া কখনোই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।" শুকদেব গোস্বামী ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে বললেন– "এ জগতে ভূমিষ্ট হলেও আমি এ জগতের কোনো বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে বনে গমন করব।" যথারীতি আবির্ভূত হয়ে ষোড়শ বর্ষীয় যুবক শুকদেব গোস্বামী দিগম্বর বেশে অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে বনে গমন করেন। তখন ব্যাসদেব হা পুত্র! হা পুত্র! বলে শুকদেব গোস্বামীর পেছন পেছন ধাবিত হলেন–

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়াতয়া তরবোহভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোহস্মি ॥

পুত্রকে ধরতে না পেরে বিরহকাতর পিতা ব্যাসদেব ব্যাধদের ভাগবতের দুটি শ্লোক শিখিয়ে দিলেন যা শুকদেব গোস্বামীকে শ্রবণ করানোর মাধ্যমে পুনরায় তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো। তারপর তিনি তাঁর পিতা ব্যাসদেবের আনুগত্যে পুনরায় ভাগবত অধ্যয়ন করলেন।

শাস্ত্র-সংকলন

শ্রীল ব্যাসদেব চতুর্বেদ, ১০৮টি উপনিষদ, মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, বেদান্তদর্শন এবং বেদান্তসূত্রের বিশুদ্ধ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত আদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। মহাভারত লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি শ্রীগণেশকে আহ্বান করেছিলেন। গণেশ এক শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে, ব্যাসদেব একনাগারে তা আবৃত্তি করবেন এবং এর অর্থ যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করে গনেশ তা লিপিবদ্ধ করবেন।

পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা কলিযুগের প্রভাবে জড় জগতের অধঃপতন দর্শন করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখতে পারছিলেন এ যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়বে। তাই সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কীভাবে মঙ্গলসাধন করা যায় সেবিষয়ে তিনি চিন্তা করছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এ প্রক্রিয়া সরলভাবে মানুষের মধ্যে বিস্তার করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে তিনি চার ভাগে (ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব) ভাগ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লেখিত সত্য ঘটনার বর্ণনাগুলোকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

এভাবে, অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যদিও তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল না। হৃদয়ে অসন্তোষ অনুভব করে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন–

"কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজ বন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি। আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তা-ই হয়তো আমার এ অসন্তোষের কারণ।"

নারদ মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ

ব্যাসদেব যখন এভাবে অনুশোচনা করছিলেন, তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। নারদ মুনির শুভাগমনে ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়ালেন এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

নারদ মুনি বললেন, "হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ। তাই সাধারণ জীবের জড়বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পারো। বদ্ধজীব স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরো অনুপ্রাণিত করেছো। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তিমার্গ আর অনুসরণ করবে না।"

তাই শ্রীল ব্যাসদেবের গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে তাঁর উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায় সমগ্র জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গলের জন্য ভাগবত পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবতম্) রচনা

করার নির্দেশ দেন এবং ব্যাসদেব এতে সম্মত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এ জগৎ থেকে অন্তর্ধানের পর তিনি কৃষ্ণ এবং তাঁর বিভিন্ন অবতারগণের লীলাবিলাস বর্ণনা করেন।

ব্যাসদেব সম্বন্ধে 'বায়ু পুরাণ'- এ বলা হয়েছে –

"পরাশর পুত্র এ যুগে বিষ্ণুর অংশপ্রকাশরূপে পূজিত। যিনি সমস্ত শত্রু সংহারক এবং দ্বৈপায়ন নামে পরিচিত, তিনিই শ্রীল ব্যাসরূপে এসেছেন। ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি বেদ বিভাজনের কার্যভার গ্রহণ করেন। বেদ বিভাজনের পর তাঁর রক্ষণ ও বিস্তারের জন্য তিনি চারজন শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। জৈমিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক, সুমন্ত অথর্ব বেদের, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের এবং পৈল ঋষি ঋক্‌বেদের অধ্যাপক। ইতিহাস ও পুরাণসমূহ তিনি রোমহর্ষণকে অর্পণ করেছিলেন।"– বায়ুপুরাণ ৬০/১০-১৬

বায়ুপুরাণে (২৩/২০৬-২০৮) আরো বলা হয়েছে যে, "পূর্বে আটাশজন ব্যাস ছিলেন। কিন্তু যখন এ আটাশতম ব্যাস আবির্ভূত হন, তখন ত্রিলোকের পিতা ভগবান বিষ্ণু নিজেকে দ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে প্রকাশ করেন। যদুকুল তিলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে বাসুদেব নামে পরিচিত হবেন। তারপর যথাসময়ে আমি (বায়ু) একজন তপস্বীরূপে আধ্যাত্মিক বিদ্যার্থীর বেশে যোগমায়ার সাহায্যে জগৎ মোহিত করব।"

প্রকৃতপক্ষে এটি মধ্বাচার্যরূপে বায়ুদেবের আগমনী বার্তা।
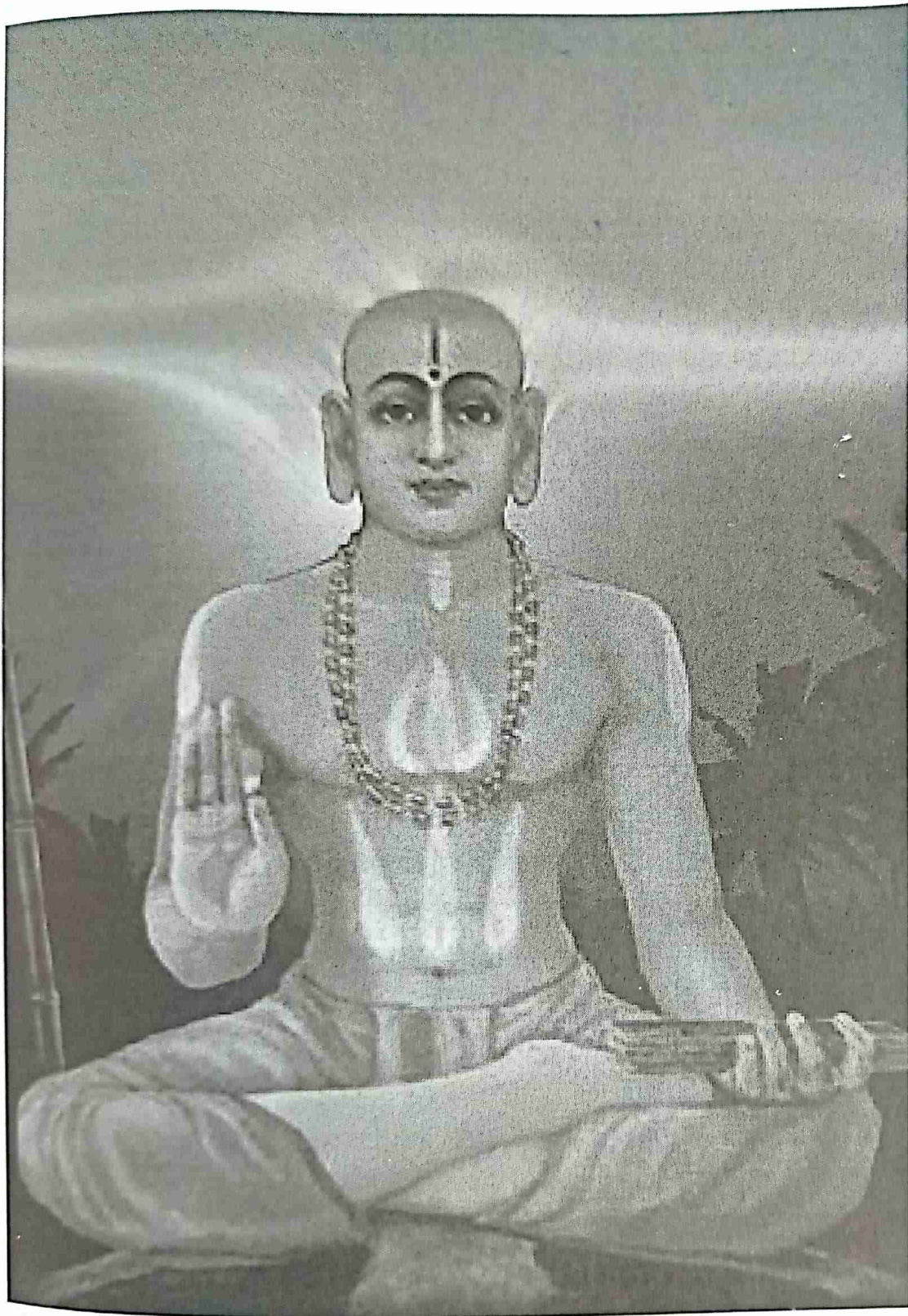
শ্রীমধ্বাচার্য

শ্রীমধ্বাচার্য

পরিচয় ও আবির্ভাব

দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানাড়া জেলা, দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর, তার উত্তরে উড়ুপি। উড়ুপি গ্রামে পাজকাক্ষেত্রে শিবালী ব্রাহ্মণকুলে 'মধ্যগেহ' ভট্ট এবং 'বেদবিদ্যার' পুত্ররূপে ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হন।

শ্রী মধ্যগেহ ভট্ট তাঁর পুত্রের নাম রাখলেন বাসুদেব। শ্রীমধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থ মহাভারত-তাৎপর্যের বাক্য থেকে শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-কাল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্মে ভীষ্মদেব পঞ্চপাণ্ডবকে বলেছিলেন যে, কলিযুগ শুরুর চার হাজার বছর পর পাণ্ডবগণের পুনরায় জগতে আবির্ভাব হবে। ভীষ্মের এ উক্তি অবলম্বনে ভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ে দেখা যায়–

চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনঃ বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহি ॥

কলিযুগের চার হাজার তিনশত (৪৩০০) বছর অতিক্রান্ত হলে, পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতনুরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে দৈত্যকর্তৃক আচ্ছাদিত বিষ্ণুতত্ত্ব প্রচার করবেন।

বাল্যলীলা

বাসুদেব শৈশবেই বিচিত্র লীলা প্রকাশ করে বন্ধু-স্বজনবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর পিতার বেশ কিছু ঋণ হয় এবং মধ্বাচার্য তেঁতুল বিচিকে মুদ্রায় পরিণত করে তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করেন। বিদ্যা অর্জনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অতি অল্পদিনেই তিনি বর্ণমালা অনুশীলন করে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। মহাভারতে কথিত 'মণিমান' নামক অসুর সাপের আকার ধারণ করে সেখানে বাস করতো। উপনয়নের পরেই বাসুদেব তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের দ্বারা সেই সর্পটিকে সংহার করেন। তাঁর মা যখন তাঁর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হতেন, তখন তিনি যেখানেই থাকতেন, সেখান থেকে এক লাফে তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত হতেন। বেদ অধ্যয়নের জন্য তিনি পাজকাক্ষেত্র হতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ নামক স্থানে পূগবনকুলোদ্ভূত এক বিপ্রের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে তিনি সহপাঠীদের সঙ্গে বিভিন্ন খেলায় মগ্ন থাকতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁর মনোযোগ ছিল না। সবসময় খেলায় নিযুক্ত দেখে একদিন তাঁর অধ্যাপক তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যাপকের নিকট সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল উদগীরণ করে অধ্যাপককে বিস্মিত করে দেন। এভাবে, অতি অল্পকালের মধ্যেই বাসুদেব সকল বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে গৃহে ফিরে আসেন।

একদিন বাসুদেব তাঁর হাতে একটা লাঠি নিয়ে পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, "পিতা, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করে জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

প্রচার করব।” তাঁর পিতা বালকের এমন কথা শুনে বললেন– “যদি তোমার মতো একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরসন করে জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করতে সমর্থ হয়, তাহলে তোমার হাতের শুষ্ক লাঠির পক্ষেও বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়”। অর্থাৎ যেমন শুষ্ক লাঠির পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরসন করে জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব, এটাই তাঁর পিতার বক্তব্য। পিতার কথা শুনে বাসুদেব বললেন– “পিতা, ভগবৎশক্তির প্রভাবে এই লাঠির যেমন মহান বৃক্ষরূপে পরিণতি অসম্ভব নয়, তেমনি আমার মতো বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন অসম্ভব নয়”। এই বলে বাসুদেব তাঁর হাতের লাঠিটি মাটিতে রোপণ করা মাত্রই এক বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হলো। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থেকে শ্রীমধ্বাচার্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শনার্থীদের হৃদয়ে জাগরূক করে দিচ্ছে।

সন্ন্যাস গ্রহণ

বাল্যকাল থেকেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও অপরের যুক্তি খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করে তাঁর পিতা বুঝতে পারলেন যে, পরবর্তীতে তাঁর পুত্র গৃহধর্মে আসক্ত হবে না। তিনি তাঁকে বিবাহ বন্ধন দ্বারা গৃহে আবদ্ধ করার জন্য মনে মনে সংকল্প করলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব তাঁর পিতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। যাঁর হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করার জন্য উৎসুক, যিনি সকল অপসিদ্ধান্তকে তিরস্কার করে জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করার জন্য বিষ্ণুশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তাঁকে বন্ধন করতে পারেন, জগতে এমন কে আছেন?

সাধারণ লৌকিক বিচার এই যে, সকল বিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে থাকেন, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম যাজন বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ দোষাবহ। তারা বলেন যে, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণও যেকোনোভাবে হোক মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এমন বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্মুখ ভোগীসম্প্রদায়ের ভোগের ধারণাপুষ্ট, তা আমরা শ্রীবাসুদেবের আচরণে প্রমাণিত দেখতে পাই। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত কৃষ্ণবহির্মুখ জীবমাত্রই নিজে হরি ভজনহীন এবং মাৎসর্য ও ভোগবুদ্ধির কারণে অপরের হরি ভজনের বিরোধী। পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পরস্পর পরস্পরকে ভোগ করার বাসনায় মত্ত থাকে। সুতরাং যখনই তাদের কেউ হরিভজনের জন্য অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস করে, তা দেখে অন্যরা তাদের ভোগ্য বস্তু চিরকালের জন্য ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হবে ভেবে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বাসুদেব এ সকল বিষয় ভালোভাবেই জানতেন, তাই তাঁর পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতি সত্ত্বেও রজতপীঠপুরে ‘অচ্যুতপ্রেক্ষ’-এর কাছে মাত্র বারো বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাস-নাম হয় ‘পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ’।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ মধ্বাচার্য ‘আচার’ ও ‘প্রচার’ করতে লাগলেন। তিনি সদাচারের দ্বারা তাঁর গুরুদেবেরও বিস্ময়োৎপাদন করে সর্বত্র বিষ্ণুভক্তির কথা

প্রচারের জন্য অভিযান আরম্ভ করলেন। তিনি জনৈক তার্কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত করে তাঁর নিকট থেকে 'জয়পত্র' গ্রহণ করলেন। এভাবে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি মায়াবাদী কুতার্কিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ছেদন করে তিনি সাত্বতগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হলেন। কিছুদিন পর আচার্য মধ্ব শ্রীরামেশ্বর দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করতে করতে অনন্তশয়ন ক্ষেত্রে আগমন করলেন।

ব্যাসদেবের কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি

তারপর কতিপয় শিষ্য পরিবৃত হয়ে শ্রীমধ্বাচার্য বদরিকাশ্রমের নিকটবর্তী এক প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে শিষ্যগণের নিকট নিজকৃত গীতা ভাষ্য উপদেশ করতে লাগলেন। তখন শিষ্যগণ দেখলেন যে, আকাশমার্গে একটি অপূর্ব তেজপুঞ্জ বিচরণ করতে করতে শ্রীমধ্বাচার্যের মুখজ্যোতির সাথে মিলিত হলেন। মধ্বাচার্য বুঝতে পারলেন ব্যাসদেবই তাঁকে বদরিকাশ্রমে আহ্বান করেছেন। তারপর তিনি একাকী ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বেদ, বেদান্তসূত্র, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশ লাভ করেন। তারপর তিনি নর-নারায়ণ আশ্রমে নারায়ণ দর্শন করে ব্যাসদেব ও নরনারায়ণের আজ্ঞায় পুনরায় শিষ্যদের কাছে ফিরে গেলেন।

শিষ্যগণসহ হিমালয় পর্বত থেকে দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থসমূহে বিচরণ করতে করতে তিনি পণ্ডিতদের এক সভায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করে শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন। বদরিকাশ্রম হতে 'আনন্দ মঠ'-এ প্রত্যাবর্তনকালেই মধ্বাচার্যের 'সূত্রভাষ্য' রচনা শেষ হয়। তাঁর সঙ্গী ও শিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখে দেন। বলা হয়ে থাকে যে, শ্রীমধ্বাচার্য তাঁর সূত্রভাষ্যে একুশবার 'দুর্ভাষ্য' খণ্ডনপূর্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

কৃষ্ণমূর্তি প্রকট

তারপর তিনি বদরিকাশ্রম হতে গঞ্জামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। সেখানে তাঁর সাথে শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী পণ্ডিতের মিলন হয়। তাঁরাই শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ নাম লাভ করেন।

উড়ুপিতে ফিরে এসে মধ্বাচার্য একদিন সমুদ্রস্নানে যেতে যেতে দ্বাদশ ক্ষেত্রের প্রথম পাঁচ অধ্যায় সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করলেন। সমুদ্রসৈকতে উপবিষ্ট হয়ে তিনি দেখলেন, একটি নৌকা বালুকায় প্রোথিত প্রায় হয়ে বিপন্ন হয়েছে; নাবিক তার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দ্রব্য পূর্ণ নৌকাটি একটুও চালাতে পারছে না। মধ্বাচার্য তা দর্শন করে নৌকা সঞ্চালনের জন্য হাত দিয়ে মুদ্রা প্রদর্শন করলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকাটি ভেসে উঠল। নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসীর এমন অদ্ভুত ঐশ্বর্য দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং পরম উপকৃত হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য তাঁকে তার নৌকা থেকে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। তখন মধ্বাচার্য সেই নাবিকের কাছে দ্বারকার গোপীসরোবর থেকে আনা কেবল একটি বড় গোপীচন্দনখণ্ড চাইলেন। কিন্তু রাস্তা দিয়ে আনার সময়

'বড়ভণ্ডেশ্বর' নামক স্থানে এসে চন্দনখণ্ডটি ভেঙ্গে যায় এবং তার ভেতর থেকে একটি অপূর্ব ভুবনমোহন 'বালকৃষ্ণ' মূর্তি পাওয়া যায়। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে যে তিনটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শোনা যায়, তারও বহু পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই এ 'বালকৃষ্ণ' মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা শেষে অর্জুন দ্বারকার সমুদ্রতীরে গোপীসরোবরে সেই শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। কালক্রমে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। কলিযুগে মধ্বাচার্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত হয়েই স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে যান এবং দ্বারকা থেকে আগত কোনো নাবিকের নৌকায় বিশাল গোপীচন্দন-খণ্ডের মধ্য থেকে সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্তি মধ্বাচার্যের সামনে প্রকটিত হন। মূর্তির এক হাতে দধিমন্থন-দণ্ড অপর হাতে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণমূর্তি পাওয়ার পর মধ্বাচার্যের 'দ্বাদশস্তোত্রের' অবশিষ্ট সাত অধ্যায় সেদিনই রচিত হলো। ত্রিশজন বলবান লোক ঐ কৃষ্ণমূর্তি উত্তোলনে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা বায়ুর অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ মূর্তিকে নিজ মঠে নিয়ে গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত কৃষ্ণমূর্তিকে উডুপির বিশাল সরোবরে স্নান করিয়ে উডুপিতে প্রতিষ্ঠা করলেন।

মধ্বাচার্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা প্রবর্তন ও স্বসিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য তাঁর আট জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস-প্রদানপূর্বক তাঁদের উপর সেই কৃষ্ণমূর্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করলেন; তারপর জনৈক গৃহস্থ-শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করে 'পদ্মনাভতীর্থ' নাম প্রদান করলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের প্রত্যেকের দুবছর করে শ্রীকৃষ্ণসেবাকাল নির্ধারিত করলেন এবং বাকি সময় শাস্ত্র প্রচারের জন্য নির্দেশ করলেন। মধ্বাচার্যের আটজন শিষ্য হলেন– ১. শ্রীহৃষীকেশতীর্থ ২. শ্রীনরহরিতীর্থ ৩. শ্রীজনার্দনতীর্থ ৪. শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ ৫. শ্রীবামনতীর্থ ৬. শ্রীবিষ্ণুতীর্থ ৭. শ্রীরামতীর্থ ও ৮. শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ। তাঁদের মধ্যে মধ্বাচার্যের পূর্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃষীকেশতীর্থ 'অনুমধ্ব-চরিতে' বলেন যে, বিষ্ণুতীর্থ আজও সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্রের কুমারধারা পর্বতে ভগবদ্ভজন করছেন। শ্রীমধ্বাচার্য উডুপিক্ষেত্র থেকে পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণে কটতিলক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত গ্রন্থ তাম্রপাতায় লিপিবদ্ধ করে মাটির নিচে পুঁতে রাখেন এবং তার উপর নবনীতধর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থানটি 'ব্যাসতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে কৃষ্ণসর্প বিরাজিত থেকে আজও মাটির নিচে পুঁতে রাখা আচার্য-গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করছেন বলে শোনা যায়। এই 'ব্যাসতীর্থ' প্রতিদিন মাধ্ব যতি ও ব্রহ্মচারীগণের দ্বারা পূজিত হয়। মাধ্ব-সন্ন্যাসীগণ এই 'ব্যাসতীর্থ'-এর কৃষ্ণমূর্তি স্পর্শ করতে পারেন না; দূর থেকে পূজা করতে হয়। কথিত আছে যে, প্রতিদিন পূজার সময় কৃষ্ণসর্প দূরে সরে যায়, কিন্তু কেনোভাবে পূজার ত্রুটি ঘটলে বা অনাচার হলে কৃষ্ণসর্প সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং পূজারীর বিনীত প্রার্থনা ও সদাচারে পূজা করার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করলে আবার সেস্থান পরিত্যাগ করে। এ স্থানে 'কটতিলমঠ' নামে একটি মঠও রয়েছে। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ বলেন যে, কলির প্রভাবে মায়িকশাস্ত্রসমূহ বৃদ্ধি ও মাধ্বশাস্ত্রসমূহ তিরোহিত হলে মধ্বাচার্যের শিষ্য বিষ্ণুতীর্থ কটতিলক্ষেত্রের ব্যাসতীর্থ-কুণ্ড থেকে শ্রীমধ্ব-রচিত তাম্রপত্রে-লিখিত গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করে পুনরায় জগতে মাধ্বশাস্ত্র প্রচার করবেন।

দ্বিতীয়বার বদরিকাশ্রমে যাত্রার সময় শ্রীমন্মধ্বাচার্য মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় মহাদেব নামে জনৈক রাজা জনসাধারণের উপকারের জন্য রাজকর্মচারীদের দিয়ে একটি পুকুর খনন করাচ্ছিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে রাজপুরুষগণ সশিষ্য মধ্বকেও মাটি খননের কাজে বাধ্য করতে চাইলে রাজাকেই তিনি ঐ কাজে প্রবৃত্ত করে নিজে অগ্রসর হলেন। গাঙ্গপ্রদেশের এক পাড়ে হিন্দু-রাজ্য, অপর পাড়ে মুসলমান-রাজ্য। দুই রাজ্যের মধ্যে পরস্পর বিবাদের ফলে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, পাড়ে যাওয়ার নৌকা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। সুবিস্তৃতা নদীর অপরপাড়ে বিরুদ্ধ সেনারা সর্বদা বাধা প্রদান করছিল। শ্রীমধ্ব ও তাঁর শিষ্যগণ সে সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে সাঁতরে সে নদী পার হন, কিন্তু তীরে উঠেই সৈন্যদের দ্বারা পীড়িত হতে থাকেন। তিনি রাজার আদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থার কথা জানান। মুসলমান রাজা তাঁর দর্শন ও বাক্য-শ্রবণে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি মধ্বাচার্যকে অর্ধেক রাজ্য দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মধ্বাচার্য তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। চলতে চলতে পথে দস্যুরা তাঁকে আক্রমণ করলে মহাবলী মধ্বাচার্য অনায়াসে তাদের বিনাশ করেছিলেন। বদরিকায় ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর কাছ থেকে অষ্টমূর্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। তারপর মধ্বাচার্য মহাভারতের তাৎপর্য রচনা করেন।

পাণ্ডিত্য প্রতিভা

মধ্বাচার্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ভগবানের প্রতি আনুগত্যের কথা ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হলো। তাঁর প্রতিষ্ঠায় শৃঙ্গেরি মঠাধিপতি শঙ্করাচার্য উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শঙ্করমতাবলম্বীগণ নিজেদের প্রতিষ্ঠা খর্ব হতে দেখে মধ্ব-নির্যাতনে ব্যস্ত হলেন। তাঁরা মধ্ব অনুসারীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করলেন। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীকাক্ষ-পুরী নামক জনৈক শঙ্করমতবাদী পণ্ডিতকে নিয়ে মধ্বাচার্যের সাথে বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং আচার্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থসমূহ চুরি করালেন। কিন্তু পরে বিশেষ উদ্যোগের পর ঐ গ্রন্থরাজি পাওয়া গেল। কুম্বল দেশাধিপতি (কান্বতীর্থের সমীপে কুম্বলদেশ) জয়সিংহ শ্রীমন্মধ্বাচার্যের অপহৃত গ্রন্থসমূহ উদ্ধারের জন্য বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী লিকুচবংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্যকে মধ্বাচার্য শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা তর্কে পরাজিত করে নিজ শিষ্যত্বে বরণ করলেন। পণ্ডিত ত্রিবিক্রমার্যের পুত্রই 'শ্রীসুমধ্ববিজয়' ও 'মনিমঞ্জরী' গ্রন্থের রচয়িতা কবিবর শ্রীনারায়ণাচার্য।

মহাবলী মধ্বাচার্য

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলেরও সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরি' নামক এক বলবান পুরুষ ৩০ জন পুরুষের সমকক্ষ বলে আস্ফালন করতেন। আচার্য তাঁর পায়ের আঙ্গুল ভূমিতে সংলগ্ন করে তা বিচ্ছিন্ন করতে আদেশ করলে সেই অসামান্য বলবান ব্যক্তি অমিত বল প্রয়োগ করেও সফল হলো না। আরেকবার তিনি সত্যতীর্থকে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

কাদুর জেলায় মুদগেরী গ্রামের প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে– *শ্রীমধ্বাচার্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা।* নদীভাঙনের ফলে ভূভাগ বিনষ্ট হতে থাকলে নদীর বেগ প্রশমনের জন্য সহস্রাধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে একটি বিশাল শিলা আনতে অসমর্থ হয়ে রাস্তায়

ফেলে রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু মহাবলী শ্রীমধ্বাচার্য এক হাতে অনায়াসে সেই শিলাটি যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করেন।

অপ্রকট

শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ব্যাপারে মধ্বাচার্যের পারদর্শিতার কথা শুনে দেবতারা পর্যন্ত বিস্মিত ও প্রসন্ন হয়েছিলেন। একদিন রুদ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ আকাশমার্গে রজতপীঠপুরে শ্রীঅনন্তেশ্বর দেবালয়ের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য তখন ঐ দেবালয়ে তাঁর শিষ্যদের কাছে ঐতরেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যা করছিলেন। দেবতারা শ্রীমধ্বাচার্যের ব্যাখ্যা-কৌশলে বিশেষ আনন্দিত হয়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের উপরে মন্দার-পারিজাতাদি দিব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। শ্রীমধ্বাচার্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ ব্যাখ্যা করতে করতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অনন্তেরশ্বর-দেবালয়ে অদৃশ্য হলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য ৭৯ বছর প্রকট ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য বাদিরাজস্বামী 'সরসভারতীবিলাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শ্রীমধ্বাচার্য অদৃশ্যরূপে উডুপিতে এবং দৃশ্যরূপে বদরিকাশ্রমে বিরাজিত আছেন। অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম বৈবস্বত মন্বন্তর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করে পরে প্রপঞ্চাতীত নিত্যধামে প্রবিষ্ট হবেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্যও তাঁদের সাথে বৈবস্বত-মন্বন্তর অবসান পর্যন্ত বদরিকাশ্রমে অবস্থান করে পরে বায়ুরূপে প্রবিষ্ট হবেন। শ্রীহৃষীকেশ-তীর্থের মতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য ৪৪১৮তম কলিযুগাব্দে পিঙ্গল সংবৎসরীয় মাঘী শুদ্ধা নবমীতে উডুপিতে অদৃশ্য হয়ে বদরী-বিজয় করেন।

রচিত গ্রন্থাবলি

শ্রীমন্মধ্বাচার্য জগতে দ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন ও মঠাদি স্থাপন এবং সেখানে সেবা-পূজার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। শ্রীজয়তীর্থকৃত 'গ্রন্থমালিকা-স্তোত্র'-তে শ্রীমধ্বাচার্য-রচিত গ্রন্থাবলীর নাম যা পাওয়া গিয়েছে, তা নিম্নরূপ---(১) গীতা-ভাষ্যম্, (২) সূত্র-ভষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অনুভাষ্যম্, (৫) গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্বণভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডুক-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্য-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্বসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ (১৯) তত্ত্বোদ্যোতঃ, (২০) মায়াবাদখণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কর্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণু-তত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) ন্যায়বিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) তন্ত্রসারঃ, (৩০) সদাচার-স্মৃতিঃ, (৩১) দ্বাদশ-স্তোত্রম্ (৩২) নরসিংহ-নখ-স্তুতিঃ, (৩৩) জয়ন্তী-নির্ণয়ঃ, (৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-গদ্যম্, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ, (৩৭) যমকভারতম্, (৩৮) যতি প্রবণকল্পঃ। '৩২ অক্ষর পরিমিত একগ্রন্থ'– সে অনুযায়ী গণনা করলে শ্রীমধ্বাচার্যরচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২,০০০। গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে বলা হয়েছে–

ত্রিংশৎসহস্রং দ্ব্যধিকমধিকং কৃষ্ণতুষ্টিদম্।
এতেষাং পাঠ-মাত্রেণ মধ্বেশঃ প্রীয়তে হরিঃ॥
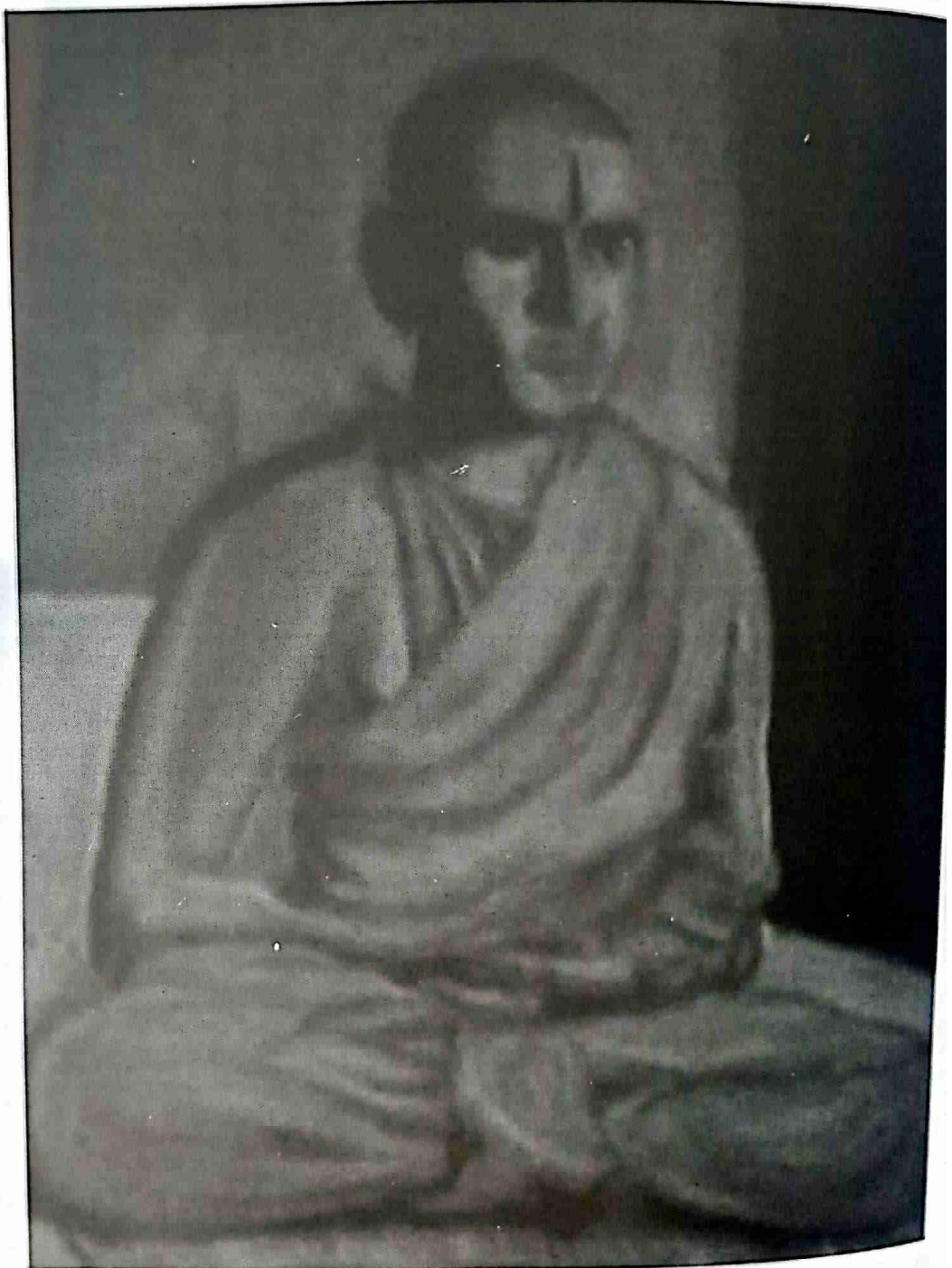
শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ

শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ

শ্রীল পদ্মনাভ তীর্থ উত্তর কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন। সে সময় কর্ণাটকের সীমানা অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পদ্মনাভ তীর্থের আবির্ভাবকাল প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৯/২৪৫ শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বম্বে গেজেটের একটি অংশ তুলে ধরেছেন। সেখানে পদ্মনাভ তীর্থের আবির্ভাবকাল ১১২০ শকাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিন-গণনার কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল সুনির্দিষ্টভাবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ঘটনাবলী শকাব্দে প্রকাশ করা হয়েছে এবং খ্রিস্টাব্দ বের করার জন্য আমরা এর সাথে ৭৯ বছর যোগ করেছি। সুতরাং সময়টি হলো ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী যা দাঁড়ায় তা হলো– গোদাবরী নদী যে স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেই উত্তর কর্ণাটকের তেলেগু ভাষাভাষীদের গৃহে পদ্মনাভ তীর্থ আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল শোভন ভট্ট। মধ্বাচার্য দ্বিতীয়বারের মতো উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে উড়ুপিতে এলে তাঁর সাথে পদ্মনাভ তীর্থের সাক্ষাৎ হয়। তখন পদ্মনাভ তীর্থের দীক্ষা হয় এবং নাম পরিবর্তিত হয়। তিনি সে সময়ের এক স্বনামধন্য ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানের চতুর্দশ শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য আচার্য মধ্বের কাছে চৌদ্দ সেকেণ্ডের মধ্যে পরাভূত হয়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মধ্বাচার্যের একজন বিশ্বস্ত শিষ্যে পরিণত হন। তেলু এলাকার বাইরে থেকে আসা শিষ্যদের প্রধান হিসেবে মধ্বাচার্য প্রায়শই পদ্মনাভ তীর্থের প্রশংসা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রচার দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার কারণে মধ্বাচার্য তাঁর তিরোভাব-পরবর্তী প্রথম মঠাধিপতি হিসেবে পদ্মনাভ তীর্থকে 'পীঠে' আসীন করেন।

শ্রীপাদ পদ্মনাভ তীর্থ ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে হাম্পির নিকটবর্তী নববৃন্দাবনে পবিত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর সমাধি মন্দির আজও সেখানে বিরাজ করছে।

শ্রীনরহরি তীর্থ

শ্রীনরহরি তীর্থ

শ্রীনরহরি তীর্থ উড়িষ্যার কলিঙ্গ রাজ্যের এক শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছরকাল তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি যখন রাজ-দরবারে কর্মরত, তখন কলিঙ্গের রাজা দেহত্যাগ করেন। স্মরণাতীত কাল থেকে রাজমন্ত্রীদের একটি প্রথা ছিল– তারা রাজ্য শাসনের সুযোগ্য প্রতিনিধি খুঁজে বের করার জন্য রাজকীয় হাতি নিয়োগ করতেন। সেবার সেই হাতি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নগরের পথ ধরে নরহরি তীর্থের কাছে যায়। সমস্ত রাজ মন্ত্রীদের হতবাক করে হাতিটি নরহরি তীর্থের গলায় রাজ্যাভিষেকের মালা পরিয়ে দেয়। তাই তাঁকে রাজ সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু এর বারো বছর পর কলিঙ্গরাজের উত্তরাধিকারী শিশুপুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। কৃতজ্ঞতাবশত নব-নিযুক্ত রাজা নরহরি তীর্থকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন নরহরি তীর্থ রাজার কাছ থেকে গজপতি রাজার বংশধরদের দ্বারা সেবিত 'মূলা রাম' বিগ্রহটি প্রার্থনা করেন। এ বিগ্রহ প্রথমে মহারাজ ইক্ষাকু কর্তৃক পূজিত হতেন, পরবর্তীতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ তা প্রাপ্ত হন। এরপরে লক্ষণ সেই বিগ্রহের সেবা করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে হনুমানজি। তিনি সেই বিগ্রহকে তাঁর গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। দ্বাপরযুগে হনুমানজি এ বিগ্রহ ভীমের হাতে অর্পণ করেন এবং ভীম তা গজপতি রাজাকে প্রদান করেন। কবিন্দ্র তীর্থের সময় সেই বিগ্রহ উত্তরাদি মঠে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে তা মন্ত্রণালয়ামে রাঘবেন্দ্র তীর্থ স্বামীর মঠে অবস্থান করছে।

কান্ব তীর্থের মঠসমূহ বিভাজনের সময় শ্রীপাদ মধ্বাচার্য নরহরি তীর্থকে চতুর্ভুজ 'কালীয়দমন-কৃষ্ণ' বিগ্রহটি প্রদান করেন। কালীয় নাগের মস্তকে তা এক পা উঁচু করে নৃত্যরত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। তাঁর এক হাত নৃত্যের সময় ভারসাম্য রক্ষা করছে এবং অন্যটি কালীয়ের লেজ ধরে উঁচু করে রেখেছে। বিগ্রহের ভাব বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মতো নয়, বরং ভগবান নারায়ণের মতো অন্য দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করে আছে।

বি.এন.কে শর্মার মতে, যখন মাধব তীর্থের সঙ্গে নরহরি তীর্থের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন নরহরি তীর্থের বয়স ছিল বাইশ বছর এবং মাধব তীর্থের উনিশ বছর। উড়িষ্যার কূর্মক্ষেত্র এবং সিংহাচল এলাকার আঞ্চলিক উৎকীর্ণলিপিতে নরহরি তীর্থের অনেক দুঃসাহসিক কর্ম, রাজনীতি এবং সুনিপুণ তরবারি চালনার মহিমার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এসব রাজকীয় কার্য সম্পাদনের সাথে সাথে তিনি বৈষ্ণব আচারও প্রচার করেছিলেন এবং উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক রাজা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ভক্তে পরিণত করেছিলেন।

অনেক সময় নরহরি তীর্থকে পদ্মনাভ তীর্থের শিষ্য বলে উল্লেখ করা হলেও মঠের তালিকায় কোথাও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়নি। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পদ্মনাভ তীর্থের জ্যেষ্ঠতা হেতু মধ্বাচার্যের শিষ্য ও প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তাঁর সেবা করতে

আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁকে পদ্মনাভ তীর্থ স্বামীর শিক্ষা শিষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

নরহরি তীর্থ একবার পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে সময় তিনি যখন উত্তর কর্ণাটকের বেলারী জেলার হসপেট তালুকের কাছে একটি নগরে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন স্বপ্নে ভগবান বিষ্ণুর একটি অপূর্ব বিগ্রহ নগরের পুকুরে দেখতে পেলেন। পরদিন সকালেই তিনি পুকুরটি সেচের ব্যবস্থা করলেন এবং সেখান থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণের বিগ্রহটি উদ্ধার করলেন। তারপর তা মঠে প্রতিষ্ঠা করা হলো। এ লীলার পরিপ্রেক্ষিতে নগরের নাম রাখা হয় 'নারায়ণদেবাকিরি'।

তিনি পনেরটি গ্রন্থ রচনা করলেও তার মধ্যে 'গীতা ভাষ্য' ও 'ভাবপ্রকাশিকা' নামে মাত্র দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।
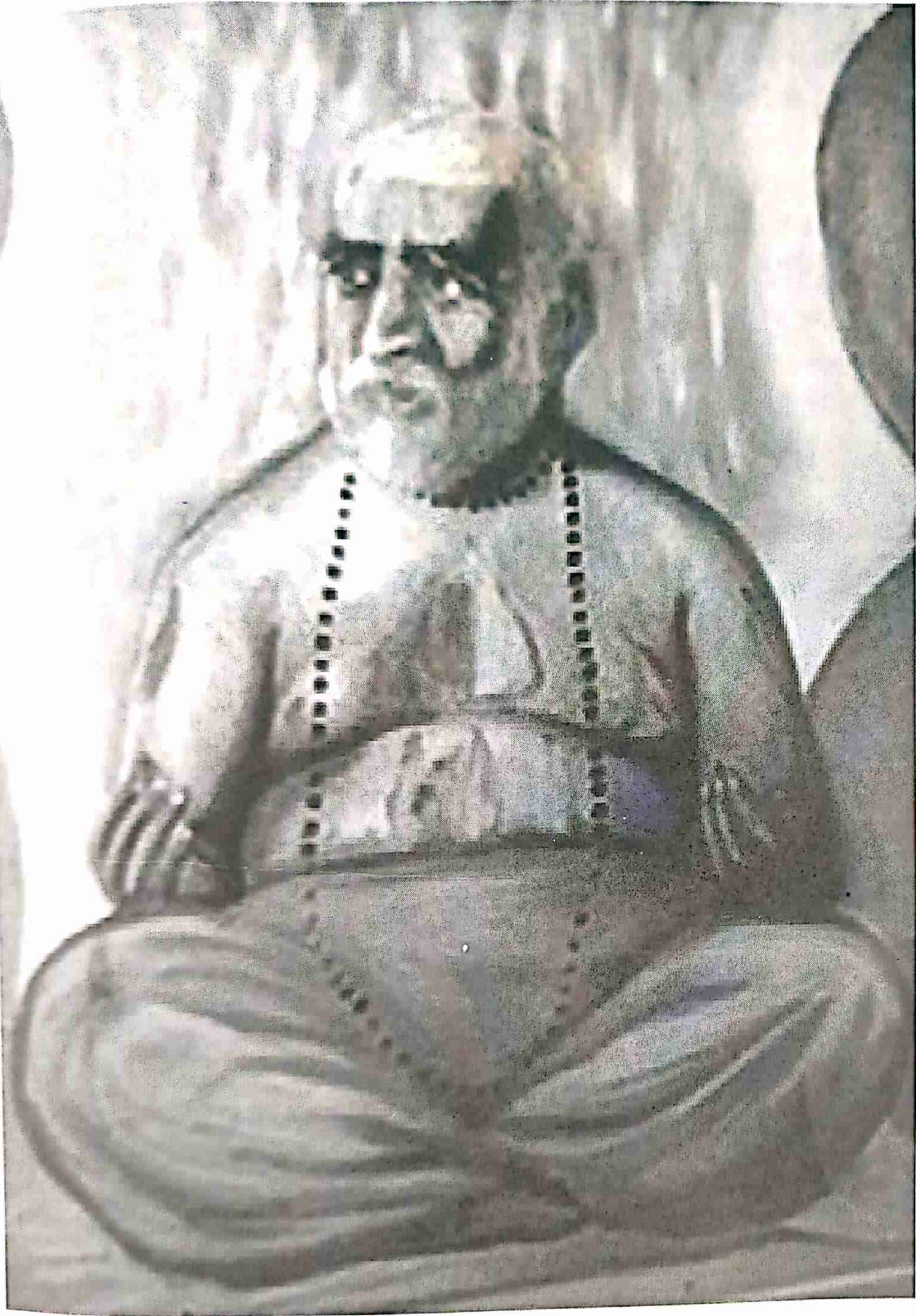
শ্রীমাধব তীর্থ

শ্রীমাধব তীর্থ

মধ্বাচার্যের অপ্রকটের পর তৃতীয় আচার্য হিসেবে মাধব তীর্থ পীঠে আসীন হন। তিনি পূর্বে বিষ্ণু শাস্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন। নামের সাদৃশ্যের জন্য শ্রীপাদ মাধব তীর্থ ও মধ্বাচার্যকে অনেক সময় এক বলে মনে করা হয় বা অনেকে একজনের সাথে আরেকজনকে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু তাঁরা আলাদা ব্যক্তিত্ব।

খুব সম্ভবত তিনি ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হন। মধ্বাচার্যের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে পদ্মনাভ তীর্থ, নরহরি তীর্থ, মাধব তীর্থ এবং অক্ষোভ্য তীর্থ ছিলেন অন্যতম। ক্রমান্বয়ে তাঁরা উত্তরাদি মঠে আসীন হয়ে মঠাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেকের মতে অক্ষোভ্য তীর্থ মাধব তীর্থের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মধ্বাচার্য যখন অক্ষোভ্য তীর্থসহ অন্যদের বিভিন্ন মঠের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন, তখনই তিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন।

বেনজী গোবিন্দাচার্যীর মতে, মাধব তীর্থ কর্ণাটকের মুলবাগালের কাছে 'মাজ্জিগি হাল্লি' মঠ স্থাপন করেন এবং তাঁর শিষ্য মধুরাই তীর্থকে এর দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। 'মাজ্জিগি হাল্লি' মঠে মাধব তীর্থের বীররাম বিগ্রহ পূজিত হতো। তিনি কান্ব মঠও স্থাপন করেছিলেন।

তিনি অক্ষোভ্য তীর্থকে মধ্বাচার্যের সেবিত বিগ্রহসমূহের সেবার জন্য উত্তরাদি মঠের মঠাধিপতি নিযুক্ত করেছিলেন। একবার মাধবতীর্থ যখন মধ্বাচার্যের কাছ থেকে আনা নরহরি ঠাকুরের 'দিগ্বিজয় রাম' বিগ্রহের অর্চন করছিলেন, তখন এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করেই তিনি তাঁর আসন থেকে সরে গিয়ে যেন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদনপূর্বক করজোড়ে বসেছিলেন। সকলেই তাঁর অদ্ভুত আচরণ দেখছিল। এভাবে পূজা সমাপ্ত হলে তিনি অদৃশ্য সেই ব্যক্তির কাছ থেকে অত্যন্ত বিনীতভাবে চরণামৃত গ্রহণ করেছিলেন। দর্শনার্থীদের কৌতূহল মেটানোর জন্য তিনি পরে নিজেই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি উপস্থিত ভক্তদের বলেন, "যে বিগ্রহ এখন আমি দৈব অনুগ্রহে লাভ করেছি, তাঁর পূজার্চনার জন্য আচার্য মধ্ব নিজেই এখানে এসেছিলেন। তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী বৃহৎ পরিসরে পূজার্চনা করে নিজে চরণামৃত গ্রহণপূর্বক আমাকেও চরণামৃত পান করিয়েছেন।" সকলে এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। পাণ্ডারপুরে অক্ষোভ্য তীর্থ যখন প্রসন্ন বিট্‌ঠলদেবের অর্চন করছিলেন, তখনও এমন আরো একটি ঘটনা ঘটেছিল।

পূর্বে মাধব তীর্থ কর্ণাটক পর্বতে তপস্বীর মতো কঠোর জীবন যাপন করতেন। তিনি একবার বুকা নামক এক মেষপালককে তাঁর আশেপাশে বারবার আসা যাওয়া করতে দেখেন। এই দরিদ্র মেষপালক শুনেছিল যে, বিখ্যাত সন্ন্যাসী মাধব তীর্থ সেখানে ভগবান নারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাই সে প্রতিদিন কিছু ফলমূল সেখানে রেখে আসতো।

এজন্য মাধবতীর্থ তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "একদিন তুমি রাজা হবে।" এ আশীর্বাদের কথা জানতে পেরে স্থানীয় মেষপালকেরা তাঁকে তাদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে। পরবর্তীতে সে সেখানকার স্থানীয় রাজা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে পাঁচটি জাতিগোষ্ঠী– কনড়, তলিগ, কঙ্গইভ্রো, নেগাপততো ও বদগসদের শাসন করতে থাকে। এ রাজ্যে সে বুকা রাও নামে পরিচিতি লাভ করে এবং মাধব তীর্থের আশীর্বাদে ৩৭ বছর রাজত্ব করে। তার রাজত্বকালে ১৩৪৩ সাল থেকে সে আরো অনেক রাজ্য জয় করে।

১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপাদ মাধবতীর্থ মঠের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বেদান্তপীঠে মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 'পরাশর স্মৃতি'-এর উপর 'পরাশর মধ্ববিজয়' ভাষ্যসহ আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়।

মাধব তীর্থ নিজেই মুলবাগালের নিকট মজ্জিগেনাহল্লি মঠ নামে একটি মঠ স্থাপন করেন এবং তাঁর শিষ্য মধুরাই তীর্থের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। সেখানে বীররাম বিগ্রহ অর্চিত হন। আশ্বিন মাসের মহালয়া অমাবস্যা তিথিতে এ মহান ব্যক্তি তিরোহিত হন। তাঁর দেহাবশেষ হাম্পিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু তা পরে ভীমা নদীর তীরবর্তী বিজাপুরের মানুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সম্প্রতি মুলবাগালে তাঁর পুষ্প-সমাধি রচিত হয়েছে।
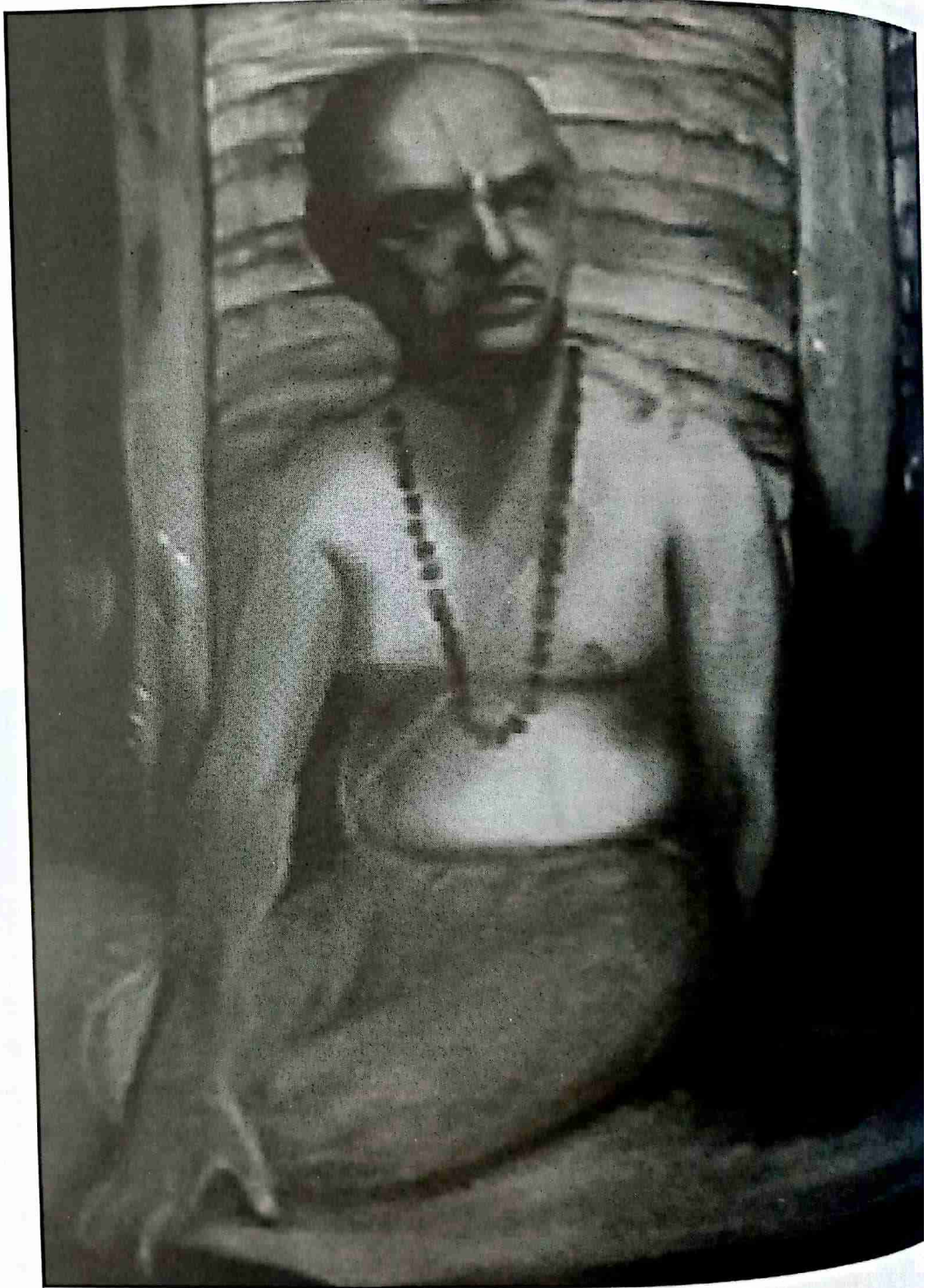
শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ

শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ

শ্রীপাদ অক্ষোভ্য তীর্থ ১১৫৯ শকাব্দে (১২৩৮ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি মধ্বাচার্যের সর্বশেষ সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে বেদান্তপীঠে আসীন হন (১৩৫০-১৩৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)। পূর্বে তাঁর নাম ছিল গোবিন্দ শাস্ত্রী। শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর চরণে শরণাগত হওয়ার পূর্বে তিনি মায়াবাদী ছিলেন। অক্ষোভ্য তীর্থকে পেজোয়ার মঠের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য তাঁকে 'অজ বিট্ঠল' বিগ্রহ প্রদান করেন। বিট্ঠল (কৃষ্ণ) তাঁর কটিদেশে হস্ত স্থাপন করে শ্রীদেবী ও ভূদেবী সহ দণ্ডায়মান; যদিও কেউ কেউ তাঁদের রুক্মিণী ও সত্যভামা বলে অভিহিত করেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ।

যদিও অক্ষোভ্য তীর্থ প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন না, তবুও মাধ্ব সম্প্রদায় ধারায় তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। অনেকের মতে তিনি 'মধ্ব তত্ত্বসার সংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি, তবে নাম থেকে বোঝা যায় তা দ্বৈত মতবাদের নির্দেশিকা। কিন্তু বর্তমানে এ গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। তিনি বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী শ্রীবিদ্যারণ্য এবং প্রসিদ্ধ বিশিষ্টাদ্বৈত পণ্ডিত শ্রী বেদান্ত দেশিক-এর সমকালীন ছিলেন। মি. আর. রাও-এর মতে, বিজয়নগর রাজ্য আমাদের সম্প্রদায়ের মাধ্ব তীর্থ কর্তৃক স্থাপিত নয়, বরং তা বিদ্যারণ্য মহাশয় কর্তৃক হাক্কা এবং বুক্কা সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত। কর্ণাটকের কোলার-এর নিকটবর্তী মুলবাগালে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যাতে শঙ্কর সম্প্রদায়ের পরম্পরা ধারায় আগত বিখ্যাত মায়াবাদী পণ্ডিত ও গুরু বিদ্যারণ্য মহাশয় পরাভূত হয়েছিলেন।

১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রুতি শাস্ত্রের 'তত্ত্বমসি' শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে অক্ষোভ্য তীর্থের সাথে বিদ্যারণ্যের বিতর্ক হয়। সেখানে উপস্থিত থেকে শ্রীপাদ বেদান্ত দেশিক সেই তিক্ত বাদানুবাদের মধ্যস্থতা করেছিলেন। অন্য একটি সূত্র মতে, উভয় পক্ষের যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে বেদান্ত দেশিকের নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি অক্ষোভ্য তীর্থের পক্ষে সমর্থন দান করেন। এ ঐতিহাসিক বিজয়ের শিলা-খোদাইকৃত সাক্ষ্য মুলবাগালের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের স্মৃতিস্তম্ভে রাখা হয়েছিল, যা আজও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে বিক্রমের সাথে মায়াবাদী দর্শনের তত্ত্বমসি ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন, সেটিই তাঁর জন্য সর্বোচ্চ যশ বয়ে আনে। যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনাটি বিচার করা হোক না কেন, তাঁর বিজয় ছিল স্বীকৃত ও প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিদ্যারণ্যকে এমনভাবে পরাভূত করেন যে, ইতিহাসে একে 'দ্বৈতবাদ'-এর মধ্ব মতাদর্শে একটি নতুন মোড় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজ পর্যন্তও 'দ্বৈত' মতবাদ পরাভূত হয়নি। 'অদ্বৈত মায়াবাদীরা' নিজেদের ভ্রান্তি অবগত হওয়া সত্ত্বেও একগুঁয়ে দৃঢ়তা ও বিকৃত উল্লাসে পতঙ্গের মতো সবিশেষ জ্ঞানরূপ অগ্নিমুখে ধাবিত হয়ে বছর বছর উডুপিতে প্রত্যাবর্তন করে পরাভূত হয়ে থাকে।

বিদ্যারণ্যের বিপক্ষে শ্রীপাদ অক্ষোভ্য তীর্থের বিজয় সম্পর্কে ব্যাসতীর্থের 'জয়তীর্থ বিজয়', সপ্তদশ শতাব্দীতে 'রাঘবেন্দ্র বিজয়'-এ এবং সেই সাথে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী (শ্রী বৈষ্ণব) আচার্য বিজয়চম্পু কর্তৃক লিখিত হয়েছে এবং এই মহাকাব্যের প্রমাণ মুলবাগালে একটি শিলাস্তম্ভে খোদাই করা আছে।

পরবর্তীতে তিনি একটু উত্তরে ভীমা নদীর তীরে অবস্থিত পাণ্ডারপুর বিজয় করেন। সেখানে তাঁর শিষ্য জয়তীর্থের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এর ঠিক পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি অধিকাংশ সময় জয়তীর্থকে 'দ্বৈত দর্শন' শিক্ষা দান কর্মে উৎসর্গ করেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যকার সম্পর্ক এত মধুর ছিল যে, তিনি জয়তীর্থকে মধ্বাচার্যের পরবর্তী সব চেয়ে দক্ষ এবং অদম্য প্রচারক হিসেবে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে জয়তীর্থ মধ্ব সম্প্রদায়ের 'দ্বিতীয় চন্দ্র' এবং তাঁর অসংখ্য ছোট ছোট ভাষ্যের জন্য 'টীকাচার্য' নামে পরিচিতি লাভ করেন। কীভাবে মধ্বাচার্যের বিভিন্ন বাক্যের গুপ্ত তাৎপর্য প্রাপ্ত হতে হয় এবং এ বিশেষ প্রসঙ্গগুলোর উপর টীকা গ্রন্থ রচনা করতে হয়, সে বিষয়ে তিনি জয়তীর্থকে শিক্ষা দান করেন, যা আরো সুদৃঢ়ভাবে অদ্বৈত মায়াবাদীদের বিপর্যস্ত করেছিল। অক্ষোভ্য তীর্থ কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে জয়তীর্থ এমনকি 'অদ্বৈত' দর্শনের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ যেমন-বাচস্পতি, বিবরণকর, অমলানন্দ, চিৎসুখ এবং বিজ্ঞান আসন-এর আলোকে তাদের (মায়াবাদী) মৌলিক বিষয়ের উপলব্ধিগত ভ্রান্তিসমূহ প্রদর্শন করে তাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে বৈষ্ণব প্রামাণিকতাকে আরো জোরালো করে মায়াবাদীদের অজ্ঞতাকে প্রদর্শন করেন।

শ্রীপাদ অক্ষোভ্য তীর্থ ভগবান শিবের অবতার রুদ্রের অংশস্বরূপ। কাগিনী নদীর তীরে কর্ণাটকের মালকেড় নামক স্থানে তাঁর সমাধি নির্মিত হয়।
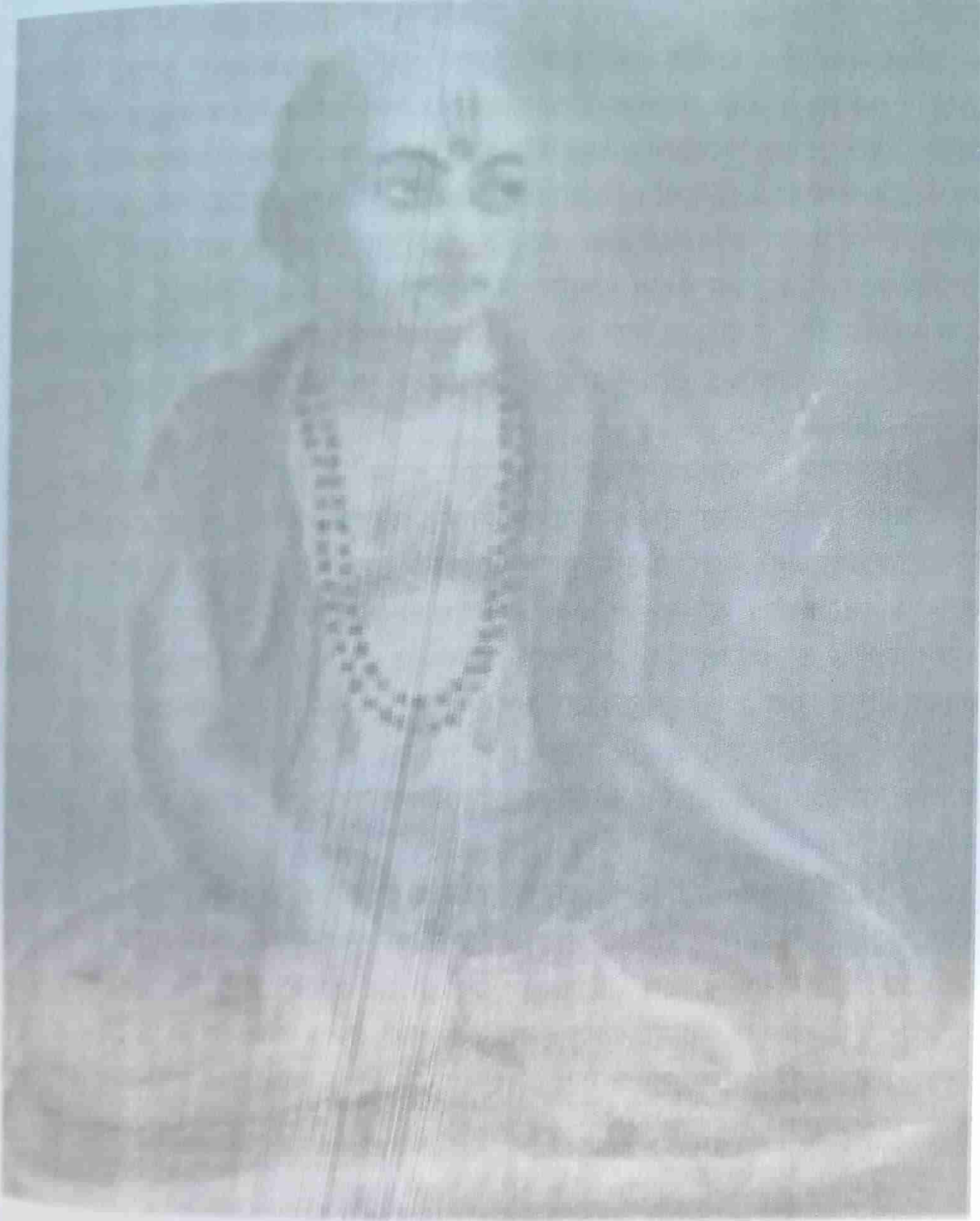
শ্রীজয়তীর্থ

শ্রীজয়তীর্থ

শ্রীল জয়তীর্থ এ জগতে প্রকটিত হয়েছিলেন আনুমানিক ১৩৪৮ বা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে (১২৬৭ শকাব্দ) যা শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলা ৯/২৪৫-এর তাৎপর্যে-বম্বে গেজেট থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তৎকালীন সময় দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিচারে কেউই শ্রীপাদ জয়তীর্থের কাছাকাছি ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও শাস্ত্র সিদ্ধান্তে পারদর্শী। মায়াবাদীদের মূর্খতা দর্শন করে এবং এমনকি রামানুজাচার্যের ওপর ভাষ্য রচনা করে তিনি বিশটির মতো গ্রন্থ রচনা করার মাধ্যমে তাঁর পূর্বসূরি ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য, পদ্মনাভ তীর্থ এবং নরহরি তীর্থকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সবসময়ই ছিলেন অত্যন্ত বিনীত। তিনি তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের সেবক ও তাঁর গুরুদেব শ্রীপাদ অক্ষোভ্য তীর্থকে প্রদান করতেন।

তাঁর অন্যতম প্রধান রচনা 'মিথ্যাত্বের সমালোচনা'-এ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ জগৎ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নয় এবং মায়াবাদীদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। তিনি সত্য, মিথ্যা, অনিত্য এবং নিত্য বস্তুর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করেছেন। জগৎ অনিত্য হলেও অস্তিত্বশীল এবং এর উপাদানসমূহও অলীক নয় এবং এর ক্রিয়া বাস্তব হলেও তা জড়াপ্রকৃতির সংস্পর্শে সম্পাদিত হওয়ায় ফল উৎপন্ন করে। এভাবে মায়াবাদীদের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' দর্শন পরাভূত করে তিনি বৈষ্ণবদের শিক্ষণীয় ও যুক্তিমূলক অনেক রচনা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এ পরম্পরাধারার একজন আচার্য শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ, জয়তীর্থের জীবনবৃত্তান্তের উপর 'জয়তীর্থ বিজয়' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়তীর্থের পূর্ব নাম ছিল ধোণ্ডো পাত্রেয় রঘুনাথ। তাঁর পিতার নাম ধোণ্ডুরায় রঘুনাথ। তিনি ছিলেন বিশ্বামিত্র গোত্র অথবা ভরদ্বাজ গোত্রভুক্ত এবং একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকের সন্তান। তাঁর ছিল দুই পত্নী। জয়তীর্থকে প্রায়ই স্থানীয় রাজকুমারের মতো সুবিশাল যুদ্ধ-ঘোড়ায় আরোহনরত এবং অস্ত্রসজ্জা, কবচ ও শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় দেখা যেত। তিনি ছিলেন সুদক্ষ অশ্বারোহী। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সমগ্র রাজ্যে ভ্রমণ করতেন।

গুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভ ও অলৌকিক পূর্বজন্ম স্মরণ

একবার এক গ্রীষ্মকালীন দুপুরে জলপানের জন্য তিনি এক নদীর ধারে উপনীত হন। তাঁর জল পান করার দৃশ্য সাধারণ ছিল না। তিনি ঘোড়ায় আরোহনরত অবস্থায় জলে নেমে সেখান থেকে সরাসরি জল পান করতেন। এই বিশেষ দিনে তাঁর এক অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার ঘটে। নদীর অপর পাশ থেকে শ্রীপাদ অক্ষোভ্যতীর্থ তাঁর জল গ্রহণের অসাধারণ দৃশ্য দর্শন করছিলেন। অক্ষোভ্য তীর্থ তাঁকে ডেকে বললেন– "অশ্বারোহী, তুমি ঠিক একটি ষাঁড়ের

মতো জল গ্রহণ করো।" এই সামান্য একটি কথা অশ্বারোহীকে গভীর চিন্তায় ফেলে দেয় এবং তাঁর পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি মধ্বাচার্যের সাথে অতিবাহিত সময়ের কথা স্মরণ করতে পারছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি 'একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান'– এ ভাবনা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারছিলেন এবং তাঁর রোমহর্ষ হচ্ছিল। তিনি স্পষ্টই দেখতে পারছিলেন কীভাবে তিনি একটি ষাঁড়রূপে মধ্বাচার্যের প্রচার অভিযানে সর্বত্র তাঁর গ্রন্থসমূহ বহন করতেন। কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে বিশেষ এবং মহামূল্যবান ছিল আচার্য মধ্বকে স্মরণ করতে পারা, বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মধুমাখা আদেশমূলক স্বর মনে করতে পারা।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য প্রায়ই তাঁর ষাঁড়ের প্রশংসা করে সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বলতেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই ষাঁড়টি সবচেয়ে ভালোভাবে শ্রবণ করে এবং তাঁর অন্যান্য শিষ্যের চেয়ে অতি দ্রুত বিভিন্ন দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যেখানেই মধ্বাচার্য প্রচার করতেন, ষাঁড়টি তার কান খাড়া করে খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতো। তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য ছিল অপরিসীম। মধ্বাচার্যকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত যে, শুধু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমে এ ষাঁড়টি যথেষ্ট প্রগতি লাভ করছে। এ ধরনের মন্তব্য মধ্বাচার্যের কিছু শিষ্যকে ঈর্ষান্বিত করেছিল। অধিকন্তু অনেকে ষাঁড়টিকে সর্পদংশনে মৃত্যুর অভিশাপ প্রদান করেছিল। পরম দয়ালু মধ্বাচার্য এ অভিশাপ সম্পর্কে শ্রবণ করে ষাঁড়টিকে অক্ষত থাকার আশীর্বাদ প্রদান করেন। অভিশাপ অনুসারে একটি সাপ এসে ষাঁড়টিকে দংশন করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সাপটির মৃত্যু হয়েছিল। মধ্বাচার্যের প্রচার অভিযানে সর্বতোভাবে নিজেকে উৎসর্গ করায় ষাঁড়টি তাঁর প্রিয় ভক্তে পরিণত হয় এবং সর্পদংশনজনিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। কিছুকাল পর ষাঁড়টি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধ বয়সে দেহ ত্যাগ করে।

প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো সাধারণ ষাঁড় ছিল না। ষাঁড়টি ছিল দেবরাজ ইন্দ্র ও অনন্তশেষের অবতার। একইভাবে ষাঁড়টির পরবর্তী জন্মে এক ধার্মিক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এবং মধ্বাচার্যের শিক্ষা অনুসারে বৈদিক সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করাও কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না।

যাইহোক, তিনি জলে দাঁড়িয়েই প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রীপাদ অক্ষোভ্য তীর্থকে বললেন, "হে মহাত্মা, আপনি কে? আপনি কোথা থেকে এসেছেন এবং আপনি কীভাবে আমাকে জানেন? কেবল আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা আমার সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিতভাবে আমার 'গুরুদেব'। আপনি আমার চক্ষু উন্মীলন করেছেন। আপনি আমার প্রকৃত স্বরূপের অজ্ঞতার আবরণ ছেদন করেছেন। অনুগ্রহ করে আপনি আরো কিছু বলুন। আমাকে পথ নির্দেশ করুন, আমার শিক্ষাগুরু হিসেবে আমার জীবন ধন্য করুন। হে গুরুদেব, আমাকে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করুন।"

এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে অভিভূত হয়ে তিনি এত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে চাননি। উপরন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে অক্ষোভ্য তীর্থের আনুষ্ঠানিক শিষ্যত্ব লাভের প্রার্থনা করেছিলেন।

অন্য অশ্বারোহীরাও নদী অতিক্রম করে তাঁর সাথে যোগ দিয়ে কিছুসময় অক্ষোভ্য তীর্থের সাথে কথোপকথনে অতিবাহিত করেছিল। কিন্তু তাঁরা সকলে ভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ায়, তাঁকে রেখেই রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিল। এদিকে সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর পিতা সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে আনেন।

কোনোরকম প্রতিবাদ না করেই ধোণ্ডো রঘুনাথ তাঁর পিতাকে অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তাঁর ক্রোধাহত পিতা তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় তিনি অক্ষোভ্য তীর্থের নিকট রেখে এসেছিলেন। গভীর অনুধ্যান করে তিনি একটি পরিকল্পনা করেছিলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সে অনুযায়ী তিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনের অবসান করেছিলেন।

গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ

সে রাতে তিনি যখন তাঁর দুই পত্নীর কাছে ফিরে গেলেন, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তাঁর যুবতী পত্নী তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে একটি বড় অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। সাপটি গভীর অনুধ্যানে সমাধিমগ্নের মতো ছিল। সেই পত্নী ভীত হয়ে চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অচেতন হয়ে পড়েন।

তাঁর পিতা রঘুনাথ রায় খুব শীঘ্র কিছু ঘটতে যাচ্ছে ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলেন। এই বিশেষ দৃশ্য দর্শন করে রঘুনাথ রায় উপলব্ধি করেন যে, এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। তাই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পুত্রকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অক্ষোভ্য তীর্থের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

যথাসময়ে তাঁকে দীক্ষা দানের মাধ্যমে সন্ন্যাস প্রদান করা হয়েছিল এবং তাঁর নতুন নাম হয়েছিল জয়তীর্থ। প্রচলিত ধারণা অনুসারে আনুমানিক ১৩৬৭ সালে শ্রীপাদ জয়তীর্থ বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। কিন্তু কালের আবর্তনে নির্দিষ্ট সময় ও তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকেই এ ঘটনাটির সাথে একমত পোষণ করেন না। তাদের মতে ১৪ শতাব্দীর কঠোর ব্রাহ্মণ সমাজে এরকমটি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাসতীর্থ কর্তৃক বর্ণিত এ ঘটনা কেউ তার ক্ষুদ্র যুক্তি ও জ্ঞান দ্বারা গ্রহণ করুক বা না করুক তাতে কিছু যায় আসে না।

টীকাচার্য শ্রীপাদ জয়তীর্থ অনেকবার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং নির্বিশেষ দর্শন পরাভূত করেছিলেন। তিনি কখনো পরাভূত হননি বরং তিনি একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব আচার্যরূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

তিরোভাব

তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো মন্যক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন, যা এক সময় মাইশোর প্রদেশের কর্ণাটকের রাষ্ট্রকূট রাজাদের রাজধানী ছিল। অনেকের মতে, তিনি এখানেই চল্লিশ বছর বয়সে আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু উত্তর কর্ণাটকেও তাঁর একটি সমাধি মন্দির রয়েছে। হাম্পির তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী পদ্মনাভ তীর্থের সমাধির পার্শ্ববর্তী এ সমাধিতে একটি ফলকে একদিকে তাঁকে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র এবং পাশেই একজন সন্ন্যাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যানিধি তীর্থ

শ্রীবিদ্যানিধি তীর্থ

শ্রীপাদ বিদ্যাধিরাজ তীর্থ ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে (১১৯০ শকাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৮৮-১৪১২ সাল পর্যন্ত পীঠে অবস্থান করেছিলেন। মধ্ব-পরম্পরা-ধারা অনুসারে তিনিও জয়তীর্থের একজন প্রথম দিকের শিষ্য এবং মঠের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল কৃষ্ণভট্ট, কিন্তু শাস্ত্র বিচারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁর গুরুদেব তাঁকে নৃসিংহ শাস্ত্রী নাম প্রদান করেছিলেন এবং তাঁকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে সরাসরি চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস প্রদান করেছিলেন।

আমরা সহজে অনুমান করতে পারি যে, তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু বেদান্তপীঠে তাঁর কালযাপনের বিষয়টি স্পষ্ট নয়। শ্রীপাদ জয়তীর্থ, বিদ্যানিধি তীর্থকে সাত বছর নয় মাস তেরো দিনের জন্য বেদান্তপীঠের পরবর্তী মঠ-প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

জয়তীর্থ কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর, এবং তা ছিল জয়তীর্থের তিরোভাবের প্রায় এক বছর পূর্বে। অনেকের মতে, তিনি ১৩৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটি জয়তীর্থের নিকট থেকে তাঁর দীক্ষা গ্রহণের বিষয়টিকে ভিত্তিহীন করে তোলে। সেজন্য পূর্বোক্ত মতটিই সঠিক ধরে নেওয়া হয়েছে।

ভক্তিমান লেখক কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-এর ২২নং শ্লোক অনুসারে, "অক্ষোভ্য তীর্থের শিষ্য ছিলেন জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য ছিলেন জ্ঞানসিন্ধু। জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য ছিলেন মহানিধি। মহানিধির শিষ্য ছিলেন বিদ্যানিধি। বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন রাজেন্দ্র।" কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের "গুরু পরম্পরা" গানে তিনি বলেছেন, "মাধব তীর্থ মহান পরমহংস অক্ষোভ্য তীর্থকে তাঁর শিষ্যরূপে বরণ করেন। অক্ষোভ্য তীর্থের প্রধান শিষ্য জয়তীর্থ নামে পরিচিত ছিলেন। জয়তীর্থের শিষ্য ছিলেন জ্ঞানসিন্ধু। জ্ঞানসিন্ধুর কাছ থেকে ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করেন দয়ানিধি এবং দয়ানিধির সেবক ছিলেন বিদ্যানিধি (বিদ্যাধিরাজ তীর্থ)। বিদ্যানিধি তীর্থের শিষ্য ছিলেন রাজেন্দ্র তীর্থ।" অর্থাৎ মহানিধি ও দয়ানিধি একই ব্যক্তি।

ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণু সহস্রনামের উপর রচিত 'দ্বৈত ভাষ্য' বিদ্যানিধি তীর্থের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কর্ম।

শ্রীপাদ বিদ্যানিধি তীর্থ ১৪৩ বছর এ জগতে প্রকট ছিলেন। ১৪১২ সালে তিনি নিত্যধামে গমন করেন।
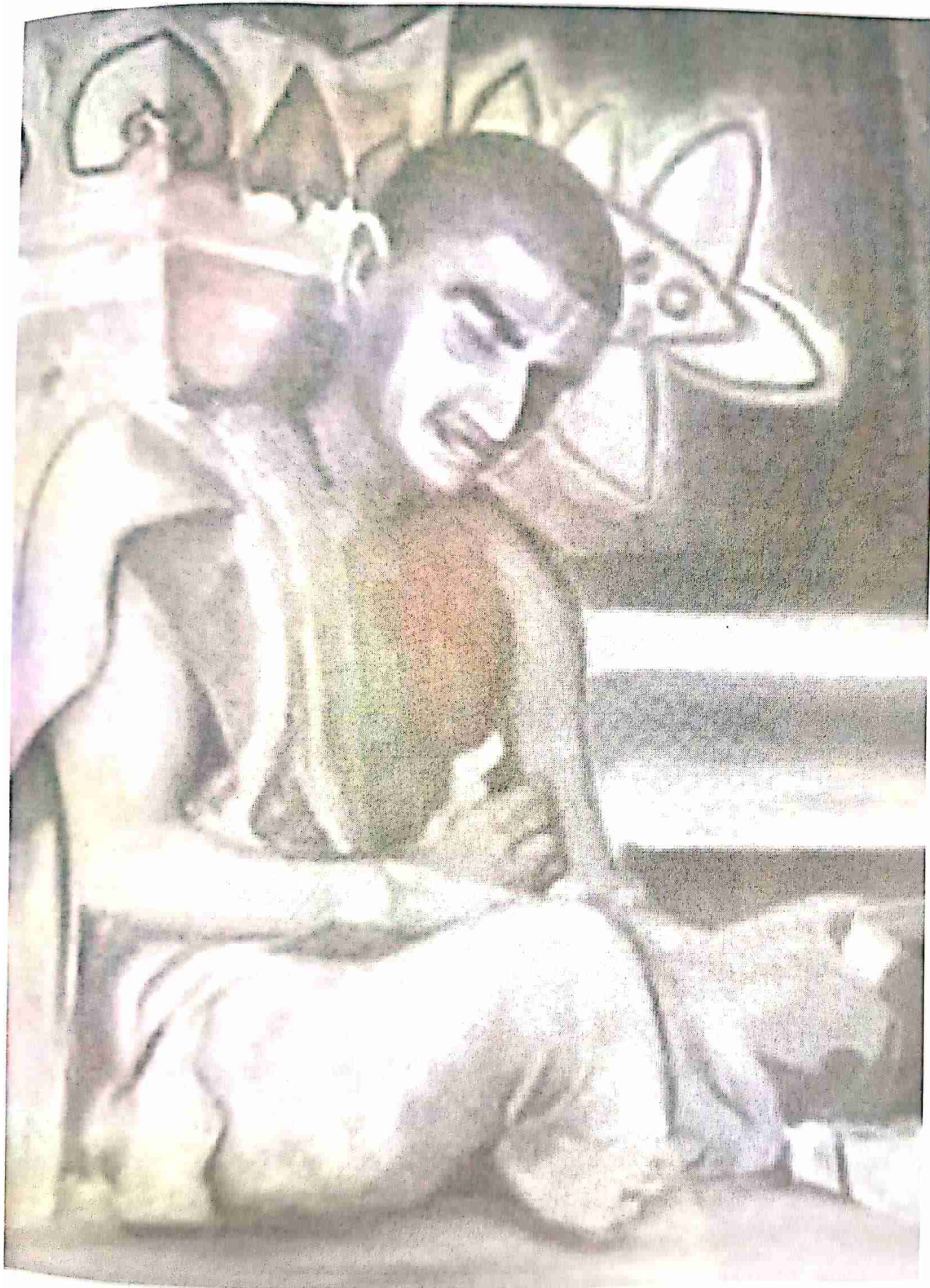
শ্রীরাজেন্দ্র তীর্থ

শ্রীরাজেন্দ্র তীর্থ

শ্রীপাদ রাজেন্দ্র তীর্থ ছিলেন বিদ্যানিধি তীর্থের প্রথম শিষ্য এবং বয়সে সবচেয়ে প্রবীণ। তাঁর বয়স, পাণ্ডিত্য ও ভক্তির সুগভীর উপলব্ধির জন্য তিনিও ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পীঠের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

তিনি হেবিলাম্বি নামক স্থানে দীক্ষা এবং মঠাধিপত্য লাভ করেন। তখন গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিভাজিত হয়ে পড়ে। সে সম্পর্কে একটি কাহিনী শোনা যায় যে, এক সময় বিদ্যানিধি তীর্থ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজেন্দ্র তীর্থকে অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের জন্য সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় নিকটবর্তী কোনো স্থানে না থাকায় অনেক সময় পর্যন্ত এ সংবাদটি তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। বিদ্যানিধি তখন শ্রীপাদ কবিন্দ্র তীর্থকে মঠের দায়িত্ব প্রদান করেন।

অনেকের মতে, প্রচার ক্ষেত্রে কবিন্দ্র তীর্থের বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যাধিরাজ তীর্থ তাঁকে আহ্বান করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপের কারণ আমরা অনুমান করতে পারি না। তবে এটি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, তা কেবল ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করা হয়েছিল। রাজেন্দ্র তীর্থ থেকে আগত পরম্পরা ধারা এখন ব্যাসতীর্থের প্রতিনিধিত্বে ব্যাসরায় মঠ এবং সোসালে মঠ কর্তৃক আজও পরিচালিত হচ্ছে।

রাজেন্দ্র তীর্থের উত্তর ভারতে অনেক শিষ্য ছিল। সেখানকার একজন শিষ্য হলেন বিষ্ণুদাসাচার্য। বিষ্ণুদাসাচার্য ব্যাসতীর্থের আবির্ভাবের একশত বছর পূর্বেই তাঁর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'বাদরত্নাবলী', 'খণ্ডন-খণ্ডন' এবং 'বিবরণ বিড়ম্বন' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উত্তর ভারতে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। একইভাবে বিতর্কিত বিভুদেন্দ্র তীর্থ তার যৌক্তিক দক্ষতা এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের মাধ্যমে উত্তর কর্ণাটকসহ অনেক জায়গায় মধ্ব সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, এই বিষ্ণুদাসাচার্য (১৩৯০-১৪৪০) কিন্তু রাজেন্দ্র তীর্থের শিষ্য জয়ধর্ম তীর্থের শিষ্য বিষ্ণুপুরী নন, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের উপর তাঁর ভাষ্য ভক্তিরত্নাবলী রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রদান করেছিলেন। শ্রীপাদ বিদ্যাধিরাজ তীর্থ মালকেড়-এর নিকটবর্তী এরগোলা-তে দেহত্যাগ করেন। প্রাচীন এরগোলা শহর এখন ধ্বংসাবশেষের নিচে বিলুপ্ত, যেখানে শ্রীযুক্ত বিদ্যাধিরাজ তীর্থ এবং রাজেন্দ্র তীর্থ উভয়ের সমাধি মন্দির রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

শ্রীজয়ধর্ম তীর্থ

শ্রীজয়ধর্ম তীর্থ

শ্রীপাদ জয়ধর্ম তীর্থ হলেন শ্রীপাদ রাজেন্দ্র তীর্থ এবং ব্যাস তীর্থের অন্তর্বর্তীকালীন একজন আচার্য। তিনি জয়ধর্ম মুনি, জয়ধ্বজ তীর্থ এবং বিজয়ধ্বজ তীর্থ নামেও পরিচিত। মঠের পরম্পরা ধারার তালিকায় শ্রীপাদ অক্ষোভ্য তীর্থ থেকে আগত পেজোয়ার মঠের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি ১৪৩৪ খ্রি. থেকে ১৪৪৮ খ্রি. পর্যন্ত মঠের সপ্তম পীঠাধিপতি ছিলেন।

কেউ কেউ তাঁকে জয়তীর্থের শিষ্য হিসেবে মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, বরং তিনি ছিলেন জয়তীর্থের প্রশিষ্য। শ্রীরামের যে বিগ্রহটি শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থ সেবা করতেন তা আজও পেজোয়ার মঠে রয়েছে। অনেকের মতে সন্ন্যাসী হিসেবে সমুদ্র অতিক্রম করে দ্বারকা পরিদর্শনের পাপস্বরূপ তিনি উত্তরাদি মঠের রঘুনাথ তীর্থ কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং এর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতম-এর ভাষ্য রচনার কার্যভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। এ কাজটি তিনি কৃষ্ণ মঠে একটি পিপুল গাছের নিচে বসে সম্পাদন করেন। কিন্তু বি.এন.কে শর্মাসহ অনেক ভক্ত এবং মাধ্ব দর্শনের পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এক মত নন। প্রকৃতপক্ষে শর্মার মতে, "উপরোক্ত গল্পটি ভিত্তিহীন এবং তা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে বলা হয়েছে। বিজয়ধ্বজ তীর্থের শ্রীমদ্ভাগবতম-এর ভাষ্য বিশুদ্ধ প্রেম ও স্বতঃস্ফূর্তসেবা মনোভাব থেকে রচিত"।

বিজয়ধ্বজ তীর্থ শ্রীমদ্ভাগবতম-এর উপর শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য অনুসরণে 'ভক্তিরত্নাবলী' নামে নতুন ভাষ্য রচনা করেন যা তাঁর শিষ্য বিষ্ণুপুরীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বৈষ্ণব হিসেবে শ্রীধর স্বামী অত্যন্ত বিপদজনক সময় অতিবাহিত করছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর ভাষ্যের অর্থ আবৃত বা গোপন করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে তো বটেই, এমনকি আজও অনেকেই শ্রীধর স্বামীকে নির্বিশেষবাদী বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত এবং সবিশেষ অর্থ আবৃত করে রাখতে হয়েছিল, কারণ সে সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশকারী যেকোনো কিছুকেই নষ্ট করার জন্য অনেক ভ্রান্ত মায়াবাদী প্রস্তুত ছিলেন। শুধু তাই নয়, মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়ে অনেক ভক্তকে শারীরিক প্রহার, নির্যাতন এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে।

যেকোনভাবেই হোক, সবিশেষবাদরূপ অমূল্য রত্ন যেন যুগাবর্তে সকলে প্রাপ্ত হয় সে লক্ষ্যে ভক্তদের অভূতপূর্ব সংগ্রাম, মর্যাদা ত্যাগ এবং সর্বতোভাবে নিজের ভালো-মন্দ ত্যাগ সত্যিই বিস্ময়কর। ভগবৎ-সেবাকার্যে নিয়োজিত এ সমস্ত মহান ব্যক্তির প্রতি সত্যিই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

পশ্চিম কর্ণাটকের তীরবর্তী অন্য অনেক সন্ন্যাসীর সাথে শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থ বাল্যাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণ ও প্রচার হেতু তাঁকে ভিক্ষা গ্রহণ

করার মাধ্যমে জীবন ধারণ করতে হতো, কিন্তু মাঝে মধ্যে তাঁকে তিনদিন বা পাঁচদিন যাবৎ অনাহারেই কাটিয়ে দিতে হতো।

ক্ষুধায় জর্জরিত ও অনন্যোপায় হয়ে একদা এই অতি কৃষ ও শক্তিহীন নবীন সন্ন্যাসী কিছু বন্য শাক-পাতা পথের ধার থেকে প্রাপ্ত কিছু পাথর ও কাঠ দিয়ে রান্নার আয়োজন করছিলেন। অনেকের মতে, উত্তরাদি মঠের রঘুনাথ তীর্থ নামে এক প্রবীণ ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসী তা দেখতে পেয়েছিলেন। বিজয়ধ্বজ তীর্থকে স্বতন্ত্রভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও ভগবানকে অর্পণের নামে রাস্তার পাশে জনসমক্ষে তা ভোগ করতে দেখে তিনি খুব আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি বালকটিকে সংশোধনের জন্য বলেছিলেন যে, এ ধরনের কাজ সন্ন্যাস ধর্ম ও স্বভাব বিরুদ্ধ। সন্ন্যাসীর কেবল ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হওয়া কর্তব্য এবং যদি কোনোকিছু পাওয়া না যায় সেটিও ভগবানেরই ইচ্ছা।

তারপর তিনি বালকটিকে বলেছিলেন, এ ধরনের অধার্মিক আচরণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ হলো এই পাপময় দেহ ত্যাগ করা। তাই সেই অতি বিনীত ও শুদ্ধ-হৃদয় বালক বিজয়ধ্বজ তীর্থ স্বামী এ জগৎ পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে সময় অন্য আরেকজন সন্ন্যাসীর আগমন ঘটলো। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন শ্রীপাদ রাজেন্দ্র তীর্থ। বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করে তিনি সেই সন্ন্যাসী বালকের মৃত্যুর প্রস্তুতির বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তারপর তিনি বালকটিকে জিজ্ঞেস করলেন– কেন সে এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "সন্ন্যাসী হিসেবে যিনি তাঁর মন, দেহ, বুদ্ধিমত্তা এবং নিজেকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেছেন, তাঁর উচিত ভগবানের সেবায় এগুলোকে যথার্থভাবে ব্যবহার করা। এ দেহ আমাদের সম্পত্তি নয় এবং তাই আত্মহননের মাধ্যমে অন্যের অর্থাৎ ভগবানের সম্পত্তি নষ্ট করা আরো বেশি পাপময়। ভগবানের সেবায় যুক্ত নয় এরকম অন্য কোনো সাধারণ সন্ন্যাসী তা করতে পারে, কিন্তু তোমার মতো বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে তা উচিত নয়। যদি তুমি মনে করো তুমি কোনো অপরাধ করেছ, তাহলে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে তা শোধন করা সর্বোত্তম"। তারপর তিনি বালকটিকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করতে নির্দেশ দেন এবং নিশ্চিত করেন যে, এর মাধ্যমে সবকিছু সমাধান হবে। এভাবে এই উন্নত ভক্তিমূলক সাহিত্যকর্ম সম্পাদিত হলে তার নাম দেয়া হয় 'পদরত্নাবলী'। নিরপরাধ এবং শরণাগত শুদ্ধ ভক্ত হিসেবে তিনি তাঁর মনোভাব তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন। আজও মধ্বাচার্যের অনুসারীরা উদ্ধৃতির জন্য এই ভক্তিমূলক কর্মকে একটি আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করেন। চমৎকার এ ভাষ্যের শেষাংশে শ্রী বিজয়ধ্বজ তীর্থ আকুলভাবে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন–

ব্যাখ্যায়া ভাগবতস্য কৃষ্ণ রচিত তৎপ্রীতি কামাত্মন।
প্রীতাশ্চেত প্রদাদসি তৎ প্রতিনিধিং তৎপ্রীতি বরিয্যে বরণ ॥
প্রাঙ্গনিস্কিঞ্চরাতম্ তব পতিভরম পদারবিন্দাত্মনা।
সংশক্তিম্ শুকতীর্থ শাস্ত্র বিজরাজরাস্য পরমাত্মায়া ॥

"প্রিয়তম কৃষ্ণ, তোমার প্রতি ভালোবাসা বশত শুধু তোমার প্রীতি কামনায় আমি শ্রীমদ্ভাগবতের এ ভাষ্য রচনা করেছি। যদি তা তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তাহলে কৃপা করে

আমাকে তিনটি বর দান করো– আমি যেন এ জন্মে এবং অন্য সকল জন্মে দরিদ্র জীবন লাভ করি, আমি যেন কৃষ্ণভাবনার উপর ভাগবতপদাচার্য (শুকতীর্থ) মধ্বের রচিত ভক্তিমূলক রচনাসমূহ সর্বদা অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করি এবং এভাবে পরিশেষে আমি যেন পূর্ণরূপে তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে তোমার চরণের দাস হিসেবে সর্বদা তোমার সঙ্গ লাভ করতে পারি।”

বিজয়ধ্বজ তীর্থ বিভিন্নভাবে আমাদের সম্প্রদায়ের ভক্তি এবং একইসাথে সাহিত্যের বিভিন্ন কাঠামো গঠনে সহায়তা করেছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ‘ষট্ সন্দর্ভ’-এ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

পরম্পরাধারায় শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজ তীর্থ পেজোয়ার মঠের ষষ্ঠ মঠাধিপতি ছিলেন। তিনি মধুসূদন মাসের তৃতীয় দিন অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। তাঁর সমাধি কল্যাণতীর্থে অবস্থিত।

শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ

শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ

শ্রীপাদ বিদ্যাধিরাজ তীর্থের পর রাজেন্দ্র তীর্থের পরম্পরার তৃতীয় আচার্য শ্রীপাদ ব্রহ্মণ্যতীর্থ। তাঁর সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। ব্রহ্মণ্যতীর্থ তাঁর পৈত্রিক ভিটে চানাপাটনায় জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। সেখানে তিনি একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য শ্রীধরতীর্থকে দিয়ে যান। সেই মঠটি বর্তমানে কুণ্ডপুর মঠ নামে খ্যাত। তাঁর আরেক শিষ্য হলেন শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ। ব্রহ্মণ্যতীর্থের কৃপাবলেই ব্যাসতীর্থের বাবা-মা তাঁকে লাভ করেন।

ব্যাসতীর্থ ছিলেন তাঁর বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা বাল্লানা তাঁকে ব্রহ্মণ্যযতির (ব্রহ্মণ্যতীর্থ) কাছে সমর্পণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ছোট বালকটির প্রতি পরিবারের গভীর আসক্তি থাকা সত্ত্বেও গুরুদেবকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য বালকটিকে যতিরাজ নাম দিয়ে তিনি ব্রহ্মণ্যতীর্থের নিকট সমর্পণ করেন। তাঁর নামটি শুধু তাঁকে ব্রহ্মণ্যতীর্থের সম্পদস্বরূপই নির্দেশ করে না, অধিকন্তু তা সন্ন্যাসী হিসেবে বালকটির ভবিষ্যৎও নির্দেশ করে। তাই যথাসময়ে বাল্লানা নিজেই ছেলেটিকে চানাপাটনা নিয়ে যান এবং ব্রহ্মণ্যতীর্থের সেবক হিসেবে প্রদান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্রহ্মণ্যতীর্থ তাঁর দত্তক হিসেবে এ উৎকৃষ্টতর প্রাপ্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁকে একজন সন্ন্যাসীতে রূপান্তর করার জন্য মনে মনে চিন্তা করছিলেন, যাতে তাঁর উন্নত বুদ্ধিমত্তা বৈষ্ণব ধর্মের কাজে আসে।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর যতিরাজ ব্রহ্মণ্যতীর্থের মনোভাব বুঝতে অসমর্থ হয়ে পালিয়ে বনে গমন করে আশ্রম থেকে দূরে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এক রাতে বনে একটি বৃক্ষের নিচে শয়নকালে ভগবান বিষ্ণু তাঁকে দর্শন দেন এবং বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে তিনি সেদিনই আশ্রমে ফিরে আসেন। এর কিছুকাল পর যতিরাজের গুরুনিষ্ঠা দেখে ব্রহ্মণ্যতীর্থ যতিরাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাঁর নাম দেন ব্যাসতীর্থ।

১৪৭৫ এবং ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ– এ দুবছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের কিছুকাল পর ব্রহ্মণ্যতীর্থ এ ধরাধাম থেকে অপ্রকট হন।
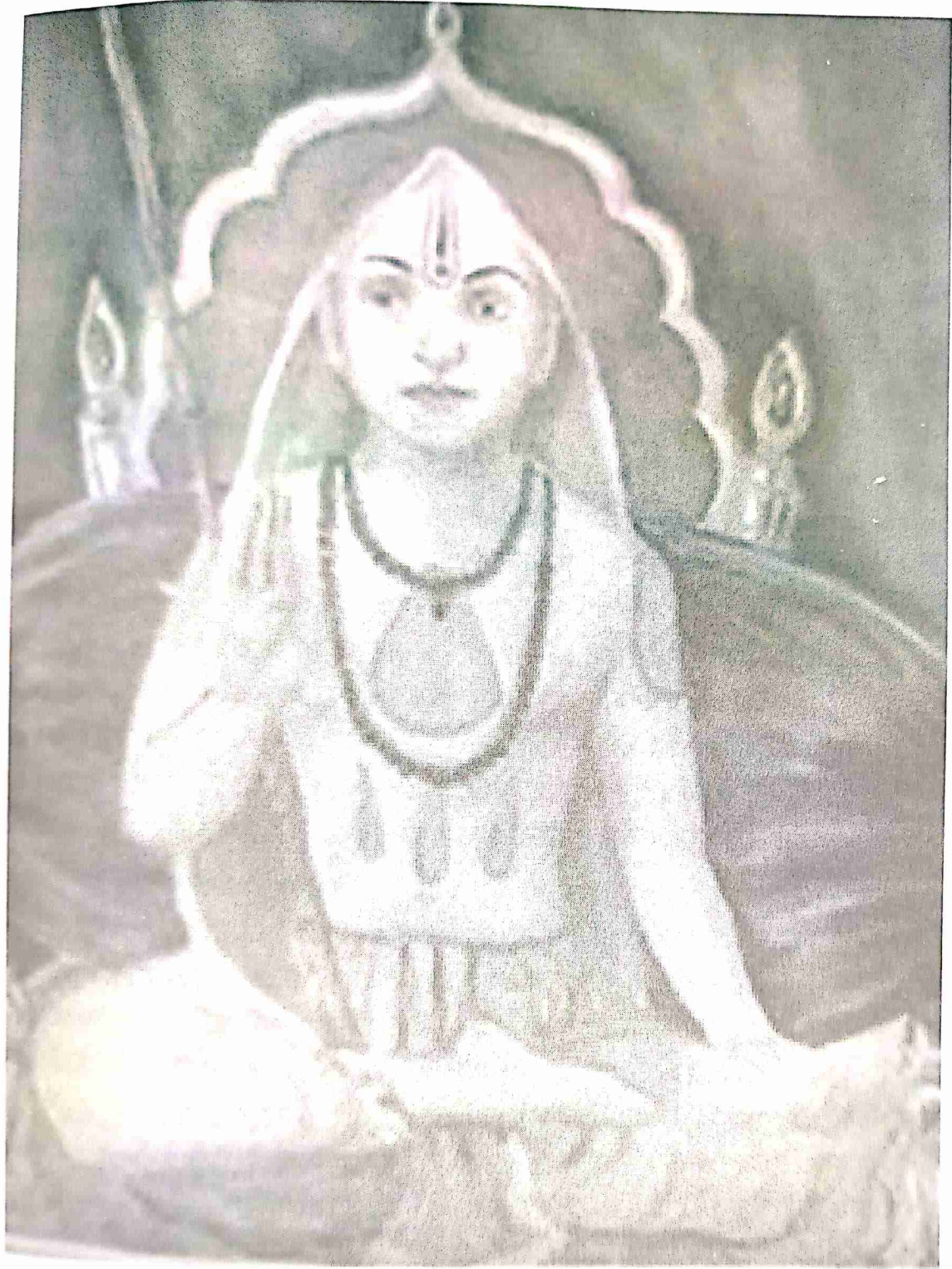
শ্রীব্যাসতীর্থ

শ্রীব্যাসতীর্থ

জন্ম ও পরিচয়

শ্রীল ব্যাসতীর্থকে ব্যাসরাজ স্বামী বলেও অভিহিত করা হয়। তিনি শ্রীপাদ ব্রহ্মণ্যতীর্থের শিষ্য এবং রাজেন্দ্র তীর্থ থেকে আগত পরম্পরা ধারায় চতুর্থতম। ভারতের মাইশুর জেলার বানুর গ্রামে আনুমানিক ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বাল্লানা সুমতি। তিনি ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় রামাচার্যের ষষ্ঠ সন্তান। তাঁর (বাল্লানা) প্রথম স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তানহীন থাকায় তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং তিন সন্তান লাভ করেন। এ সূত্রে সুমতি নামটি তাঁর ডাক নাম হিসেবে দেয়া হয় এবং বাল্লানা নামটি সম্ভবত বলরাম নামের চলিত রূপান্তর।

ব্রহ্মণ্যতীর্থের আশীর্বাদস্বরূপ বাল্লানার দ্বিতীয় সন্তানরূপে ব্যাসতীর্থ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ যতিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। এ নামটি তাঁর পিতার গুরু শ্রীপাদ ব্রহ্মণ্য যতির উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল। রীতিসিদ্ধ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যতিরাজ বিদ্যারম্ভ সংস্কার লাভ করেন, যার শুরু হয় বর্ণমালা লেখা শেখার মাধ্যমে। সাত বছর বয়সে তিনি উপনয়ন লাভ করেন। এবং পরবর্তী চার বছর তিনি কেবল গুরুকুলে অবস্থান করেছিলেন। এগারো বছর বয়সে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাঁচ বছর যাবৎ কাব্য, নাট্য ও ব্যাকরণ বিষয়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যান।

দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা বাল্লানা তাঁর দ্বিতীয় সন্তানকে ব্রহ্মণ্যতীর্থের কাছে সমর্পণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ছোট বালকটির প্রতি পরিবারের গভীর আসক্তি থাকা সত্ত্বেও গুরুদেবকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য বালকটিকে যতিরাজ নাম দিয়ে তিনি ব্রহ্মণ্যতীর্থের নিকট সমর্পণ করেন। তাঁর নামটি শুধু তাঁকে ব্রহ্মণ্যতীর্থের সম্পদস্বরূপই নির্দেশ করে না, অধিকন্তু তা সন্ন্যাসী হিসেবে বালকটির ভবিষ্যতও নির্দেশ করে। তাই যথাসময়ে বাল্লানা নিজেই ছেলেটিকে চানাপাটনা নিয়ে যান এবং ব্রহ্মণ্যতীর্থের সেবক হিসেবে প্রদান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্রহ্মণ্যতীর্থ দত্তক হিসেবে এ উৎকৃষ্টতর প্রাপ্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁকে সন্ন্যাসীতে রূপান্তর করার জন্য মনে মনে চিন্তা করছিলেন, যাতে তাঁর উন্নত বুদ্ধিমত্তা বৈষ্ণব ধর্মের কাজে আসে।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর যতিরাজ ব্রহ্মণ্যতীর্থের মনোভাব বুঝতে অসমর্থ হয়ে পালিয়ে বনে গমন করে আশ্রম থেকে দূরে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এক রাতে বনে একটি বৃক্ষের নিচে শয়নকালে ভগবান বিষ্ণু তাঁর নিকট আসেন এবং তিনি তাঁর জন্য কী পরিকল্পনা করেছেন তা জানান। ভগবান বিষ্ণু তারপর যতিরাজকে কী করতে

হবে তা বলেন। সেদিনই কিশোর যতিরাজ আশ্রমে ফিরে আসেন এবং এর কিছুকাল পর গুরুর প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রমাণিত হলে, যতিরাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করা হয় এবং তাঁর নাম দেওয়া হয় ব্যাসতীর্থ।

পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতি অর্জন

১৪৭৫ এবং ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ– এ দুবছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের কিছুকাল পর তাঁর গুরু ব্রহ্মণ্যতীর্থ এ ধরাধাম থেকে অপ্রকট হন। কৈশোর বয়সের শেষ পর্যায়ে আনুমানিক ১৪৭৮ সালে তিনি বেদান্ত পীঠে আগমন করেন। তাঁর বয়স কম হওয়ায় এবং তিনি তাঁর গুরুদেবের সান্নিধ্যে কম সময় অতিবাহিত করেছিলেন বলে অনেকে বলতো যে তিনি মধ্ব শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত ভালোভাবে জানতেন না। তাই তিনি কাঞ্চিপুরমে অধ্যয়নের জন্য গমন করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই তিনি সর্বজনবিদিত পণ্ডিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এ সময় ব্যাসতীর্থ সমস্ত শাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞান, উপলব্ধি এবং যুক্তিসমূহ আয়ত্ত করেন। কাঞ্চিপুরম সে সময় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে শাস্ত্রিক শিক্ষার পীঠভূমি ছিল। ব্যাসতীর্থ সেখানে অনেকদিন অবস্থান করে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে ষড়দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি সমস্ত প্রকার দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন; এমনকি শঙ্কর ও রামানুজ দর্শনে এবং একইসাথে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কর্ম 'ন্যায়ামৃত', 'তাৎপর্য চন্দ্রিকা' এবং 'তারকাতাণ্ডব' সেই সাক্ষ্য বহন করে।

সমকালীন আঞ্চলিক ইতিহাসে বিষনাগ নামে এক মহান রাজার কথা উল্লেখ রয়েছে, যিনি ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়ের একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নিয়মিত ভাগবত-কথা শ্রবণ করতেন। তিনি সারা জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, এমনকি কখনো কোনো নারীকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। তবে এ কথা সরাসরি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। ইতিহাস মতে তিনি ছিলেন শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ।

কাঞ্চিপুরম থেকে তিনি মুলবাগাল-এ শ্রীপাদরাজের পীঠে আসেন, যা ছিল কাঞ্চির মতো আরেকটি বিদ্যার্জনের স্থান। শ্রীপাদরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থ (১৪২০-১৪৮৭) নামেও পরিচিত ছিলেন। মুলবাগাল-এ তিনি ছিলেন পদ্মনাভ তীর্থের প্রধান মঠাধিপতি এবং স্বর্ণাবর্ণ তীর্থের সপ্তম বংশধর। প্রচলিত আছে যে, ব্রহ্মণ্যতীর্থের মা এবং শ্রীপাদরাজের মা ছিলেন বৈপিত্রেয় বোন এবং তাঁরা ছিলেন প্রায় সমবয়সী। শ্রীপাদরাজের পিতা ছিলেন উত্তরাদি মঠের রঘুনাথ তীর্থের সমকালীন। তিনি ১৪৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০২ সালে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীপাদরাজের পরামর্শে ব্যাসতীর্থ সেখান থেকে বিদ্যানগর এবং রাজদরবারে যান (১৪৮৫-৮৬)। সেখানে ব্রাহ্মণত্ব, বৈষ্ণবতা, বর্ণাশ্রম এবং কে ভগবানের আরাধনার উপযুক্ত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বক্তব্যের জন্য তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

চন্দ্রাগিরিতে আগমন

ব্যাসতীর্থের জীবনবৃত্তান্তের পরবর্তী অংশটিতে, চন্দ্রাগিরিতে সালুভ নরসিংহের রাজদরবারে তাঁর আগমন এবং তাঁর রাজকীয় অভ্যর্থনার বিষয়ে অতি চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। তিনি রাজা কর্তৃক মহামূল্যবান মণিমুক্তা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য দ্বারা অভিষিক্ত হন এবং একজন বরেণ্য আচার্যের উপযোগী সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। এভাবে ব্যাসতীর্থ সেখানে বছর দুয়েক রাজকীয় সম্মানে অতিবাহিত করেন।

সেখানে তৎকালীন অনেক পণ্ডিতের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাদের সকলকে তাত্ত্বিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেন এবং গঙ্গেশতত্ত্ব চিন্তামণি-এর মত ও যুক্তির ওপর বিতর্ক পরিচালনা করেন। সে সময় তাঁকে তিরুপতিতে ভগবান বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করা হয়। তিরুমালাতে পর্বতের উপর ব্যাসতীর্থের মঠ এখনও বর্তমান। বারো বছর (১৪৮৬-৯৮) সেখানে অবস্থান করার পর সে স্থানটি ত্যাগ করার পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যদের ওপর পূজার্চনার ভার ন্যস্ত করেন।

সিংহাসনে আরোহন

একদা শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিজয়নগরের শাসক 'কুহায় ওগা' নামক গ্রহসমূহের অশুভ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হবেন। তাঁর ভক্তদের এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে এ অশুভ মুহূর্ত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি নিজেই এ সময় সিংহাসনে আরোহন করেন। সেই মিলিত এবং একনিষ্ঠ অশুভ শক্তির প্রভাব ছিল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো, যার সিংহাসনসহ সমগ্র প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা ছিল। শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ তাঁর অঙ্গবস্ত্র দ্বারা এ আগুন নিভিয়ে ফেলেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য কৃষ্ণদেব রায়-এর হাতে রাজ্য হস্তান্তর করেন। এ অলৌকিক ঘটনাটি হরিদাস (দশকুটার একজন) কর্তৃক কতিপয় গীতে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনার স্মৃতিচারণ করে এমনকি আজও ব্যাসতীর্থ ধারার স্বামীজিরা এ দিনটিতে দরবারের আয়োজন করে থাকেন।

এরপর থেকে ব্যাসতীর্থকে বিজয়নগর রাজ্যের হিতৈষী অভিভাবক হিসেবে মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়। কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই তাঁকে এ পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। সে সময় ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁকে একটি বিতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানান। উড়িষ্যার কলিঙ্গের বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাসব ভট্ট পণ্ডিতদের নেতৃত্ব দান করছিলেন। ত্রিশদিন তুমুল প্রতিদ্বন্দিতার পর ব্যাসতীর্থ বিজয় অর্জন করেন। এই খ্যাতির ফলে ১৫০৯ সালে রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁকে গুরু হিসেবে বরণ করেছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ১৫০০ সালে তাঁকে একটি উটচিহ্নিত সবুজ পতাকা উপহার দেন, যার পেছনে একটি ঢাকের প্রতীকও বিদ্যমান। তা আজও গোসালের ব্যাসার্য মঠে সংরক্ষিত আছে। একসময় রাজা নৃসিংহ মুসলিম সুলতানদের আক্রমণ করেছিলেন। তখন এ পতাকাটি তাঁর সঙ্গে ছিল। এই মুসলিম সুলতানরা দক্ষিণ ভারতের মন্দির ও ভক্তদের জন্য হুমকি ও নির্যাতনের কারণ হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণদেবরায়, নৃসিংহ, শিবাজি এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় মহাত্মা রাজাদের শাসনকালে সুলতানরা অধিক অগ্রসর হতে পারেনি।

১৫১১ সালে রাজা তাঁকে কাঞ্চিতে ভগবান বরদরাজ-এর আবহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পাদাইবিদু রাজ্যে পুলম্বকম্ নামে একটি গ্রাম প্রদান করেন। রাজা তাঁকে একটি স্বর্ণনির্মিত শেষবাহন (অনন্তদেব)ও প্রদান করেন, যা সবসময় সেই অনুষ্ঠানের চতুর্থ দিনে ভগবানের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাম্পিতে বিট্‌ঠলস্বামী মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডপের দক্ষিণ দেয়ালের একটি লিপিতে ১৫১৩ সালে রাজা কৃষ্ণদেব রায়-এর একটি অনুমোদন স্মারকে ব্যাসতীর্থকে তাঁর 'গুরু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে ব্যাসতীর্থ কর্তৃক রাজা কৃষ্ণদেব রায়-এর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের কথাও উল্লেখ রয়েছে। 'তন্ত্রসার' অনুযায়ী, গুরুদেব কর্তৃক শিষ্যের অভিষেক শিষ্যের মহিমা বৃদ্ধি করে থাকে।

রাজা কৃষ্ণদেবরায় সম্পর্কে অনেক কথা প্রচলিত আছে। তিনি কর্ণাটকের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত বিজয়নগর রাজ্য তাঁর গুরুদেবের সাথে শাসন করতেন। তাঁর গুরুদেব তাঁকে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রদান করেন। গুরুদেবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ও ভালোবাসাস্বরূপ কৃষ্ণদেবরায় শ্রী বিট্‌ঠল (কৃষ্ণ)-রুক্মিণী বিগ্রহ তৈরী করেন এবং বিট্‌ঠল-রুক্মিণী মন্দিরে তা প্রতিষ্ঠা করেন যা আজও বর্তমান।

দুর্ভাগ্যবশত রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের দেহত্যাগের কিছুদিন পর মন্দিরটি মুঘল আক্রমণকারীদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুঘলরা প্রায় দুইশতকব্যাপী এ শক্তিশালী বৈষ্ণব রাজ্যটি অধিকার করতে চেষ্টা করেছিল। তবে এ রাজ্যের পতন মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নয় বরং একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্রাহ্মণের অভিশাপ থেকে হয়েছিল। একদা মুজাহিদের নেতৃত্বে মুসলিম আক্রমণকারীরা নগরের বহির্ভাগে প্রবেশ করে চতুর্দিক থেকে বিক্ষিপ্তভাবে সেখানে বসবাসকারী অনেক ব্রাহ্মণকে হত্যা করে (এ স্থানটি রামায়ণে বর্ণিত প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা বন এবং বায়ুদেবের পুত্র হনুমানের জন্মস্থান। সেখানে একটি একক স্ফটিক/প্রস্তর থেকে তৈরী করা হনুমানের বিগ্রহ রয়েছে)। আক্রমণকারী সুলতান পূজারীদের হত্যা করে হনুমানজীর মুখে আঘাত করে। একজন মৃত্যুপথযাত্রী পূজারীকে বলতে শোনা যায়– "এ কর্মের জন্য তোমার বিনাশ হবে এবং এ নগর তার ঐশ্বর্য তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবে। তুমি তোমার জীবনের সমাপ্তি ডেকে এনেছ।" এই বলে তিনি এ ধরাধাম ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর সুলতানও মৃত্যুবরণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত হনুমান বিগ্রহটি আজও বর্তমান।

প্রাচীন বিজয়নগর বর্তমানে হাম্পি নামে পরিচিত, যা হসপেট থেকে খানিকটা বাসের পথ। তা উত্তর কর্ণাটকের প্রধান রেলওয়েতে অবস্থিত।

বেদান্তের ওপর ব্যাসতীর্থের অসামান্য রচনা 'ন্যায়ামৃত'-কে অনেক সময় ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের সাথে তুলনা করা হয়, কারণ তা মায়াবাদীদের বিপক্ষে ব্যবহৃত সুদর্শন চক্রের মতো একটি অব্যর্থ ও ভয়ানক অস্ত্র, যা অতলস্পর্শ গভীর ভক্তিভাব ও বিচার স্বীকার করতে তাদের (মায়াবাদীদের) বাধ্য করে। ন্যায়ামৃতের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সংস্কৃত স্কুলের মধুসূদন সরস্বতী নামে একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী 'অদ্বৈত সিদ্ধি' রচনা করেন, কিন্তু তা এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়।

মাধ্ব সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ রামচন্দ্র তীর্থ তাঁর 'তরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে অদ্বৈত সিদ্ধি-তে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ খণ্ডন করেন। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা 'তরঙ্গিনী'-তে উত্থাপিত প্রশ্নের ব্রহ্মানন্দীয় প্রত্যুত্তর উত্থাপন করেন। মাধ্বরা তাঁদের চিরায়ত শত্রুদের মুখ বন্ধ করতে 'বামমালমাশ্রিয়' রচনা করেন।

একবার উড়িষ্যার এক গজপতি রাজা কৃষ্ণদেব রায়-এর চেতনা আচ্ছন্ন করার জন্য মায়াবাদ দর্শনের কিছু যুক্তি প্রেরণ করে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর গুরুদেব শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থের নির্দেশনা এবং শক্তিতে তিনি যথারীতি বিজয়ী হন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, কৃষ্ণদেব রায় শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থকে ১৫২৬ সালে বেট্টাকোন্ডা নামে একটি গ্রাম প্রদান করেন এবং তাঁর গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্যাসসমুদ্র নামে একটি হ্রদ খনন করেন। প্রচলিত আছে যে, কৃষ্ণদেব রায় চরণাভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁর গুরু ব্যাসতীর্থকে রত্নে অভিষিক্ত করেছিলেন। সাধারণত কোনো ব্যক্তির অভিষেক পরিচালনায় ঘি, দুগ্ধ, দধি, মধু, চিনির জল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এগুলোর সাথে তিনি রত্ন দ্বারাও অভিষেক করেছিলেন।

বিজয়নগর রাজবংশের রাজাদের মধ্যে শ্রী কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে সবচেয়ে উন্নত। তিনি ব্যাসতীর্থের আনুগত্যে এ অঞ্চলে অনেক সুন্দর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে লক্ষ্মীনৃসিংহ বিগ্রহ আজও বর্তমান। এ বিগ্রহটি কৃষ্ণদেব রায়-এর নির্দেশনায় একটি মাত্র পাথর থেকে খোদাই করা হয়েছিল। তাঁর অন্তর্ধানের পর অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেক মন্দির ধ্বংস করে ফেলে। বিট্ঠল-রুক্মিণী এবং কৃষ্ণস্বামীর মতো অনেক বিগ্রহকে দক্ষিণে সরিয়ে ফেলা হয়। মুসলিমরা নৃসিংহদেবের বিগ্রহটি ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। এই প্রাচীন ও পবিত্র স্থানটিও রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের জন্মস্থান কিষ্কিন্ধ্যা বনের অন্তর্গত, যেখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বালিকে হত্যা করে সুগ্রীবকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সে সময়ের অনেক ধ্বংসাবশেষ সৌভাগ্যবান দর্শনার্থীদের জন্য আজও বিরাজ করছে।

শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ ছিলেন অত্যন্ত আলোচিত ও শক্তিশালী প্রচারক, মধ্ব-সম্প্রদায়ের তৃতীয় চন্দ্র স্বরূপ এবং সর্বদা 'হরিনাম সংকীর্তনে' মগ্ন। তাঁর শিক্ষাগুরু শ্রীপাদরাজ তীর্থ স্বামীর আশীর্বাদে তাঁর মহিমা সর্বত্র কীর্তিত হয়। অনেকের মতে, তিনি হলেন 'হরিদাস' বা 'দশকুটা' আন্দোলনের অনুপ্রেরণা দাতা। যাইহোক, শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ৭৩২টি হনুমান ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও রামায়ণের আলোকে অসংখ্য কাব্য ও গীত রচনা করেন।

একদিন বিশ্রাম গ্রহণের সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বলেন– "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার কোনো স্ত্রী বা সন্তানাদি নেই। কিন্তু আমি বিবাহিত, আমার বড় পরিবারও রয়েছে, তাহলে কেন তুমি আমাকে শুধু কৃষ্ণ বলে ডাক?"। ঐ দিনের পর থেকে শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ তাঁর যেকোনো রচনায় তাঁর প্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করতেন।

কৃষকের প্রতি করুণা

একবার তিনি বেদান্ত পীঠে তাঁর অগণিত শিষ্যদের মাঝে উপবেশনরত ছিলেন। হঠাৎ এক নিম্নবর্ণজাত কৃষক সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মাঝে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত দীনভাবে তাঁর কাছে মন্ত্র দীক্ষা প্রার্থনা করে। উপস্থিত ভক্তদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ বংশজাত। তারা কৃষকটিকে তার বংশ এবং শিক্ষার জন্য; বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বংশজাত না হওয়ায় অযোগ্য বলে মত পোষণ করছিল। তবে ব্যাসতীর্থ জন্ম, বংশ আদি দেহগত ধারণা থেকে মুক্ত ও শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় তাঁর মনোভাব ছিল ভিন্ন। সকলকে বিস্মিত করে শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ কৃষকটিকে যমরাজের ষাঁড়ের নাম জপ করতে বললেন। সেখান থেকে চলে গিয়ে সে কিছুসময় জপ করে ফিরে আসে। তার কণ্ঠস্বর শুনে ভক্তরা সকলে বাইরে এলেন এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে যমরাজের পর্বতসম ষাঁড়টিকে মঠের দ্বারের সম্মুখে দেখতে পেলেন। কৃষকটি ব্যাসতীর্থকে জিজ্ঞেস করল– "এখন আমি কী করব স্বামীজি?" তখন ব্যাসতীর্থ তাকে ষাঁড়টিকে নিয়ে নদীর কাছে যেতে বললেন যেখানে একটি বড় পাথর রয়েছে। কৃষকটি নদীর কাছে গিয়ে ষাঁড়টিকে অনুরোধ করে বলল যে, সে যেন নদীর প্রধান জলস্রোত থেকে বড় পাথরটি সরিয়ে নেয়, যাতে চাষাবাদের জন্য শস্য ক্ষেতে জল প্রবাহিত হতে পারে। পাথরটি ছিল নদীতে দ্বীপ সদৃশ, তা সত্ত্বেও ষাঁড়টি তার পা এটির উপর রেখে একে দৃষ্টি সীমার বাইরে নিমগ্ন করল। সকলের হৃদয় আন্দোলিত করে আবার জল প্রবাহিত হতে শুরু করল। এ ঘটনার পর ষাঁড়টি তার প্রভু যমরাজের কাছে ফিরে গেল। কৃষকটি তখন ব্যাসতীর্থের কাছে ফিরে গিয়ে অন্য সেবা প্রার্থনা করল। তিনি তখন কৃষকটিকে মঠের গোশালায় নিযুক্ত করলেন।

কিছুদিন পর শ্রীবিগ্রহগণের জন্য একটি বার্ষিক মহোৎসবের আয়োজন করা হলো। অনুষ্ঠানের প্রধান পর্বটি ছিল গাভী থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা বিগ্রহের অভিষেক। কিন্তু অভিষেক শুরু হতে যাচ্ছে ঠিক এরকম মুহূর্তে 'উডুপি কৃষ্ণ বিগ্রহ' সমবেত ভক্তদের চক্ষুর অন্তরাল হলেন। ব্যাসতীর্থ ব্যতীত সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি সকলকে এর যথার্থ কারণ উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। কিছুসময় আলোচনা পর্যালোচনার পর ভক্তরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, একজন নিম্ন বর্ণের কৃষককে গাভী দেখাশোনা এবং দুধ, দই, ঘি ইত্যাদি দ্রব্য পূজার জন্য সংগ্রহ করতে নিযুক্ত করায় ভগবান দৃষ্টির অগোচর হয়েছেন।

পরোক্ষভাবে তারা তাদের গুরুকেই অপরাধী বলে দোষারোপ করছিল, কেননা তারা তখনও দেহগত চেতনায় অধিষ্ঠিত থেকে নিজেদের ব্রাহ্মণ এবং কৃষকটিকে একজন সাধারণ বৈশ্য বলে চিন্তা করছিল। শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে মাথা নাড়িয়ে সকল ভক্তকে সেই বিগ্রহ খুঁজতে বললেন। ব্যাসতীর্থকে সম্মুখে রেখে উৎসবে আগত ভক্তগণ গোশালায় গেলেন। তাঁরা গোশালায় গিয়ে দেখলেন কৃষকটি গাভীদের শরীর মাজনী দিয়ে পরিষ্কার করছে। সে এক হাতে মাজনী এবং অন্য হাতে জলের বালতি নিয়ে গোপাল কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছিল। ভগবানের গাভীদের সেবা সম্পাদনে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হওয়ায় 'উডুপি কৃষ্ণ বিগ্রহ'-টি যে তাঁর মূল গোপাল স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে তার

পাশে আরেকটি বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তা-ও সে লক্ষ্য করেনি।

উড়ুপি কৃষ্ণ স্বয়ং এই অ-ব্রাহ্মণ কৃষকের সেবা করছে দেখে সমস্ত শিষ্য অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যাসতীর্থ ব্যাখ্যা করে বললেন– "কৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সেবা করতে এসেছে। পূর্বে তিনি মধ্বাচার্যকে মহিমান্বিত করতে এসেছিলেন, আর এবার তিনি আরো একজন মহাত্মাকে পেয়েছেন।" ব্যাসতীর্থ পরবর্তীতে এই কৃষককে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ ফাল্গুন মাসের চতুর্থী তিথিতে, ১৫৩৯ সালের ৮ মার্চ শনিবার এ ধরাধাম থেকে অপ্রকট হন। তাঁর সমাধি মন্দির হাম্পির এনেগন্ডি থেকে আধা কিলোমিটার দূরে তুঙ্গভদ্রা নদীর পাশে নববৃন্দাবন দ্বীপে অবস্থিত। ব্যাসতীর্থকে অনেকে মধ্বাচার্যের প্রবর্তিত ধারার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মনে করেন। তিনি বহু লোককে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্য এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উত্তরে ভ্রমণ করে মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র এবং এমনকি রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশেও তাঁর মহিমা প্রচার করেছিল।

গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় কবি কর্ণপুরের মতে, শ্রীপাদ ব্যাসতীর্থ বিখ্যাত 'শ্রীবিষ্ণুসংহিতা' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন এবং তাঁর 'শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ' নামে উত্তর ভারতের এক শিষ্য ছিলেন। সেখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জয়ধর্মের আরেকজন শিষ্য ছিলেন 'ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম'। অনেকের মতে, ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম হলো ব্রহ্মণ্যতীর্থের আরেক নাম, যিনি ছিলেন জয়ধর্মের শিষ্য এবং ব্যাস তীর্থ যাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্বাচার্যের অনুসারীরা ব্যাসতীর্থকে মধ্ব-দর্শনের তৃতীয় চন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।
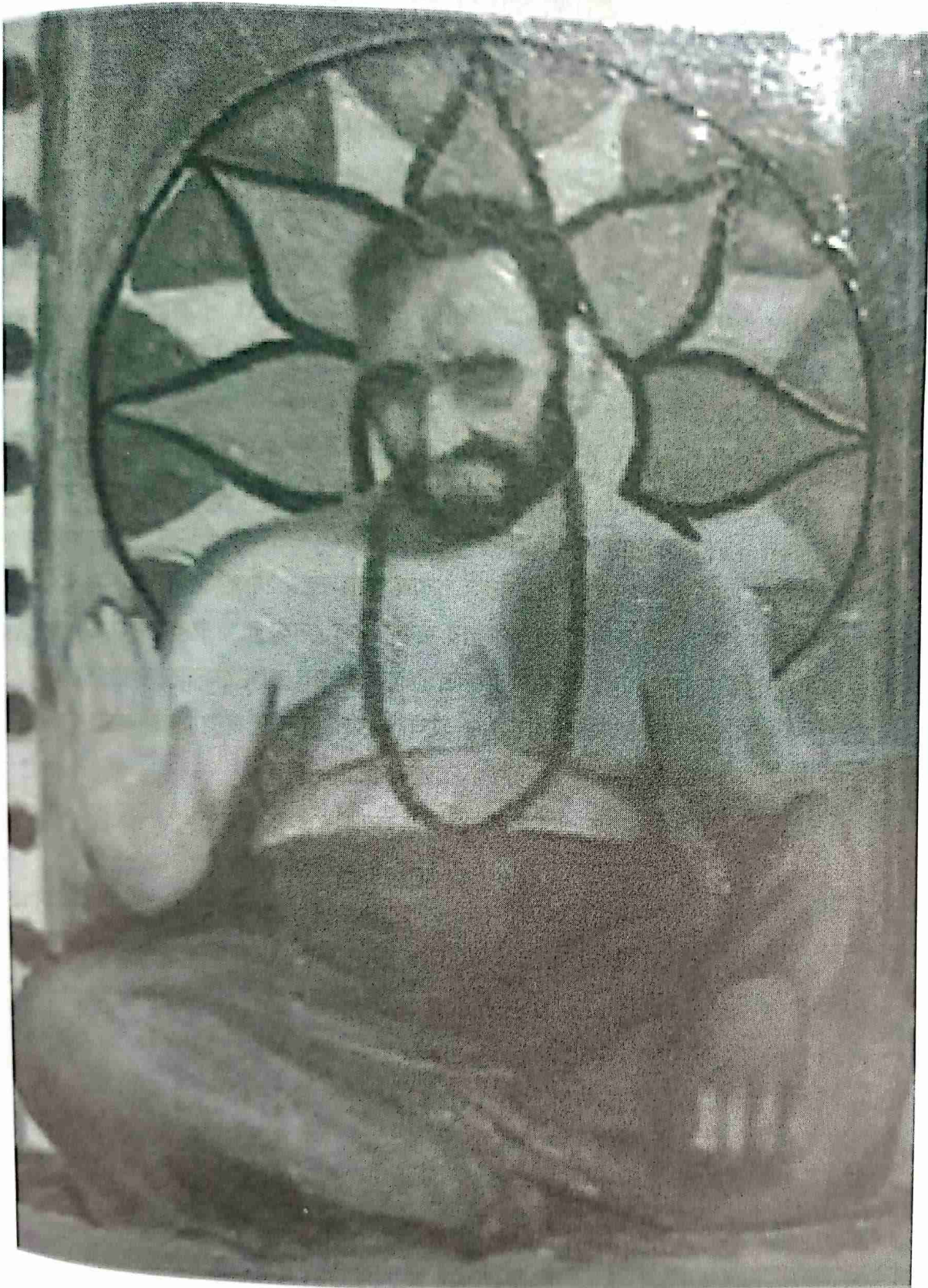
শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ

শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ

সন্ন্যাসী শিরোমণি লক্ষ্মীপতি তীর্থ একবার এক নির্জন স্থানে বসে সারা রাত ধরে ভগবান বলরামের গুণমহিমা কীর্তন করছিলেন। তাঁর শুদ্ধভক্তি এত আকুলতা প্রযুক্ত ছিল যে, তিনি মাঝে মধ্যেই চিৎকার করে ডেকে উঠতেন– "হে বলদেব, অনুগ্রহ করে আমাকে করুণা করো। আমি কত পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত!" প্রভুকে দর্শনের তীব্র বাসনায় তাঁর চোখ থেকে অশ্রুপাত হতো এবং তিনি তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন এবং নিজেকে ভুলে যেতেন। তিনি কখনো মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তেন। সেদিন গভীর বিরহে কাঁদতে কাঁদতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর স্বভাবসুলভ চপলতায় স্বীয় মূলস্বরূপ বলরামরূপে লক্ষ্মীপতি তীর্থের সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলেন "একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ অবধূত বেশে নগরে এসেছেন, তিনি তোমার কাছে আসবেন। তাঁকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দান করবে এবং তোমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করবে।" তারপর ভগবান বলদেব লক্ষ্মীপতির দক্ষিণ কর্ণে একটি মন্ত্র বললে তিনি জেগে উঠেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্মীপতি সেই ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। সুন্দর দেহাবয়ব, চন্দ্রবদন এবং অনিমেষ নেত্র থেকে তিনি চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। তাঁর বচনে লক্ষ্মীপতির চোখ অশ্রুধারায় পূর্ণ হলো। সেই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীই নিত্যানন্দ প্রভু। লক্ষ্মীপতি তীর্থ সেদিনই বলদেবের আদেশ পালন করেছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু বন্দে শ্রীমদ্ লক্ষ্মীপতি প্রিয়ম্।
শ্রী মধ্ব-সম্প্রদায় বর্ধনম্ ভক্ত বৎসলম্ ॥

"লক্ষ্মীপতি তীর্থের অতি প্রিয় নিত্যানন্দ প্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই, যিনি সমগ্র মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনন্দ বর্ধন করেছেন এবং যিনি তাঁর ভক্তদের জীবনস্বরূপ।"

নিত্যানন্দ প্রভুর সমীপবর্তী হয়ে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ যে দিব্য আনন্দ অনুভব করেছিলেন তা বর্ণনাতীত। নিত্যানন্দ প্রভু চলে গেলে তীব্র বিরহে তিনি শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি ক্ষণিকের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে প্রভু তাঁর স্বপ্নে আবির্ভূত হন। তাঁর গায়ের বর্ণ ছিল শুভ্র এবং তিনি নীল ধুতি পরিহিত ছিলেন। তা লক্ষ্মীপতি তীর্থকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল এবং তিনি তাঁর প্রেমপূর্ণ নয়নবারিতে প্রভুর চরণ ধৌত করেছিলেন। তিনি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে বলেছিলেন– "তুমি নিশ্চিতরূপে আমাকে বোকা বানিয়েছ এবং এই পতিতকে আরো শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছ। অনুগ্রহ করে তোমার করুণা প্রদর্শন করো। আমি তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করলাম।"

বলরাম-অভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মীপতির সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। যখন লক্ষ্মীপতি তীর্থ নিত্যানন্দ প্রভুর অদর্শনে বিলাপ করতে করতে জেগে ওঠেন, তখন রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে সকাল হয়েছিল। সেদিন থেকে লক্ষ্মীপতি তীর্থের মধ্যে সমূহ পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি আর কখনো কথা বলেননি। কিছুকাল পর কোনো প্রকার ইঙ্গিত না দিয়ে

লক্ষ্মীপতি তীর্থ এ ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন। ভগবান ও তাঁর ভক্তের চরিত্র ও অপ্রাকৃত লীলা কে বুঝতে পারে? তাঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান নিজেই তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ কেউ লক্ষ্মীপতিকে নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু মনে করেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য লীলা ৩/৫ তাৎপর্য) শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন– "খড়দহে কিছু লোক নিত্যানন্দ প্রভুকে শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করে ভুল করে, যাদের দর্শন হলো, '*অন্ত শাক্ত বহির শৈব বৈষ্ণব মতঃ*'। শাক্ত সম্প্রদায় অনুসারে কৌল-অবধূত, যিনি অভ্যন্তরীণভাবে জড়জাগতিক ভাবনায় মগ্ন, কিন্তু বাহ্যিকভাবে যাচক ভগবান শিবের একজন মহান ভক্ত বলে মনে হয়। এ ধরনের ব্যক্তি যখন কোনো বৈষ্ণব সমাবেশে যায় তখন তাঁকে বৈষ্ণব বলে মনে হয়। নিত্যানন্দ প্রভু কখনোই এ ধরনের সম্প্রদায়ভুক্ত নন। তিনি সর্বদাই বৈদিক ধারায় একজন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর ন্যায় ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন 'পরমহংস'। কখনো তাঁকে লক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য হিসেবে মনে করা হয়। যদি একে সঠিক বলে ধারণা করা হয়, তাহলে নিত্যানন্দ প্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি বাংলার তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত নন।" কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলা ৮/১২৮-এর তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু মাধবেন্দ্রপুরী নামে একজন সন্ন্যাসী কর্তৃক দীক্ষা লাভ করেন। কিন্তু অন্য অনেকের মতে তিনি লক্ষ্মীপতি তীর্থ কর্তৃক দীক্ষা লাভ করেন।"
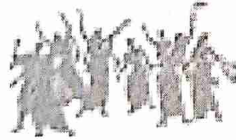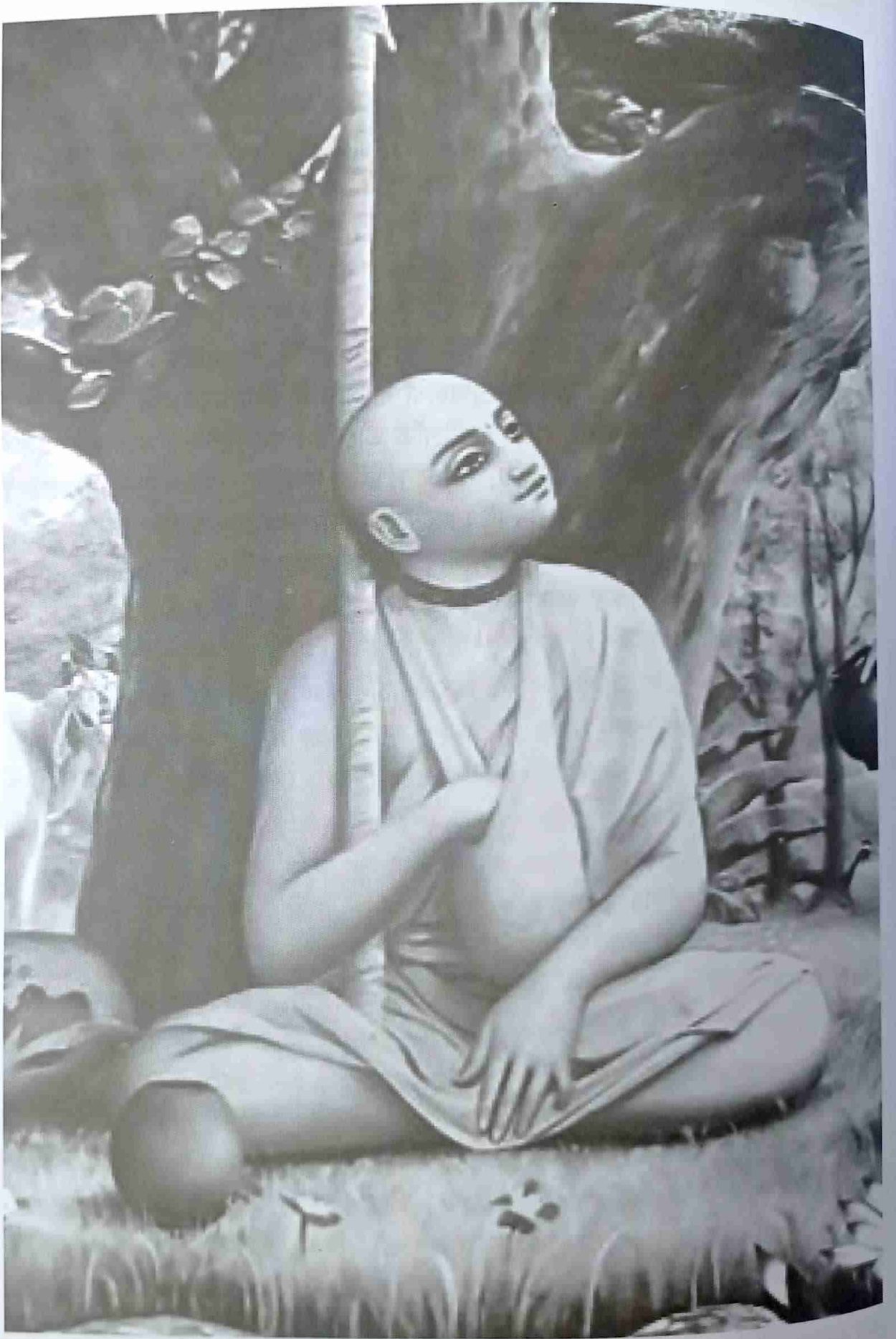
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী

পরিচয়

পরমেশ্বর ভগবান যখন এ জগতে নররূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, গুরুরূপে লীলা করার জন্য তাঁর পার্ষদগণকেও প্রেরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীল ঈশ্বরপুরী, মাতা শচীদেবী, পিতা শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র এবং শ্রীল অদ্বৈত আচার্য আদি ভগবত পার্ষদবৃন্দ আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ লিখিত আছে–

কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার। অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥
আগে অবতারিলা যে যে গুরু-পরিবার। সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥
শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী। কেশব ভারতী, আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥
অদ্বৈত আচার্য আর, পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র-নাম। বৈষ্ণব পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ-প্রধান ॥

–চৈ.চ. আদি ১৩/৫২-৫৬

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য। তিনি ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রী মাধ্ব-পরম্পরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাখার কথা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', 'প্রমেয় রত্নাবলী' ও গোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৬/৪২, তাৎপর্য) শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন– "শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দুজন প্রধান শিষ্য হচ্ছেন– শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এ সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্ব গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও প্রমেয়-রত্নাবলী আদি প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। গোপাল গুরু গোস্বামীও তা স্বীকার করেছেন। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (শ্লোক-২২) স্পষ্টভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরম্পরার ধারা বর্ণনা করে বলা হয়েছে– "ব্রহ্মা হচ্ছেন পরব্যোমনাথ বিষ্ণুর শিষ্য। তাঁর শিষ্য হচ্ছেন নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব এবং ব্যাসদেবের শিষ্য শুকদেব গোস্বামী ও মধ্বাচার্য। পদ্মনাভ তীর্থ মধ্বাচার্যের শিষ্য এবং নরহরি পদ্মনাভ তীর্থের শিষ্য। মাধব হচ্ছেন নরহরির শিষ্য, অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্য এবং জয়তীর্থ অক্ষোভ্যের শিষ্য। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং তাঁর শিষ্য দয়ানিধি। দয়ানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি এবং রাজেন্দ্র বিদ্যানিধির শিষ্য। জয়ধর্ম রাজেন্দ্রের শিষ্য। পুরুষোত্তম জয়ধর্মের শিষ্য। লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন ব্যাসতীর্থের শিষ্য, ব্যাসতীর্থ পুরুষোত্তমের শিষ্য। আর মাধবেন্দ্রপুরী হচ্ছেন লক্ষ্মীপতির শিষ্য।" শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈতাচার্য, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, রঙ্গ পুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রঘুপতি উপাধ্যায় প্রমুখ (শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী)। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন–

"শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর প্রশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে এর পূর্বে প্রেমভক্তির কোনো লক্ষণ ছিল না। মাধবেন্দ্রপুরী রচিত 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষা বীজরূপে ছিল।"

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥

–চৈ.চ. আদি ৯/১০

"শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়-সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। এর পূর্বে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে 'শৃঙ্গার রসাত্মিকা' ভক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যেত না।"

–শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।

নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ

তীর্থভ্রমণকালে পশ্চিম ভারতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সাথে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ে প্রেমানন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। শ্রীচৈতন্যভাগবত (আদি ৯ম অধ্যায়)-এ বর্ণিত আছে–

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ। দৈবে মাধবেন্দ্রসহ হৈল দরশন ॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়–কলেবর। প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার। মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥
যাঁর শিষ্য প্রভু আচার্য গোসাই। কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥
মাধব পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইলা নিস্পন্দ।
নিত্যানন্দে দেখি মাত্র শ্রীমাধব পুরী। পড়িলা মূর্ছিত হই আপনা পাসরি ॥
ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার। গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলেন– "তীর্থ অনেক দর্শন করেছি, কিন্তু আজ মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে দর্শন করে কৃতার্থ হলাম। তীর্থদর্শনের সম্যক ফল লাভ করলাম। এমন প্রেমবিকার কোথাও দেখিনি।" শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ প্রভুকে কোলে করে প্রেমাশ্রুধারায় সিক্ত করেছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণনে প্রমত্ত হয়ে উঠলেন–

মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি কোলে। উত্তর না স্ফুরে– কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে ॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী। বক্ষ হইতে নিত্যানন্দে বাহির না করি ॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥
নিত্যানন্দে যাঁহার তিলেক দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥

–*শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি, অধ্যায়-৯*

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের মহিমা এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যে মাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুবুদ্ধি করতেন, তা স্পষ্টভাবে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও বর্ণনা করা হয়েছে–

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি রসময়। যাঁর নামস্মরণে সকল সিদ্ধি হয়।
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী–আদি যত। মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত।
গৌড় উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ। সবে কৃষ্ণভক্ত, প্রেমভক্তিপরায়ণ ॥

–*ভক্তিরত্নাকর, ৫/২২৭২-৭৪*

কতোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে। দেখা হইল প্রতীচী-তীর্থের সমীপেতে ॥
যে প্রেম প্রকাশ হইল দোঁহার মিলনে। তাহা কে বর্ণিবে? – যে দেখিল সেই জানে ॥
নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি ॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥

–ভক্তিরত্নাকর ৫/২৩৩০-৩৪

গোপাল বিগ্রহের স্বপ্নাদেশ

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে এসেছিলেন। সেখান থেকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রাকালে ছত্রভোগের পথে গঙ্গার তীরবর্তী আটিসার, পানিহাটি, বরাহনগর হয়ে চলতে চলতে তিনি বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর উৎকলরাজ্যের এক সীমায় এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর। এরপর তিনি বালেশ্বর রেমুণায় শুভ পদার্পণ করলেন। সেখানে 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' দর্শন করে তিনি প্রেমাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি শ্রী ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন তা এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথ-এর নামকরণ সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করতে লাগলেন–

প্রভু কহে– নিত্যানন্দ, করহ বিচার। পুরী-সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল। তিনবারে স্বপ্নে আসি, যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥
যাঁর প্রেমে বশ হৈয়া প্রকট হইলা। সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি। অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' হরি ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/১৭১-১৭৪

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ও বিভাবিতচিত্ত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ একদিন গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করেন। তারপর সন্ধ্যা বেলায় তিনি একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। তখন এক গোপবালক একটি দুধের ভাণ্ড হাতে মাধবেন্দ্রপুরীর সামনে মৃদু হেসে তাঁকে বললেন– "দয়া করে এ দুধটুকু গ্রহণ করো। তুমি ক্ষুধার্ত হলেও কেন কারো কাছে খাবার চাও না? তুমি সবসময় কার ধ্যান করো?" সেই বালকের সৌন্দর্য দর্শন করে মাধবেন্দ্রপুরী অত্যন্ত প্রীত হলেন। তার মধুর বাক্য শ্রবণ করে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন। মাধবেন্দ্রপুরী তাকে জিজ্ঞেস করলেন– "তুমি কে? কোথায় থাকো? আর তুমি কীভাবে জানলে যে আমি উপবাস করি?" বালকটি তখন উত্তর দিল– "আমি গোপবালক, এ গ্রামেই আমার বাস। আমাদের এ গ্রামে কেউ উপবাসী থাকে না। কেউ অন্ন ভিক্ষা করে খায়, কেউ আবার শুধু দুগ্ধ আহার করে; আর কেউ যদি অন্ন আদি ভিক্ষাও না করে এবং না খায়, তাহলে আমি তাদের আহার্য বস্তু সরবরাহ করি। জল নিতে যেসকল স্ত্রীলোকেরা এসেছিলেন, তাঁরা তোমাকে দেখে গিয়েছেন এবং তাঁরাই আমাকে তোমার জন্য এ দুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন।" বালকটি আরো বলল– "শীঘ্রই আমাকে গোদোহন করতে যেতে হবে, তবে আমি আবার ফিরে এসে ভাণ্ডটি নিয়ে যাব।" এই বলে বালকটি সেখান থেকে

চলে গেল। মাধবেন্দ্রপুরীর চিত্ত এক অপূর্ব অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। দুধটুকু পান করে মাধবেন্দ্রপুরী ভাণ্ডটি ধুয়ে সেই বালকটির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু বালকটি আর ফিরে এলো না। মাধবেন্দ্রপুরী ঘুমোতে পারলেন না। বসে বসে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করতে লাগলেন। শেষ রাতে একটু তন্দ্রা এলে স্বপ্নে দেখলেন যে, সেই বালকটি সামনে এসে তাঁর হাত ধরে তাঁকে একটি কুঞ্জে নিয়ে গেল। কুঞ্জটি দেখিয়ে বালকটি বলল- "আমি এই কুঞ্জে থাকি এবং সেজন্য প্রচণ্ড শীত, বৃষ্টি, ঝড় এবং তাপে আমি বড় কষ্ট পাই। গ্রামের লোকদের নিয়ে এসে, তাদের সাহায্যে আমাকে এ কুঞ্জ থেকে নিয়ে যাও। তারপর ভালোভাবে ঐ পর্বতের উপর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আমাকে স্থাপন করো। তারপর প্রচুর পরিমাণে শীতল জল দিয়ে আমার শ্রীঅঙ্গ মার্জন করো।"

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/৩৯-৪০

"আমার নাম গোবর্ধনধারী গোপাল, বজ্রনাভ (শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও অনিরুদ্ধের পুত্র) আমার এ শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেছে। আমার সেবক আমাকে কুঞ্জে রেখে ম্লেচ্ছ ভয়ে পালিয়ে গেছে, তখন থেকে আমি এখানেই আছি। তুমি এসেছো ভালো হয়েছে, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।" মাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হলে, তিনি "শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে এসেছিলেন, হায়! তাঁকে চিনতে পারলাম না" –এই বলে প্রেমাবিষ্ট হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর গোপালের আদেশ পালনের জন্য কিছুক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে স্থির হলেন। প্রাতঃস্নানের পর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ গ্রামের সবলোক একত্র করে বললেন- "তোমাদের গ্রামের ঠাকুর গোবর্ধনধারী গোপাল কুঞ্জমধ্যে আছে। কুঠার, কোদাল সব নিয়ে এসো। কুঞ্জ কেটে তাঁকে বের করতে হবে।" গ্রামের লোকজন মহা আনন্দে কুঞ্জ কেটে দেখল মাটি-তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত মহাভারী এক গোপাল ঠাকুর। মহা মহা বলিষ্ঠ লোকসকল ঠাকুরকে পর্বতের উপর তুলে পাথরের সিংহাসনে স্থাপন করলেন এবং একটি বড় পাথর অবলম্বন রূপে বিগ্রহের পেছনে দেয়া হলো। শ্রীমূর্তির মহাভিষেকের জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণগণ গোবিন্দকুণ্ডের জল ছেঁকে একশত নতুন ঘটে পূর্ণ করে উপনীত হলেন। বিচিত্র বাদ্য বাজতে লাগল, নৃত্যগীত শুরু হলো। দুধ, দই, ঘি, সন্দেশাদি ভোগসামগ্রী, নানা উপহার ও পূজার উপকরণে পর্বত পরিপূর্ণ হলো। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী স্বয়ং মহাভিষেক কার্য সম্পন্ন করলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি সমস্ত অমঙ্গল দূর করলেন এবং তারপর সেই শ্রীবিগ্রহ স্নান করাতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি প্রচুর পরিমাণে তেল দিয়ে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ মর্দন করলেন এবং তার ফলে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর শতঘটের দ্বারা মহাস্নান করালেন। মহাস্নানশেষে শ্রীঅঙ্গ পরিষ্কার করে বস্ত্র পরালেন এবং শ্রীঅঙ্গে চন্দন, তুলসী ও পুষ্পমালা নিবেদন করলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে গোপগণ গিরিরাজ গোবর্ধনের যেভাবে অন্নকূট উৎসব করেছিলেন, ঠিক সেভাবে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কলিযুগে গোবর্ধনধারী গোপালের অন্নকূট উৎসব করলেন। নিবেদিত সকল অন্ন-ব্যঞ্জন, পিঠা-পায়েসাদি সবকিছুই গোপাল গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর

হাতের স্পর্শে পাত্রসমূহ আবার পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু তা কেবল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অনুভব করলেন।

বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্নব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/৭৬-৭৭

তারপর আচমন ও তাম্বুল নিবেদন শেষে গোপালের আরতি করলেন এবং নতুন খাট এনে শয়নের ব্যবস্থা করলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ অন্নকূট মহোৎসবে প্রথমে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণকে, তারপর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গ্রামের সকলকেই প্রসাদ দিলেন। গোপাল প্রকট হয়েছেন– এ খবর সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল, একেক গ্রামের ব্রজবাসীগণ একেক দিন উৎসব করতে লাগলেন।

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/৯৫

গোপীনাথ কর্তৃক ক্ষীরচুরি

ধনী ব্যক্তিরা গোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, গোপালের দশসহস্র গাভী হলো। দুবছর যাবৎ গোপালের সেবা এভাবে চলতে থাকলে একদিন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ স্বপ্নে দেখলেন যে, গোপাল তাঁকে বলছেন তাঁর শরীরের তাপ দূর হয়নি, মলয়জ চন্দনের দ্বারা শরীর লেপন করলে তাপ দূর হবে। প্রভুর নির্দেশ পেয়ে পুরীপাদ প্রেমাবিষ্ট হলেন, গোপালের সেবায় উপযুক্ত সেবক নিযুক্ত করে মলয়জ চন্দন সংগ্রহের জন্য পূর্বদেশে যাত্রা করলেন। (মলয়জ মলয় গিরিপুঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত। নীলগিরিকে কেউ কেউ মলয় পর্বত বলেন। মলয়জ–শব্দে চন্দনকেও বোঝায়।) শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গৌড়দেশে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে এলেন এবং সেখানে অদ্বৈতাচার্যকে দীক্ষা দিয়ে রেমুণাতে এসে উপনীত হয়ে অনেকক্ষণ ধরে নৃত্য-কীর্তন করলেন। গোপীনাথের ভোগের আয়োজন দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। সেখানে কী কী ভোগ লাগে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন। ব্রাহ্মণ তার উত্তরে বললেন –

সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর– 'অমৃতকেলি' নাম। দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি 'অমৃত-সমান' ॥
'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি প্রসিদ্ধ নাম যার। পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/১১৭-১১৮

ঠিক সে সময় 'অমৃতকেলি' ভোগ গোপীনাথকে নিবেদন করা হলো। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তখন মনে মনে বিচার করলেন– "যদি অযাচিত ক্ষীর পাই, তাহলে তার স্বাদ জেনে গোপালকে তেমন ক্ষীর ভোগ দেব"। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিলেন– "আমার ক্ষীর খাবার ইচ্ছা হলো"? তারপর তিনি ঠাকুরের আরতি দর্শন ও প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে গ্রামের শূন্য হাটে বসে হরিনাম করতে লাগলেন। মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অযাচক,

ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধরহিত, সর্বদা প্রেমামৃত পানে তৃপ্ত। এদিকে পূজারী তাঁর সেবা শেষ করে ঘুমাতে গেলে ঠাকুর স্বপ্নে তাঁকে বললেন-

উঠহ পূজারী, কর দ্বার বিমোচন। ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়। তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥
মাধবপুরী-সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া। তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লইয়া ॥

-চৈ.চ. মধ্য ৪/১২৭-১২৯

স্বপ্ন দেখে পূজারী আশ্চর্যান্বিত হয়ে উঠলেন। স্নানশেষে দরজা খুলে দেখলেন, গোপীনাথের ধুতির আড়ালে একপাত্র ক্ষীর রয়েছে। সেই ক্ষীর নিয়ে মাধব পুরীর খোঁজে পূজারী হাটে হাটে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং তাঁকে এই বলে আহ্বান করতে লাগলেন-

ক্ষীর লহ এই, যাঁর নাম মাধবপুরী। তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥
ক্ষীর লইয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥

-চৈ.চ. মধ্য ৪/১৩৩-১৩৪

এ কথা শুনে মাধবেন্দ্রপুরী নিজের পরিচয় দিলেন। পূজারী তাঁকে ক্ষীর দিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। পূজারী তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা মাধবেন্দ্রপুরীকে বললেন। পূজারীর কথা শুনে তিনি প্রেমাবিষ্ট হলেন। প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি সেই ক্ষীর প্রসাদ আস্বাদন করলেন। তারপর মাটির পাত্রটি ধৌত করে তা টুকরো টুকরো করে বহির্বাসে বেঁধে নিলেন। তিনি প্রতিদিন একটি করে মাটির টুকরো গ্রহণ করে প্রেমাবিষ্ট হতেন। সকাল হলে জানাজানি হবে, লোকের ভিড় হবে, গোপীনাথের একান্তজন বলে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে- এই প্রতিষ্ঠা ভয়ে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী রাতশেষে সে স্থানেই গোপীনাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন। নীলাচলে এসে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করে প্রেমে বিহ্বল হলেন। পুরীধামে পৌঁছানোর পূর্বেই তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হলো, অগণিত লোক এসে তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে লাগল।

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া। কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া ॥

গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন

প্রতিষ্ঠার ভয়ে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর লুকিয়ে থাকার ইচ্ছা হলেও "গোপালের জন্য চন্দন নিতে হবে" -এই বন্ধন থাকায় সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে ও ভক্তমহান্তগণকে গোপালের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করে দিতে প্রার্থনা জানালেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের রাজপুরুষদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাঁদের মাধ্যমে মলয়জ চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করলেন। চন্দন বহন করে যাবার জন্য ভক্তগণ একজন বিপ্র ও একজন সেবককে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সঙ্গে দিলেন

এবং রাস্তায় যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য রাজসরকারের ছাড়পত্রও সঙ্গে দিলেন। পুরীপাদ চন্দন নিয়ে ফিরে যাবার পথে পুনরায় রেমুণায় এসে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সামনে অনেকক্ষণ নৃত্যগীত সুখে প্রেমাবিষ্ট থেকে পূজারী প্রদত্ত ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন। সেদিন রাতে দেবালয়ে শয়ন করলেন এবং পুনরায় গোপালের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হলেন।

গোপাল আসিয়া কহে– "শুন হে মাধব। কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥
কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন। গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়। ইঁহাকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয় ॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে। বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/১৫৮-১৬১

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ স্বপ্নাদেশ পেয়ে গোপীনাথের সেবকগণকে ডাকলেন এবং গোপালের স্বপ্নাদেশের কথা জানালেন। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ চন্দন পরবেন শুনে গোপীনাথের সেবকগণের বড় আনন্দ হলো। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর দুই সঙ্গীকে চন্দন পেষণে নিয়োজিত করলেন। চন্দন শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো গ্রীষ্মকালের প্রতিদিনই তা গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা হলো। গ্রীষ্মকালশেষে চাতুর্মাস্য এলে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে ব্রত পালন করলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে (চৈ.চ. মধ্য ৪/১৭৮) তাৎপর্যে লিখেছেন– "জীব যখন কৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করে, তখন সে তার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। জড় বিরহজনিত নিবেদন জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু কৃষ্ণবিরহজনিত অনুতাপ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মাধবেন্দ্রপুরীর অপূর্ব কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা কৃষ্ণসেবার্থে জীবের একমাত্র ও বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা তা-ই আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন।" পরমবিরক্ত সর্বত্র উদাসীন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের গোপালের সেবার জন্য কী অপূর্ব আগ্রহ! হাজার মাইল বিপদসঙ্কুল রাস্তা পার হয়ে গোপালের জন্য চন্দন আনতে গেলেন, আবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই তাঁর গাঢ়প্রেমা লোকে দেখাইতে। গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান। পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/১৮৭-১৮৯

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী মথুরার সনোড়িয়া বিপ্রকে কৃপা করে প্রেমদান-লীলা করেছিলেন। তাঁকে বৈষ্ণব জেনে তাঁর হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি দৈববর্ণাশ্রমধর্মের মর্যাদা সংস্থাপন করে গেছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কৃপাপ্রাপ্ত জেনে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশী থেকে প্রয়াগের মথুরায় উপস্থিত হলে সনোড়িয়া বিপ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করেছিলেন। *প্রভু কহে–তুমি গুরু, আমি 'শিষ্য'-প্রায়। গুরু হইয়া শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥*

রামচন্দ্রপুরীকে তিরস্কার

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অপ্রাকৃত জীবনচরিতে আরো একটি লীলা আমরা দেখতে পাই। রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী উভয়েই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। কিন্তু গুরুদেবকে অবজ্ঞার ফলে রামচন্দ্রপুরী গুরুকৃপা হতে বঞ্চিত হলেন, ঐকান্তিকী গুরুভক্তির দ্বারা ঈশ্বপুরীপাদ কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করে ধন্য হলেন। রামচন্দ্রপুরী গুরুদেবের বিপ্রলম্ভরসের সর্বোত্তমতা ও চমৎকারিতা বুঝতে না পেরে তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান-উপদেশ-প্রদানরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গেলেন। তখন মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁকে ক্রোধভরে উপেক্ষা করেছিলেন।

শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল। দূর, দূর, পাপিষ্ঠ বলি ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা। আপন দুঃখে মরোঁ–এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি। তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু–মরোঁ আপনার দুঃখে। মোরে ব্রহ্ম উপদেশ এই ছার মূর্খে॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল। সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক-ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ। সর্বলোকে নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্বন্ধ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৮/২০-২৫

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন– "শ্রীরামচন্দ্রপুরী তাঁর গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর দেখেও তাঁর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-স্ফূর্তি বুঝতে না পেরে তাঁকে জাগতিক দুঃখে দুঃখিত মনে করে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেন। তাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা উপলব্ধি করে তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত হন এবং তাকে ত্যাগ করে তাড়িয়ে দেন"।

অপরদিকে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গুরুদেবের বাণী ও বপু সেবা করার মাধ্যমে গুরুকৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি গুরুদেবের পাদপদ্মসেবা, এমনকি নিজ হাতে মলমূত্রাদি পর্যন্ত পরিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বদা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়ে গুরুদেবের সন্তোষ বিধান করেছিলেন।

ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ সেবন। স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হইয়া পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন। বর দিলা–"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন"।
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী–প্রেমের সাগর। রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে। এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগৎজনে।
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেম দান। এই শ্লোক পড়ি তেঁহো করিলা অন্তর্ধান॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৮/২৬-৩১

অন্তর্ধান

মাধবেন্দ্রপুরী অপ্রকটকালে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করেছিলেন–

অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

–পদ্যাবলী

"হে দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ, কবে তোমাকে দর্শন করব! তোমার অদর্শনে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছে। হে দয়িত, আমি এখন কী করব?"

গৌড়ীয়গণ এ শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভরসের সার স্বরূপ মনে করেন। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর এ শ্লোক স্মরণ করা মাত্রই প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়তেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বাহ্যিকভাবে দশনামী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের মূল। ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই এ সকল প্রেমিক পরিকরকে আবির্ভূত করিয়েছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর জাগতিক জাতি-বংশাদির কথা আলোচনা করেননি। সেজন্য সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী দীর্ঘদিন পৃথিবীতে অবস্থান করে প্রেমভক্তি বিতরণ করেন।

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর। প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার। মাধবেন্দ্রপুরীর দেহে কৃষ্ণের বিহার।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তিরোধান লীলা করেছিলেন।
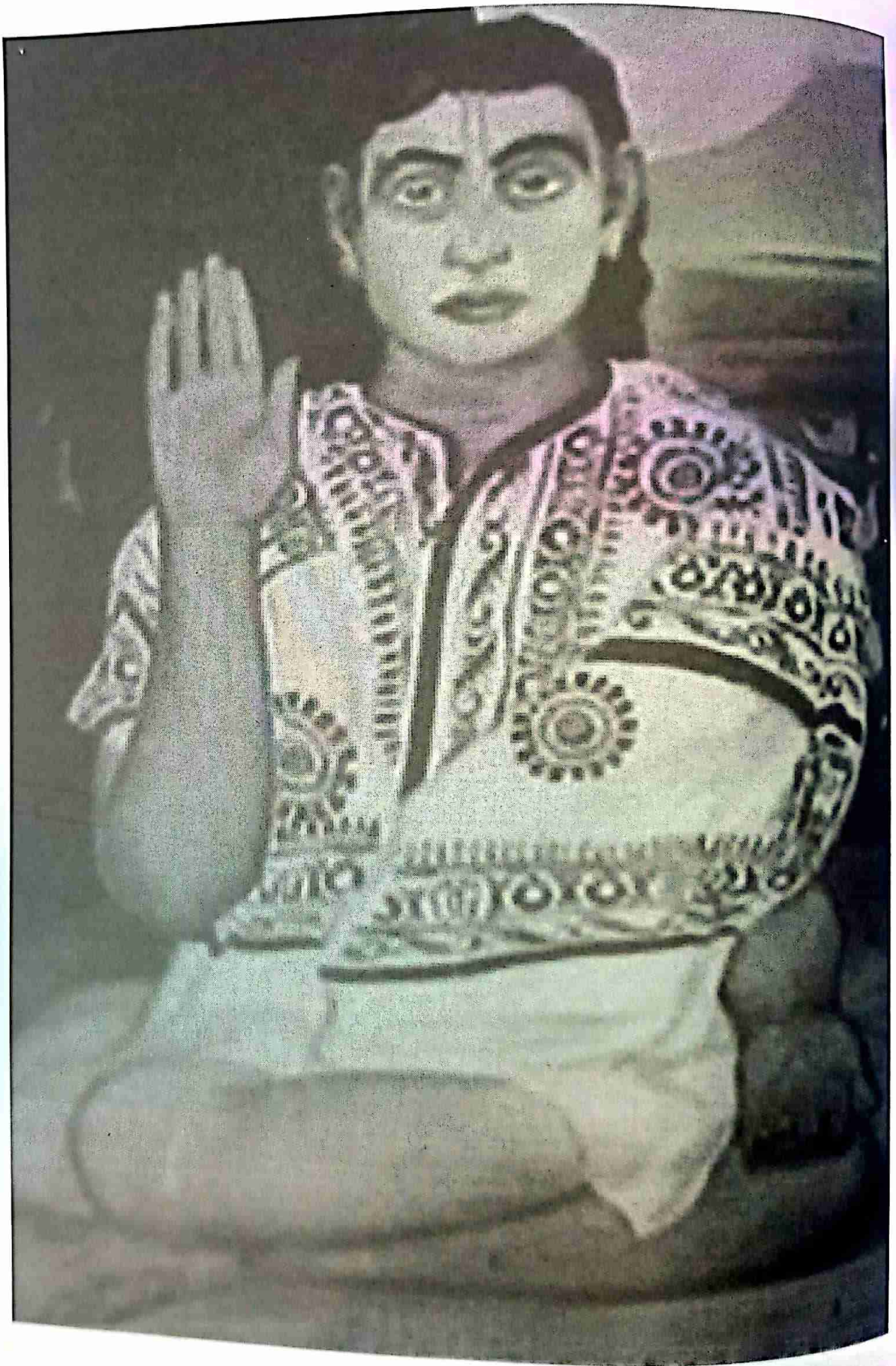
শ্রীল ঈশ্বরপুরী

শ্রীল ঈশ্বরপুরী

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ কুমারহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কুমারহট্ট কলকাতার চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত এবং হালিশহর স্টেশন থেকে তা প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে। স্থানীয় লোকজন তাঁর আবির্ভাব স্থান হিসেবে কুমারহট্টের মুখোপাধ্যায়পাড়ার কথা নির্দেশ করে থাকেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য। একবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুমারহট্টে এসেছিলেন এবং ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব স্থানের মৃত্তিকা তাঁর বহির্বাসে বেঁধে নিয়েছিলেন। তা দেখে আগন্তুক ভক্তগণসহ স্থানীয় লোকজনও ঐ স্থান থেকে মাটি তুলে নিয়ে যায়, ফলে সেখানে একটি ডোবা তৈরি হয় যা 'চৈতন্য ডোবা' বলে প্রসিদ্ধ।

মাধবেন্দ্রপুরীর কৃপা লাভ

প্রেমভক্তিরসময় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কাছ থেকে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 'শ্রীঈশ্বরপুরী' তাঁর সন্ন্যাস নাম। তবে পূর্বাশ্রমে তাঁর কী নাম ছিল তা জানা যায়নি। ঈশ্বরপুরীপাদের নিষ্কপট, স্নিগ্ধ ও প্রেমপূর্ণ সেবায় প্রসন্ন হয়ে মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁকে আশীর্বাদ করেন। গুরুদেব প্রসন্ন হলে শিষ্যের আত্যন্তিক মঙ্গল ও সর্বার্থসিদ্ধি হয় এবং গুরুদেব অপ্রসন্ন হলে শিষ্যের অমঙ্গল হয়, এটা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের লীলায় আমরা স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। শ্রীরামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন, কিন্তু দাম্ভিকতাহেতু গুরুদেবের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনুভাষ্যে লিখেছেন– "রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর দেখেও তাঁর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্তি বুঝতে অসমর্থ হয়ে লৌকিক বিচারে প্রাকৃত অভাবজনিত দুঃখে শোকাতুর মনে করে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি করানোর জন্য ব্যস্ত হলেন। তাই মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুরুর অবজ্ঞা উপলব্ধি করে তাঁর মঙ্গল করা থেকে বিরত থাকলেন এবং তাকে ত্যাগ করে তাড়িয়ে দিলেন।"

আর অন্যদিকে ঈশ্বরপুরী সর্বক্ষণ মাধবেন্দ্রপুরীকে কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণলীলা শোনাতেন। এভাবে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীকে তাঁর অপ্রকটের সময় কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে সাহায্য করেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁকে আলিঙ্গন করে বর দিয়েছিলেন– "তোমার কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্পদ লাভ হোক।" সেই থেকে ঈশ্বরপুরী হলেন কৃষ্ণপ্রেমের সাগর, আর রামচন্দ্রপুরী হলেন সকলের নিন্দাকারী।

গয়ায় চৈতন্য মহাপ্রভুকে দীক্ষা দান

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হওয়া সত্ত্বেও সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা শিক্ষা দেবার জন্য গয়াতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করেছিলেন।

তবে ত' করিলা প্রভু গয়াতে গমন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥
দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ। দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥

–চৈ.চ. আদি ১৭/৮-৯

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চক্রবেড় তীর্থে শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন দর্শন করেন এবং এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। মাহাত্ম্য শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হলেন। এমন সময় ঈশ্বরপুরীপাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেখানে ঈশ্বরপুরীপাদকে দর্শন করে মহাপ্রভু তাঁকে জানালেন যে, তাঁর গয়াযাত্রা সফল হয়েছে।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান। আমারে করাও তুমি–এই চাহি দান ॥

–চৈ.ভা. আদি ১৭/৪৯-৫৫

পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান অপেক্ষা যে বৈষ্ণব দর্শন শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরপুরীর মতো মহাভাগবতকে গুরুরূপে বরণ করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার জন্যই যে তিনি গয়ায় এসেছেন তা শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট ব্যক্ত করলেন। তারপর ঈশ্বরপুরীপাদ দশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দীক্ষা দান করলেন। এর দ্বারা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লৌকিক রীতি অনুসারে গয়ায় যাবতীয় তীর্থশ্রাদ্ধাদি লীলাশেষে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ঈশ্বরপুরীপাদ সেখানে পদার্পণ করলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ হাতে রান্না করা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিজের হাতেই তাঁকে পরিবেশন করেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ অমৃতময় প্রসাদ আস্বাদনে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। এভাবে ঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করিয়ে মহাপ্রভু গুরুসেবার সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেন।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ

গয়ায় মহাপ্রভুকে দর্শন প্রদানের পূর্বেও ঈশ্বরপুরীপাদ মহাপ্রভুর সাথে নবদ্বীপে মিলিত হয়েছিলেন। তার আগে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট থেকে দীক্ষাগ্রহণের লীলাভিনয়কারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সাথেও মিলিত হয়েছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করেছেন– নিমাই যখন নবদ্বীপ নগরে বিদ্যাবিলাস লীলা করছিলেন, সে সময় দৈবাৎ নিমাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁর অপূর্ব কান্তি দর্শন করে ঈশ্বরপুরীপাদ আকৃষ্ট হন। নিমাই ঈশ্বরপুরীপাদকে তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন এবং শচীমাতাকে দিয়ে কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়ে ঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করালেন। সে সময় নিমাইয়ের সাথে ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণকথা আলোচনা হয়।

নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে ঈশ্বরপুরীপাদ কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধপ্রেমে সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বরপুরীপাদ স্বরচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ অত্যন্ত প্রীতিভরে তাঁকে পড়াতে লাগলেন। নিমাইও সেখানে প্রতিদিন ঈশ্বরপুরীপাদকে প্রণাম করার জন্য যেতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীপাদ তাঁর গ্রন্থের দোষ দেখানোর জন্য নিমাইকে অনুরোধ করলেন। এ কথা শুনে নিমাই জড় পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিয়ে অমৃতময় বাক্য বললেন–

"এ গ্রন্থটি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের মতো শুদ্ধভক্তের রচিত, তাতে আবার কৃষ্ণকথা। এতে যে দোষ দর্শন করবে সে অবশ্যই অপরাধী। শুদ্ধভক্তের কবিত্ব যেভাবেই বর্ণিত হোক না কেন তা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে থাকেন, এতে কোনো সংশয় নেই।"

ভক্তের কবিত্ব যে- তে-মতে কেনে নয়। সর্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়' 'বিষ্ণবে' বলে ধীর। দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণে বীর ॥
ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ। ভক্তের বর্ণমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥
–চৈ.ভা. আদি ১১/১০৫-১১০

তথাপি পুরীপাদ বারবার মহাপভুকে অনুরোধ করতে থাকলেন। একদিন মহাপ্রভু সেই গ্রন্থের কোনো একটি শ্লোক শুনে রসিকতার ছলে বললেন– "এ শ্লোকের ধাতুটি 'পরস্মৈপদী' হবে, 'আত্মনেপদী' হবে না। তার কয়েকদিন পর শ্রীপুরীপাদ বিদ্যারস বিচার করে মহাপ্রভুকে জানালেন যে, তিনি সেই ধাতুকে আত্মনেপদী করেছেন। এ কথা শুনে মহাপ্রভু তাঁর ভৃত্যের জয় ও মহিমা বর্ধনের জন্য আর কোনো দোষ দর্শন করলেন না। এভাবে কিছুকাল শ্রীঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর সঙ্গে বিদ্যারসরঙ্গে কাটিয়ে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১২/২২০৫-৭) এরূপ বর্ণিত আছে–

এই দেখ গোপীনাথ আচার্যের ঘর। মধ্যে মধ্যে এথা আইসেন বিশ্বম্ভর ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা ছিলা। 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ এথাই রচিলা ॥
গদাধর পণ্ডিত পরম স্নেহ করে। তাঁর প্রেমচেষ্টা দেখি পড়াইলা তাঁরে ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পশ্চিম ভারতে তীর্থ ভ্রমণকালে দৈবযোগে যখন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সাথে মিলিত হলেন, তখন উভয়ে উভয়কে দর্শন করে মূর্ছিত হলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদও নিত্যানন্দকে কোলে করে প্রেমজলে সিক্ত করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয়– বুঝতে পেরেই ঈশ্বরপুরীপাদাদি শিষ্যবর্গ সকলেই নিত্যানন্দের প্রতি রতিবিশিষ্ট হলেন এবং ঈশ্বরপুরীপাদ গভীরভাবে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর। ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্যলীলা স্কন্ধ উপজিল ॥
–চৈ.চ. আদি ৯/১০-১১

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ অপ্রকটের পূর্বে তাঁর দুই শিষ্য কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে মহাপ্রভুর সেবার জন্য নির্দেশ করলেন। সম্বন্ধে গুরুভ্রাতা হলেও "গুরুদেবের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়"– এরূপ বিচার করে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁদের সেবকরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ

দ্বাপরে যিনি বলরামরূপে কৃষ্ণলীলার পুষ্টিবিধান করেছিলেন কলিযুগে চৈতন্যলীলায় তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলরাম তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন– "যদিও প্রভু বলরাম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তথাপি তিনি সর্বদাই সখা, ভ্রাতা, পাখা, ছত্র, শয্যা, আসন, ভূষণ, পাদুকা, গৃহ, বস্ত্র, ধাম প্রভৃতিরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করছেন। শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ– এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।" তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে বহু নামে অভিহিত করেছেন। নিত্যানন্দ অবধূত, নিত্যানন্দ চন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ মহামহেশ্বর, নিত্যানন্দ সিংহ, নিত্যানন্দ মহামল্ল, অবধূত চন্দ্র, অবধূত রায় ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ ইত্যাদি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচরণানুস্মরণে এরূপ বর্ণনা করেছেন–

সর্ব-অবতার কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥
সেই কৃষ্ণ–নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম–সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

–চৈ.চ. আদি ৫/৪-৬

আবির্ভাব

একচক্রাধামে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্বাভাস সম্পর্কে নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে বলেছেন– দ্বাপরযুগের শেষে মাতা কুন্তীদেবীসহ পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমণ করতে করতে রাঢ়দেশে প্রবেশ করে একচক্রা গ্রামে অবস্থানকালে সেখানকার মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হন। যুধিষ্ঠির মহারাজ ভাবলেন– "অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু একচক্রাভূমির ন্যায় পরম সৌন্দর্যে কোথাও মন আকৃষ্ট হয়নি। তাই মনে হয় এই একচক্রাভূমি শ্রীভগবানেরই লীলাস্থলী। এ ভূমির মহিমা শ্রীভগবান যদি কৃপা করে প্রকাশ করেন তবেই জানা যেতে পারে। এভাবে বিচার করতে করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। তখন ভগবান বলরাম যুধিষ্ঠির মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব এবং একচক্রা গ্রামে তিনি স্বয়ং যে নিত্যানন্দ রূপে আবির্ভূত হবেন তার ইঙ্গিত দিলেন। তারপর ভগবদ্ধাম শ্বেতদ্বীপের দর্শন প্রদান করে তিনি অন্তর্হিত হন।

১৩৯৫ শকাব্দের মাঘমাসে (ইংরেজি ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ, ১২ জানুয়ারি) শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন। পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা অনুসারে হাড়াই পণ্ডিত বসুদেব ও দশরথ এবং পদ্মাবতী রোহিণী ও সুমিত্রার মিলিত প্রকাশ।

বাল্যলীলা

নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবে রাঢ়দেশের সব অমঙ্গল দূর হয়। তিনি রূপ ও গুণে অতুলনীয়। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হলে একচক্রা থেকে নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠেন। সেই হুঙ্কারের শব্দ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলতে লাগলেন বজ্রপাত হলো, আবার কেউ মনে করল কোনো অমঙ্গল হবে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। এভাবে নিত্যানন্দ প্রভু নিজেকে গুপ্ত রেখে শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন লীলা করতে লাগলেন। কখনো তিনি কৃষ্ণলীলার অনুকরণে দেবতাদের সভায় পৃথিবী কর্তৃক আসুরিক অত্যাচার বর্ণন, কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্মলীলা, পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন, মাখন চুরি, কালীয় দমন, ধেনুকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, বৎসাসুর বধ, গোবর্ধন ধারণ, গোপীবস্ত্র হরণ, যজ্ঞপত্নীদের দর্শন, অক্রুর কর্তৃক কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় আনয়ন, কংসবধ ইত্যাদি লীলাভিনয় করতেন। কখনো রাম লীলার অনুকরণে সেতুবন্ধন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ইন্দ্রজিৎ বধ। আবার শিশুদের সঙ্গে কখনো বামনরূপে বলীর সর্বস্ব হরণ ইত্যাদি যাবতীয় লীলা সম্পাদন করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একদিন লক্ষ্মণের ভাবে শক্তিশেলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন তাঁর শিশু-সঙ্গীরা তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তিনি যেন শূন্যভাবে পড়ে রইলেন। তা দেখে শিশুরা ভীত হয়ে শীঘ্রই সেখানে ছুটে এলো, দেখলেন সত্যি সত্যিই যেন প্রাণশূন্য নিত্যানন্দ। কেউ বললেন শিশু ভাবাবিষ্ট হয়েছে, কেউ বললেন অভিনয় করছে, হনুমান ঔষধ দিলে ভালো হবে। তখন কোনো শিশু হনুমানের ভাবে শীঘ্র ঔষধ নিয়ে এলেন। এক শিশু বৈদ্য বেশে সেই আনীত বৃক্ষলতার রস নিংড়িয়ে নিত্যানন্দের নাকে দিলেন। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভু চেতনা লাভ করে উঠে বসলেন। সকলে অবাক হয়ে বললেন, "আমরা কখনো এমন খেলা দেখিনি।" সকলে তখন জিজ্ঞেস করলেন– "তুমি এরকম খেলা কোথায় শিখলে?" নিত্যানন্দ বললেন– 'আমার এসব লীলা স্বতঃসিদ্ধ।" নিত্যানন্দের যথার্থ স্বরূপ কেউ জানতে পারলেন না। *"চিনতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়াবশে"*– এভাবে নিত্যানন্দ প্রভু শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রম করে কৈশোর বয়সে পদার্পণ করলেন। তখন তাঁর বয়স বারো বছর।

গৃহত্যাগ

নিত্যানন্দ ছিলেন হাড়াই ও পদ্মাবতীর একমাত্র নয়নমণি ও প্রাণস্বরূপ। নিত্যানন্দকে না দেখে তাঁরা একমুহূর্তও থাকতে পারতেন না। হাড়াই পণ্ডিত নানাবিধ কাজে থাকলেও প্রাণটি পড়ে থাকত নিত্যানন্দের প্রতি। একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে খুব যত্ন সহকারে সেবা করতে লাগলেন। রাতেও সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করলেন। সন্ন্যাসীকে পেয়ে নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে বিভোর হলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় কাটালেন। নিত্যানন্দের সর্বাকর্ষণ স্বভাবে সন্ন্যাসী পরমাকৃষ্ট হলেন। তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন না। পরদিন সকালে বিদায় নেয়ার সময় সন্ন্যাসী তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর পিতার কাছে ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শুনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো যেন মূর্ছা প্রাপ্ত হলেন। কী নিদারুণ কথা! একমাত্র প্রাণপুত্র

নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈর্য ধারণপূর্বক বিচার করলেন– পূর্বকালে মহারাজ দশরথ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম লক্ষণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি আজ এ সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে সমর্পণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কাঁদতে কাঁদতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন এবং অনুনয়ের সঙ্গে বললেন– "আমাদের একমাত্র প্রাণটি আপনাকে দিলাম। আপনি সর্বতোভাবে একে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।" সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদি খণ্ডের নবম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

তীর্থ ভ্রমণ

নিত্যানন্দ প্রভু তৈর্থিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রথমে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর তীর্থে গমন করে সেখানে 'শিব' দর্শন করেন। তারপর তিনি বৈদ্যনাথ তীর্থে একাকী গমন করেন। তারপর শিবরাজধানী কাশীতে গমন করে গঙ্গা দর্শনপূর্বক স্নান-পানাদি করলেন। সেখান থেকে প্রয়াগে, তারপর পূর্বজন্ম স্থান মথুরায় গমন করেন। সেখানে স্নান করে ব্রজের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করেন। তারপর 'মদনগোপালদেব' দর্শন করে হস্তিনাপুর গিয়ে বলরামের স্মৃতি চিহ্ন দর্শন করে প্রণাম করেন। সেখান থেকে দ্বারকা, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করে পশ্চিম ভারতে গমন করে মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শন লাভ করেন। উভয়ের দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উথলে উঠল। উভয়ের অপূর্ব প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্মিত হলেন। নিত্যানন্দপ্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন–

মাধবেন্দ্র বোলে প্রেমে না দেখিলুঁ কোথা। সেই মোর সর্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা ॥
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি। নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি-ময় ॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জানে ॥

–চৈ.ভা. আদি ৯/১৮২-১৮৫

পরস্পর পরস্পরের দর্শনে আনন্দে মূর্ছিত হলেন। তাঁদের আনন্দ মূর্ছা ভঙ্গ হলে তাঁরা পরস্পরের গলা ধরে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। তাঁরা দুজনেই দিনরাত আনন্দে বিহ্বল থাকতেন। উভয়ে একত্রে কৃষ্ণকথা রঙ্গে তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। কিছুদিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে পরম সুখে কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করলেন।

তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতুবন্ধাদি তীর্থ দর্শনে চললেন। এভাবে তিনি ধনুস্তীর্থ, বিজয়নগর, অবন্তী দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী ধামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য-গীত করলেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি গঙ্গাসাগর তীর্থে এলেন। সেখান থেকে শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন করলেন। ব্রজধামে এসে নিত্যানন্দ প্রভু এক অপূর্ব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা রাতি ॥
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান। সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥

–চৈ.ভা. আদি ৯/২০৫-২০৬

গৌর নিত্যানন্দের মহামিলন

বৃন্দাবনে যখন নিত্যানন্দ প্রভু এমন ভাবাবেশে অবস্থান করছিলেন, তখন এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা বিলাসাদি সমাপ্ত করে গয়াধামে পিতৃকর্ম করে এবার ধর্ম প্রচারের জন্য ও জীবকুলের উদ্ধারের জন্য আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নিরন্তর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম রসাস্বাদন করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন হলো তাঁর সংকীর্তন সদন।

তিনি ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমরস আস্বাদন করছেন। কিন্তু অন্য কোনো সাধারণ জীবকে দিচ্ছেন না, যেন কারো প্রতীক্ষায় আছেন। কে জানে, তাঁর সেই গূঢ় অভিপ্রায়। নিত্যানন্দ হবেন প্রেমধন বিতরণের প্রধান সহায়ক, তাই যেন গৌরসুন্দর তাঁর প্রতীক্ষা করছেন।

এদিকে বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণানুসন্ধান করছেন, সব মন্দিরে সিংহাসন যেন শূন্য, কৃষ্ণ নাই; কোথায় কৃষ্ণ? কোথায় কৃষ্ণ? বলে সর্বত্র অনুসন্ধান করতে করতে যেন শেষে দৈববাণীতে শুনলেন– "তিনি এখন নদীয়াতে অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্তন বিলাস করছেন। তুমি সেখানে যাও।" এ কথা শুনে নিত্যানন্দ ব্রজমণ্ডল থেকে গৌড়মণ্ডল অভিমুখে চললেন। কোনোদিন অযাচিতভাবে কোথাও একটু দুগ্ধ পান, না হলে উপবাস। এভাবে তিনি শীঘ্রই গৌড়দেশের নবদ্বীপে আগমন করলেন। নবদ্বীপের মায়াপুরে শ্রীনন্দন আচার্য নামে এক মহাভাগবত গঙ্গাতটে বাস করতেন, হঠাৎ শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। শ্রীনন্দন আচার্য আজানুলম্বিত সেই পুরুষকে দর্শন করে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক পূজা করলেন এবং তাঁকে তাঁর গৃহে রাখলেন।

এদিকে অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তা জানতে পেরে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারপর সকালেই তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে এলেন। ধীরে ধীরে ভক্তগণ আসতে লাগলেন। সকলেই প্রভুর চারদিকে উপবেশন করলেন। এমন সময় মহাপ্রভু ভঙ্গিপূর্বক বলতে লাগলেন– "আমি আজ শেষ রাতে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। শেষ রাতের স্বপ্ন সাধারণত মিথ্যা হয় না।" ভক্তগণ সেই অপূর্ব স্বপ্নের কথা শুনতে উৎসুক হলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন– "এক তালধ্বজ রথ যেন আমার গৃহ দ্বারে উপনীত হলো। সে রথের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ। তাঁর স্কন্ধে হল ও মূষল আছে। তিনি নীল বসন পরিহিত। তাঁর বাম হাতে বেত্র নির্মিত কমণ্ডলু। তিনি বারবার জিজ্ঞেস করছেন– 'এ বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের? এ বাড়ি কি নিমাই পণ্ডিতের?' আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– 'আমি তোমার ভাই'। আগামীকাল পরস্পর পরিচয় হবে। তাঁর কথা শুনে আমার অত্যন্ত আনন্দ হলো। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, রাত্রি শেষ হলো।"

এ কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু এক দিব্য ভাবে বিভোর হলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেন এবং হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত সবার কাছে বলতে লাগলেন– "আমার মনে হয় এ নবদ্বীপে নিশ্চয়ই কোনো মহাপুরুষ আগমন করেছেন। আপনারা তাঁকে অনুসন্ধান করুন।" প্রভুর এ আজ্ঞা পেয়ে ভক্তগণ স্বপ্নেদেখা সেই পুরুষের সন্ধানে বের হলেন এবং চতুর্দিকে সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না, ফিরে এলেন প্রভুর কাছে। প্রভু বললেন– "স্বপ্নের কথা মিথ্যা নয়, নিশ্চয়ই কোনো স্থানে আছে।" এবার প্রভু স্বয়ং অনুসন্ধান করতে চললেন। ভক্তগণও পেছনে পেছনে

চললেন। মহাপ্রভু সোজা ঠিক শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহের বারান্দায় দিব্য আসনে এক মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে উপবিষ্ট আছেন। সকলে অবাক, মহাপ্রভু বহুকাল পর প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও প্রাণের দেবতার দীর্ঘকাল পর সাক্ষাৎ পেয়ে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কী আশ্চর্য মিলন! নয়নে নয়নে যেন দুজন-দুজনার রূপ দর্শনে বিভোর। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের একটি 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণাত্মক শ্লোক' সুস্বরে গাইতে শুরু করলেন।

"নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ রচিত চূড়া, কর্ণ যুগলে কর্ণিকার অর্থাৎ উৎপলাকৃতি কুসুম, পরনে পীতবসন এবং গলদেশে পঞ্চবর্ণ পুষ্প রচিত বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করে স্বীয় অধর সুধায় বেণুর ছিদ্রসমূহকে পরিপূর্ণ করতে করতে স্বীয় চরণ দ্বারা শোভিত বলে সকলের আনন্দজনক বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গের গোপবৃন্দ তখন তাঁর যশগান করতে লাগলেন।" তা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমে হুঙ্কারপূর্বক ধরাতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন; তাঁর নয়ন জলে ভূতল সিক্ত হতে লাগল।

শোনামাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ। পড়িলা মূর্ছিত হইয়া নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়। 'পড়' 'পড়' শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হৈলা চেতন। তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥

সে প্রেম দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনিও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। সে কী মধুর মিলন দৃশ্য! দুজনার নয়ন জলে দুজন সিক্ত হচ্ছেন। ভক্তগণ তখন ঘন ঘন হরিধ্বনি করতে লাগলেন। আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন হলো।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু

তারপর মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে মহা আনন্দে শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন। কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করার পর মহাপ্রভু নির্দেশ দিলেন– নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করবেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু জননীর ন্যায় ভাবতেন। মালিনী দেবীও নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্রের মতো সেবা করতেন। একদিন এক অপূর্ব ঘটনা হলো। মালিনী দেবী ভগবদ্-অর্চনের বাসনাদি মার্জন করছেন। এমন সময় এক কাক উড়ে এসে ঠাকুরের ঘিয়ের বাটিটি নিয়ে গেল। মালিনী দেবী হায়! হায়! করে উঠলেন এবং অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। মায়ের কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত কারণ অবগত হলেন। তখন মালিনী দেবীকে বললেন– 'মা, তুমি দুঃখ করোনা। আমি এক্ষুণি ঐ বাটি এনে দেব। এ কথা বলে তিনি কাককে আহ্বান করে ঠাকুরের ঘৃত বাটি এনে দিতে বললেন। নিত্যানন্দের আদেশে কাকটি শীঘ্রই ঘৃত বাটিটি কোথা হতে এনে দিয়ে উড়ে গেল।

সকলে দেখে অবাক! যে নিত্যানন্দ প্রভু ত্রিলোকের অধীশ্বর তার পক্ষে অসম্ভব কী?

চতুর্দশ ভুবন পালন শক্তি যাঁর।
কাকস্থানে বাটি আনে কি মহত্ত্ব তাঁর ॥

ব্যাস পূজা

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন– "হে শ্রীপাদ, কাল পূর্ণিমা তিথি ব্যাসপূজা দিবস। তুমি কোথায় ব্যাসপূজা করবে?" তখন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের হাত ধরে বললেন– "এ বামনের ঘরে।" শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজা মহোৎসবের সব আয়োজন করলেন। অধিবাস দিবসে সুসজ্জিত ব্যাস পূজা মণ্ডপে প্রাতঃকাল থেকেই কীর্তন আরম্ভ হলো। নিয়ম করা হলো– এ অঙ্গনে ভক্ত ব্যতীত অন্য কোনো লোক প্রবেশ করতে পারবে না। আরম্ভ হলো গৌর নিত্যানন্দ দুই ভাইয়ের মহানৃত্য সংকীর্তন।

ব্যাসপূজা অধিবাস উল্লাস কীর্তন। দুই প্রভু নাচে বেঢ়ি গায় ভক্তগণ ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই। দোঁহা দোঁহে ধ্যান করি নাচে এক ঠাই ॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জন। কেহো মূর্ছা যায় কেহো করয়ে ক্রন্দন ॥

আজ গোলোকের হরি ভূলোকে নেমেছেন যুগধর্ম নাম সংকীর্তন এবং স্বীয় ভক্তিরস-মাধুর্য আস্বাদনের জন্য।

যাইহোক, দুপুরে বিশ্রামের পর সন্ধ্যায় পুনরায় মহাসংকীর্তন আরম্ভ হলো। প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত নৃত্য সংকীর্তন চলল। ভক্তরা নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন। মহাপ্রভুও নিজ ভবনে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে রয়ে গেলেন। কিছু সময় পর শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাবাবেশে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন এবং নিজ দণ্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন ও কমণ্ডলুটি দূরে ফেলে দিলেন। পরদিন সকালে সর্বান্তর্যামী মহাপ্রভু শীঘ্র শ্রীবাস অঙ্গনে এলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মহাভাবাবেশের কথা শ্রবণ করলেন। তখন তিনি সেই ভাঙ্গা দণ্ড ও কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। মহাপ্রভু ভক্তদের জানালেন, শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন। তাঁর পক্ষে ত্রিগুণাত্মক বেদের নির্মিত বর্ণাশ্রম চিহ্নাদি রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গা-স্নান করে শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে এলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত দুই প্রভুকে নব-বস্ত্র পরিধান করতে দিলেন। আজ ব্যাস পূজা দিবস। ভক্তগণ মহা সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ মধুর বাদন হতে লাগল। শ্রীবাস অঙ্গনে যেন স্বয়ং আনন্দ মূর্তিমান অবতীর্ণ হয়েছে। গগন, পবন, দ্যুলোক, ভূলোক ও গোলোক সেই আনন্দ সিন্ধুর হিল্লোলে নৃত্য করছে। সকলেই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হলেন।

এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে একটি দিব্য সুগন্ধি মালা নিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মালাটি হাতে নিয়ে আনন্দে বিভোর চিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু বললেন– "শ্রীপাদ, মালাটি ব্যাসের কণ্ঠে দিয়ে ব্যাস পূজা সুসম্পন্ন করুন।" মহাপ্রভুর কথা শুনে নিত্যানদ প্রভু হাসতে হাসতে মালাটি গৌরসুন্দরের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। তখন চতুর্দিকে ভক্তগণ মহা হরিধ্বনি করে উঠলেন। আকাশ থেকে দেবগণ ও দেবীগণ আনন্দে নৃত্যগীতসহ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। এবার গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্‌ভুজ রূপ দর্শন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভু সে দিব্য স্বরূপ

দর্শনে আনন্দে প্রেমমূর্ছা গেলেন। তখন গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন– "শ্রীপাদ তুমি স্থির হও, যে সংকীর্তন প্রচারের জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ তা সিদ্ধ হলো। তুমি প্রেমভক্তি ধনের আধার, তা হতে তুমি যদি লোককে কিছু দাও, তবেই তারা প্রেম লাভ করতে পারে।" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্য দশা লাভ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু সকলকে বললেন– "আজ ব্যাসপূজা পূর্ণ হলো। তোমরা সকলে হরি কীর্তন করো।" এ কথা বলে দুই ভাই নৃত্য করতে লাগলেন। চারদিকে ভক্তগণও কীর্তন করতে লাগলেন। মালিনী দেবীর সঙ্গে শচীমাতা নিভৃতে বসে এ সকল লীলা দর্শন করতে লাগলেন। সংকীর্তন শেষে ব্যাসপূজার প্রসাদ শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্তদের মাঝে বিতরণ করলেন।

শ্রীবাস ঠাকুরের নিত্যানন্দের প্রতি নিষ্ঠা

ব্যাসপূজার পর একদিন গৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীরাম পণ্ডিত অদ্বৈত-ভবনে এসে নিত্যানন্দের আগমন বার্তা জানালেন। অদ্বৈত আচার্য শীঘ্রই গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বৈত আচার্যের মনোগত যেসব সঙ্কল্প, তা বলতে লাগলেন। তা শ্রবণ করে আনন্দে শ্রীগৌর-পাদপদ্ম-যুগল মহার্চন করলেন। তারপর মহাপ্রভু ভগবৎ-মন্দিরে প্রবেশপূর্বক বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করলেন; নিত্যানন্দ প্রভু শিরে ছত্র ধারণ করলেন, অদ্বৈত প্রভু স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন, গদাধর পণ্ডিত তাম্বুল প্রদান ও শ্রীবাস চামর-ব্যজন করতে লাগলেন। এভাবে প্রত্যেক ভক্তই প্রভুর কিছু না কিছু সেবা করতে লাগলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন– "প্রভু নিত্যানন্দ তোমারই দেহ। তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনো ভেদ আমি দেখি না। বরং তোমাকে জানতে হলে নিতাইয়ের কৃপা প্রয়োজন।" গৌরসুন্দর শ্রীবাসের মুখে এ কথা শুনে আনন্দে বললেন– "শ্রীবাস, নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এত বিশ্বাস, আমি তোমাকে বর দান করছি, তোমার গৃহে কোনোদিন অন্ন-বস্ত্রের অভাব হবে না। তোমার গৃহে সকলেই আমার প্রিয় হবে।"

শচীমাতার হাতে গৌর নিত্যানন্দের ভোজন

আরেকদিন শচীমাতা এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করলেন– গৌর নিতাই সাক্ষাৎ ব্রজের কানাই বলাই। নিতাই শচীমাতাকে মা বলে আহ্বান করছেন, শচীমাতা রন্ধন করে নিতাইকে ভোজন করাচ্ছেন। সকালে এ শুভ স্বপ্নকথা শচীমাতা গৌরসুন্দরকে জানালেন। প্রভু বললেন– "জননী, তবে আজ নিত্যানন্দকে আমন্ত্রণ করে আমাদের ঘরে ভোজন করানো হোক।" শচীমাতা নিতাইকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন।

গৌরসুন্দর নিতাইকে আমন্ত্রণ করে ঘরে আনলেন। ভৃত্য ঈশান প্রভুদ্বয়ের পাদ ধৌত করে দিলেন। তারপর শচীমাতা গৌর-নিতাইকে ভোজনে বসালেন। দুই ভাই আনন্দে ভোজন করছেন। তখন শচীমাতা দেখলেন গৌর-নিতাই ব্রজের কানাই-বলাইরূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্তু এ রহস্য শচীমাতা আর কাউকে বললেন না।

কৌপীন বিতরণ ও চরণামৃত পান

অন্যদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণের কাছে নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলতে লাগলেন- "নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ, আমা হতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি নিত্যানন্দের দ্বারা বিশ্বে প্রেমভক্তি দান করব।" এই বলে মহাপ্রভু নিজ হাতে নিত্যানন্দের অঙ্গে গন্ধলেপন ও কণ্ঠে মালা প্রদানপূর্বক স্তুতি করতে লাগলেন। পরিশেষে একখণ্ড কৌপীন চেয়ে নিয়ে তা খণ্ড খণ্ড করে ভক্তগণের হাতে প্রদান করলেন এবং মস্তকে বাঁধার আদেশ করলেন। তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ সানন্দে হরিধ্বনি করতে করতে তা মস্তকে বন্ধন করলেন। তারপর প্রভুর আদেশে সকলে নিত্যানন্দের চরণামৃত পান করলেন।

জগাই মাধাই উদ্ধার

একদিন অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করে বললেন- "হে নিত্যানন্দ, হে হরিদাস, তোমরা আমার আদেশ শ্রবণ করো। তোমরা প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করো- *বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।* মুখে কৃষ্ণ নাম করো, কৃষ্ণের চরণ আরাধনা করো এবং ভক্তি সদাচার পালন করো। এ সমস্ত শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষার কথা বলবে না। এটাই ভিক্ষা অন্য কোনো ভিক্ষা নেই।' এখানে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সুন্দর বর্ণনা করেছেন-

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস। সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা। দিন অবসানে আসি, আমারে কহিবা ॥

-চৈ. ভা. মধ্য. ১৩/৮/১০

মহাপ্রভুর নির্দেশ মতো শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস নদীয়া নগরের ঘরে ঘরে এভাবে নাম প্রচার করতে লাগলেন। অনেক লোক নানা প্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা রটনা করতে লাগলেন। আবার অনেক সজ্জন ব্যক্তি এ প্রচারকে উত্তম বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। সে সময় নদীয়ার কোতয়ালের কাজ করতো জগাই মাধাই। তারা ভীষণ পাপী। মদ পানে সর্বদা বিভোর থাকত। ব্রাহ্মণ কুলে তাদের জন্ম। একদিন গঙ্গার পাড়ে দুই মহাপাপী মদ্যপানে বিভোর হয়ে আছে। দয়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করলেন- "এ দুজনকে অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে।" নিত্যানন্দ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন- "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা"। দুই মাতাল নিত্যানন্দের আদেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আরক্ত নয়নে বলল, "তোর নাম কী?" নিত্যানন্দ প্রভু জবাব দিলেন, "নাম অবধূত" জগাই মাধাই বলল, "তুই কী বলছিস?" নিত্যানন্দ- "আমি হরি নাম করতে বলছি।" এ কথা শুনে মাধাই ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "শালা, আমাদের প্রতি আবার উপদেশ"। এই বলে ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো ছুড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায়। ঢিলের আঘাতে মাথা থেকে দর্ দর্ করে রক্ত পড়তে লাগল। তবুও নিত্যানন্দ প্রভু অনুনয় করে বলতে লাগলেন, "আমায় মেরেছিস তাতে ক্ষতি নেই। তোরা একবার হরি হরি বল।" মাধাই পুনরায় মারতে উদ্যত হলো। জগাই তখন মাধাইয়ের দুখানি হাত চেপে ধরে বলল,

"ভাই, বিদেশী সন্ন্যাসী মেরে লাভ নেই।" এদিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে এ সংবাদ জানালেন। প্রভু তা শোনা মাত্রই ভক্তগণসহ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং নিত্যানন্দের কপালে রক্তের ধারা দেখে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন। মহা তেজময় সুদর্শন তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। দুই পাপী তা দেখে ভয়ে কম্পমান। নিত্যানন্দ প্রভু অমনি প্রভুর করপদ্ম ধরে বলতে লাগলেন, "হে প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করো। আমি অনুনয় করছি, তুমি অস্ত্র ধরো না। নাম প্রেম দিয়ে দুই পাপীকে উদ্ধার করো।" করুণাঘন নিত্যানন্দের এ কথা শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দর দ্রবীভূত হলেন। তিনি সুদর্শনকে চলে যেতে বললেন। তারপর তিনি যখন শুনলেন যে, মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে উদ্যত হলে জগাই তাকে রক্ষা করেছে, তখন করুণাময় প্রভু জগাইকে ডেকে বললেন, "জগাই, তুই আমার দিব্য স্বরূপ দর্শন কর।" এই বলে মহাপ্রভু তাঁকে দিব্য চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দর্শন করালেন। জগাই সে দিব্য রূপ দর্শন করে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়ল এবং স্তুতি করতে লাগল। কিন্তু মাধাই কিছুই দেখতে পেল না। জগাই বলল, "আমরা দুই ভাই, আমাকে যেমন কৃপা করলে তেমনি মাধাইকেও করো।" প্রভু বললেন, "নিত্যানন্দ আমার প্রাণ, যে নিত্যানন্দকে দ্রোহ করে আমি তাকে কৃপা করি না। মাধাই যদি নিতাই-এর চরণ ধরে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সেও প্রেম পাবে।" তখন মাধাই নিত্যানন্দের শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ তাকে বক্ষে তুলে আলিঙ্গন করলেন, আর তখন ভক্তগণ চারদিক মহা হরিধ্বনিতে মুখরিত করতে লাগলেন। এমন পতিতপাবন নিত্যানন্দ জগাই মাধাই দুই মহাপাপীকে উদ্ধার করে পতিতপাবন নাম সার্থক করলেন।

অদ্বৈত গৃহে ভোজন

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু- তিন জন এক সারিতে বসে ভোজন করছিলেন। অদ্বৈতাচার্য-পত্নী শ্রীমতী সীতাদেবী শ্রীমদনগোপালের মহাপ্রসাদ পরিবেশন করছিলেন। মহাপ্রসাদ ভোজন যখন প্রায় সমাপ্তির পথে, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্য ভাবাবেশে সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়িয়ে হাসতে লাগলেন। মহাপ্রভু হায় হায় করতে লাগলেন।

নিত্যানন্দের আচরণ দর্শন করে অদ্বৈতাচার্য ক্রোধের ভাব প্রকাশপূর্বক যেন অগ্নি সদৃশ হলেন। ক্রোধের আবেশেই তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব মহিমা প্রকাশ করতে লাগলেন- "এই অবধূত নিত্যানন্দ আমার সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়িয়ে আমার জাতি নষ্ট করল। আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ পালন করা আমার স্বধর্ম। এ সমস্ত ব্যাপার জানতে পারলে ব্রাহ্মণ সমাজ আমাকে ত্যাগ করবে।" তা হলো অদ্বৈতাচার্যের উক্তির যথাশ্রুতি নিন্দাবাচক অর্থ। কিন্তু অদ্বৈতের গোপন অভিপ্রায় হলো নিন্দার ছলে শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করা। স্তুতিমূলক অর্থ হলো এই যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে আমার যে ব্রাহ্মণত্বের জাতি-অভিমান ছিল, নিত্যানন্দ আমার সমস্ত ঘরে প্রসাদান্ন ছড়ানোর ফলে তাঁর পরম পাবন ভুক্তাবশেষই ছড়িয়েছেন। জাতি-অভিমান বশত আমি যে ভুক্তাবশেষকে সাধারণ অন্নের ন্যায় উচ্ছিষ্ট মনে করতাম, তা জানিয়ে আমার জাতি-অভিমান দূর করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।"

"কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ" –এই মদ্যপ শ্রীনিত্যানন্দ কোথা থেকে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হলো? তা যথাশ্রুত নিন্দার্থ। স্তুতি অর্থ হবে এরূপ– আমার পরম সৌভাগ্য বশত কোথা থেকে এসে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমদিরাপান রত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর মহৎ সঙ্গ দান করে আমাকে কৃতার্থ করলেন? *"গুরু নাহি, বোলয় সন্ন্যাসী"*– যথাশ্রুত নিন্দার্থ হলো– এই নিত্যানন্দের কোনো গুরু নেই, অথচ নিজেকে সন্ন্যাসী বলে প্রচার করে, সুতরাং ভণ্ড। স্তুতি অর্থে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু হলেন– বাস্তবিক বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, ঈশ্বর তত্ত্ব। সুতরাং তিনি জগৎগুরু। জগতের গুরু বলে তাঁর কোনো গুরু নেই বা থাকতেও পারে না। শ্রীবলরাম বলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হলেন মূল ভক্ত-অবতার। তাঁর সাধন-ভজনের কোনো প্রয়োজন নেই। তথাপি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সাথে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে লোকশিক্ষার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস হলো তাঁর একটি স্বরূপ সম্পর্কিত লীলা বিশেষ। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বললেন– এই নিত্যানন্দের কোথায় কোন গ্রামে জন্ম, তাও জানি না, সুতরাং এক সঙ্গে ভোজন করা সঙ্গত নয়– তা হলো যথাশ্রুত নিন্দার্থ। স্তুতিমূলক অর্থ হলো– শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর তত্ত্ব বলে– তিনি অনাদি, নিত্য, জন্ম রহিত। যার জন্ম নেই, তাঁর জন্মের বিবরণ বা জন্মস্থান বা গ্রামের কথা কেউ জানতে পারে না, জানার প্রশ্নই ওঠে না।

"কেহ ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।" নিন্দার্থে এই শ্রীনিত্যানন্দকে কেউ চিনে না, তিনি কোন জাতিতে জন্মেছেন, তাও কেউ জানে না অর্থাৎ তিনি ছিলেন অজ্ঞাত কুলশীল। স্তুতি অর্থে– শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঈশ্বর তত্ত্ব বলে তাঁর জন্ম নেই বা সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর জাতিও নেই। যার জন্ম আছে তাঁর জাতি আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কেউ চিনতে পারে না। তাঁর তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। 'ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাতী।' নিন্দার্থে– শ্রীনিত্যানন্দ মত্ত হাতির ন্যায় সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। স্তুতি অর্থে– শ্রীকৃষ্ণ প্রেমমদিরা পানে মত্ত হয়ে মত্ত হাতির ন্যায় শ্রীনিত্যনন্দ সর্বত্র ঘুড়ে বেড়ান।

"ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত"– অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় আচার ভ্রষ্ট লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের ভাত খেয়েছেন। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মসমাজে অচল। কিন্তু এখানে এসে ব্রাহ্মণদের সঙ্গ করে ব্রাহ্মণদের আচার ভ্রষ্ট করেছেন। স্তুতি অর্থে– বিশ বছর যাবৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবনাদি পশ্চিম দেশে গিয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবলরাম রূপে বৃন্দাবনবাসী, মথুরাবাসী দ্বারকাবাসীদের ঘরে ঘরে ভাত খেয়েছেন। সেই বলরাম এখন শ্রীনিত্যানন্দ রূপে নবদ্বীপে এসে ব্রাহ্মণদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের কৃতার্থ করছেন। এখানে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাই প্রকাশিত হয়েছে। "শ্রীনিত্যানন্দ মদ্যপে করিব সর্বনাশ"। নিন্দার্থে– শ্রীনিত্যানন্দ সকলকে আচার ভ্রষ্ট করে জাতিকুল নষ্ট করে নিজের ন্যায় মদ্যপায়ী করে সর্বনাশ করবে। স্তুতি অর্থে– শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মদিরা পানরত এই নিত্যানন্দ সকলের সর্বনাশ করেছেন– অর্থাৎ জাত্যাভিমান নষ্ট করে সকলকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মদিরা পানে রত করিয়েছেন। এভাবে বলতে বলতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য কৃত্রিম ক্রোধের আবেশের অন্তরালে শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমে নৃত্য করতে

লাগলেন। অদ্বৈতাচার্যের হাস্যোদ্দীপক আচরণ দেখে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু হাসতে লাগলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্য যা বলেছেন তা শুনতে নিন্দাসূচক হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা ছিল স্তুতি। অদ্বৈতাচার্য প্রভু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে সেই স্তুতিকে নিন্দার আচরণে আবৃত করেছিলেন। এই ভঙ্গিটি ছিল সকলের কাছে হাস্যোদ্দীপক। শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্যের উক্তি ছিল প্রীতিময়ী। তাতেই নিত্যানন্দ হাসতে হাসতে অদ্বৈতকে প্রীতিময়ী উপেক্ষা সূচক অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়েছিলেন। অতঃপর অদ্বৈতাচার্য বাহ্য চেতনা প্রাপ্ত হয়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে আলিঙ্গন করলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসে নিত্যানন্দের ভূমিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র জীবোদ্ধারের জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় করলে নিত্যানন্দ প্রভু তা বুঝতে পারলেন। মহাপ্রভু শীঘ্রই গৃহত্যাগ করবেন জেনে নিত্যানন্দ প্রভু মহা দুঃখ ও বিষাদে মূহ্যমান হলেন। তারপর একসময় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে নিয়ে নিভৃতে গেলেন এবং তার হাত ধরে বসে হৃদয়ের কথা বলতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বললেন– আমি শিখা-সূত্র ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে জগজ্জীবকে উদ্ধার করব, গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করব। আমার মনের কথা তোমাকে বললাম। তুমি আমাকে যা করাও আমি তা-ই করি। তুমি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের বিধান দাও। মহাপ্রভু বললেন– "শ্রীপাদ, তুমি যদি জগতের উদ্ধার চাও তাহলে আমাকে এ কার্যে বাধা দিবে না এবং এ কার্যের জন্যে কখনো মনেও দুঃখ করবে না।" মহাপ্রভুর মুখে তাঁর সন্ন্যাসের কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তর যেন বিদীর্ণ হলো। তিনি যে কোন বিধি মহাপ্রভুকে দিবেন, সে সম্পর্কে কোনো বাক্যই তাঁর মুখে আসেনি। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।

নিত্যানন্দ প্রভু বললেন– "তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, কে তোমাকে নিষেধ করতে পারে? তুমি সর্বলোকনাথ, তুমি জানো জগতের কীভাবে উদ্ধার হবে। তুমি জগতের জন্য যা ইচ্ছা করবে তা-ই সুনিশ্চিত। তথাপিও তুমি একবার সকল ভক্তের নিকট তোমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করো। কে কী বলে, তা শ্রবণ করো। তারপর তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করো।" নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে আলোচনা করে মহাপ্রভু ভক্তগণের কাছে গেলেন।

মহাপ্রভু গৃহ ছাড়বেন জেনে নিত্যানন্দ প্রভু নির্বাক হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শচীমাতা কীভাবে প্রাণ ধারণ করবেন? কীভাবে দিবারাত্রি অতিবাহিত করবেন? এভাবে চিন্তা করতে করতে তিনি কখনো কখনো মূর্ছিত হতেন। আর কখনো বা শচীমাতার অসহায়তার কথা চিন্তা করে তিনি নির্জনে বসে কান্না করতেন। যেদিন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, সে দিন শচীমাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য ও মুকুন্দ– এই পাঁচজনকে জানাবার জন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্দেশ দিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত পাঁচজনের কাছে জানালেন। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পরের দিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গদাধর, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে কাটোয়ায়

কেশব ভারতীর আশ্রমে মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৩১ শকাব্দে মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে পূর্ণিমা তিথিতে কেশব ভারতীর নিকট পরম পবিত্র সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করেন। তারপর তিনদিন যাবৎ অনিদ্রায়, অনাহারে বৃন্দাবনে গমনাবেশে রাঢ়দেশে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু এ সময় প্রেমোন্মাদ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কোনো অনুসন্ধান ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ– এই তিনজন মহাপ্রভুর পশ্চাৎ অনুসরণ করেছিলেন। কতগুলো গোপবালক গোচারণকালে মহাপ্রভুকে দর্শন করে আনন্দে 'হরি হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করলেন। মহাপ্রভু তাদের অনেক ভাগ্যবান বলে প্রশংসা করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাদের গোপনে শিখিয়ে দিলেন যে, মহাপ্রভু তাদের কাছে বৃন্দাবন যাবার পথের কথা জিজ্ঞেস করলে যেন গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দেয়। পরে মহাপ্রভু তাদের কাছে বৃন্দাবনের পথ জানতে চাইলে শিশুরা গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিল।

নিত্যানন্দ প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্য রত্নকে বললেন– "তুমি শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতাচার্যকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের খবর জানিয়ে বল যে, তিনি যেন নৌকা নিয়ে এসে গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। আমি মহাপ্রভুকে নৌকায় তুলে শান্তিপুরে নিয়ে যাব। শান্তিপুর থেকে তুমি নবদ্বীপে গিয়ে আমার জননী ও ভক্তদের নিয়ে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে আসবে। চন্দ্রশেখরাচার্যকে পাঠিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে গমনাবেশে আবিষ্ট মহাপ্রভুর সামনে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। কারণ গত তিনদিন যাবৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও অন্যান্য সকলে মহাপ্রভুর পেছনে থাকলেও ভাবাবেশজনিত তন্ময়তা বশত মহাপ্রভু তাদের দেখতে পাননি। নিত্যানন্দ প্রভুর কথা শুনে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, "শ্রীপাদ তোমার কোথা থেকে আগমন।" নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বললেন, "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন যাব।" নিত্যানন্দের কথা শুনে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন–

প্রভু কহে, কতদূর আছে বৃন্দাবন। তেঁহো কহে কর এই যমুনা দর্শন ॥
এত বলি তারে নিল গঙ্গাসন্নিধানে। আবেশে প্রভুর হৈল যমুনা জ্ঞানে ॥

গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞানে মহাপ্রভু স্নান ও স্তব-স্তুতি করলেন। কিন্তু তখন পরিধানের জন্য সঙ্গে কোনো কৌপীন বা বহির্বাস ছিল না। এমন সময় অদ্বৈতাচার্য প্রভু নতুন কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে নৌকায় সেখানে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন–

তুমি ত অদ্বৈত গোসাই, হেথা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা ॥
আচার্য কহে, তুমি যাহা সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥

মহাপ্রভু গঙ্গাতীর শুনে চমকে উঠলেন। অদ্বৈতাচার্যের কথায় মহাপ্রভুর আবেশ কেটে গেল, তাঁর বাহ্য স্মৃতি ফিরে এলো। তারপর মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন–

প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥
আচার্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া একধার। পশ্চিমে যমুনা কহে পূর্বে গঙ্গাধার ॥
পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান। আর্দ্রকৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান ॥
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস।
একমুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছোঁ পাক। শুকা-রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক ॥

এভাবে বলার পরে অদ্বৈতাচার্য প্রভু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তিনদিন উপবাসের পর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈতাচার্যের ভবনে ভোজন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর জননী শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসেন। স্বীয় জননী শচীমাতাকে দর্শন করে শ্রীমন্মহাপ্রভু দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। এভাবে শচীমাতা ও মহাপ্রভুর মিলন হলো। তারপর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শচীমাতাকে গৃহ-মধ্যে নিয়ে গেলে নবদ্বীপ হতে আগত ভক্তগণের সাথে মহাপ্রভু মিলিত হলেন। ভক্তগণের সাথে শচীমাতা পরামর্শ করে মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকতে অনুমতি প্রদান করলে মহাপ্রভু তা শিরোধার্য করলেন। অদ্বৈত গৃহে দশদিন যাবৎ শচীমাতা রন্ধন করে মহাপ্রভুকে ভোজন করালেন। এ দশদিন যাবৎ সকল ভক্তগণের সাথে নৃত্য-কীর্তনে অতিবাহিত করে মহাপ্রভু সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত– এ চারজন মহাপ্রভুর সঙ্গে গমন করলেন।

মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে গমনের সময় পথে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় জগদানন্দ পণ্ডিত সময়ে সময়ে মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করতেন। সুবর্ণরেখা নদী তটে উপনীত হয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছে দণ্ড রেখে ভিক্ষা অন্বেষণে গমন করেন। দণ্ড হাতে নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন– "যে মহাপ্রভুকে আমি সর্বদা আমার হৃদয়ে বহন করি, তুমি কিনা সেই প্রভুকে তোমার বাহক সাজিয়ে তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করছ। হে দণ্ড, তুমি অপরাধ করছ। তুমি আর তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাবে না।" এই বলে নিত্যানন্দ রূপী বলরাম মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতিবশত দণ্ড ভেঙ্গে তিন খণ্ড করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যাঁকে গভীর প্রীতির সাথে হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দণ্ড বহন করে কষ্ট স্বীকার করবেন– তা নিত্যানন্দ প্রভু মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি দণ্ড ভেঙ্গে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে নিত্যানন্দের এই দণ্ড ভঙ্গ লীলা সামান্য মানব বুদ্ধির অগম্য, একমাত্র নিত্যানন্দ প্রভুই এর মর্ম জানেন।

তারপর জগদানন্দ এসে দণ্ডটি ভগ্ন অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন। "কে দণ্ড ভঙ্গ করল?" তা নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন–

আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে পারে কোন জনে ॥

এ কথা শ্রবণ করে জগদানন্দ কোনো প্রত্যুত্তর না করে ভাঙ্গা দণ্ড নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু দণ্ড ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞেস করলে জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দের নাম উল্লেখ করলেন। মহাপ্রভু তারপর নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর উত্তরে নিত্যানন্দ বললেন– "একখণ্ড বাঁশের টুকরো ভেঙ্গেছি, যদি আমাকে ক্ষমা করতে না পারো তাহলে শাস্তি বিধান করো। মহাপ্রভু বললেন, "যেখানে সকল দেবতার অবস্থান, তা তোমার

কাছে কী করে এক টুকরো বাঁশ হলো? আমি সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছি, এখন দণ্ডটিই ছিল একমাত্র সম্বল এবং সঙ্গী। আজ তা-ও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভেঙ্গে গেল। এখন আমার আর কারো সাথে সঙ্গ নেই। এই বলে মহাপ্রভু জলেশ্বরের দিকে রওনা হলেন।

শিবানন্দকে প্রহার

গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীধামে গমনের সময় শিবানন্দ সেন পথে তাঁদের সেবা করতেন। পথ চলাকালীন পথের সন্ধান, ঘাঁটি সমাধান, আহার, বাসস্থানাদি সবই শিবানন্দ সেন ব্যবস্থা করতেন। একদিন এক ঘাঁটিতে পথকর আদায়ের এক কর্মচারী পুরীগামী সকল ভক্তকেই আটক করলেন। শিবানন্দ সেন তখন পথকর দিবেন বলে সকলকে ছাড়িয়ে দিলেন এবং নিজে দেনা মিটাবার জন্য ঘাঁটিতে রইলেন। ঘাঁটি হতে তখন সকলে গিয়ে একটি গাছতলায় বসলেন। শিবানন্দ সেন ব্যতীত তাঁরা বাসস্থান ঠিক করতে পারলেন না। কারণ, শিবানন্দ সেন তখনো ঘাঁটিতে রয়েছেন। এদিকে নিত্যানন্দ প্রভু ব্রজগোপালের ভাবে ক্ষুধার্তের অভিনয় করে শিবানন্দের প্রতি গালি দিয়ে তাঁর পুত্রদের মৃত্যু হোক বলে অভিশাপ দিলেন।

পুত্রদের প্রতি নিত্যানন্দের এ অভিশাপ শ্রবণ করে শিবানন্দ পত্নী ব্যাকুল হয়ে কান্না করতে করতে শিবানন্দকে এ কথা বললেন। শিবানন্দ তাঁর পত্নীকে বললেন, নিত্যানন্দের দুঃখকষ্ট নিয়ে "মরুক মোর তিন পুত্র"। এ কথা বলে শিবানন্দ তখন নিত্যানন্দের কাছে গেলেন। শিবানন্দ উপস্থিত হওয়া মাত্রই নিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধের অভিনয় করে শিবানন্দের গায়ে পদাঘাত করলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর পদস্পর্শ পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করে তাঁর শ্রীচরণের মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন। শিবানন্দ তারপর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ ধরে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। শিবানন্দকে নিত্যানন্দ ক্রোধসূচক পদ প্রহার করলেও তাঁকে শ্রীচরণ রজ দানে এবং প্রেমালিঙ্গন প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে কৃতার্থ করলেন।

গৌড়দেশে আগমন

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সহায়ক। মহাপ্রভু যখন সমগ্র জীব জগতের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সঙ্গী হলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাত্রা করলেন। সেখানে কিছুদিন থেকে রথযাত্রা দর্শন করলেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিভৃতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন– "আমরা দুজন যদি পুরীতে অবস্থান করি, তাহলে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণের কী গতি হবে? অতএব আপনি শীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করে, সেখানকার ভক্তগণকে সুখী করে পাপী তাপী জীবগণকে উদ্ধার করুন।"

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজগণে ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/২৩০

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাম দাস, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরী দাস ও শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন

প্রথমে পানিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। ক্রমে গৌড়দেশবাসী ভক্তগণও সেখানে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্তন মহোৎসব করতে লাগলেন। একদিন রাঘব পণ্ডিতকে বললেন, "আজ কদম্ব ফুলের মালা পরিধান করব।" ভক্তগণ বললেন, "হে প্রভু, এখন কদম্ব ফুলের সময় নয়, কোথায় পাব?" নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, "দেখ বাগানে আছে।" ভক্তগণ বাগিচায় এলেন এবং দেখলেন জম্বীরের গাছে কদম্ব ফুল ফুটে আছে।

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছে অতি পরম-অতুল ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/২৮২

এক সময় নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিধান করার ইচ্ছা হলো। তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার উপস্থিত হলো।

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে। অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব–অলঙ্কার সেই ক্ষণে। উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/ ৩৩৩-৩৩৪

পানিহাটি গ্রামে কিছুদিন থাকার পর নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ গ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে শুভ বিজয় করলেন।

বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/৪৫৪

শ্রীনিত্যানন্দ কিছুদিন বণিক কুলকে উদ্ধার করে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য ভবনে আগমন করলেন।

দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/৪৭০

শ্রীনিত্যানন্দ কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থানের পর নবদ্বীপের মায়াপুরে শচীমাতাকে দর্শনের জন্য আগমন করলেন।

তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি। নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি ॥
সেই মতে সর্বদ্যে আইলা আই-স্থানে। আসি নমস্করিলেন আই চরণে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে দেখি শচী আই। কি আনন্দ পাইলেন –তা' অন্ত নাই ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/৪৯৬-৪৯৮

নিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে মহাসংকীর্তন বিলাস করতে লাগলেন। একসময় চোর-দস্যুদের দলপতি এক ব্রাহ্মণ কুমার নিত্যানন্দের অঙ্গে বিবিধ

অলঙ্কার দেখে তা হরণ করার মনস্থ করল এবং সঙ্গী চোর-দস্যুদের আহ্বান করল। চোরেরা প্রথম রাতে এসে দেখল, নিত্যানন্দের চারদিকে বহু ভক্ত বসে সংকীর্তন করছেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় এলো। নিত্যানন্দের পাশে কাউকে না দেখে দস্যুরা অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। প্রবেশ করা মাত্রই সকলে অন্ধ হয়ে গেল। আর ভয়ঙ্কর ঝড় বর্ষা আরম্ভ হলো। দস্যুরা আর কোথায় যাবে, সবাই অন্ধ হয়ে গড় খাইয়ের মধ্যে পড়ে মহা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে লাগল। সারারাত এভাবে কেটে গেল। সকাল হলো, ঝড় বর্ষা থেমে গেল। তখন দস্যুরা বুঝতে পারল, এসব নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব। সকলে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে এসে স্তব করতে লাগল–

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল। রক্ষা কর প্রভু, তুমি সর্ব জীব-পাল ॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ। পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥

–চৈ. ভা. অন্ত্য ৫/৬২৬,৬২৯

পানিহাটিতে রঘুনাথের দণ্ড মহোৎসব

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে দীনহীন পাপী সকলকেই প্রেমভক্তি দান করেন। তিনি যখন পানিহাটি গ্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিত গৃহে অবস্থান করছিলেন, সে সময় শ্রীহিরণ্য গোবর্ধন দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যনন্দ চরণে শরণাপন্ন হন।

পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন। গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডের উপর ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে। বসিয়াছেন যেন কোটি সূর্যোদয় করে ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হইয়াছে বেষ্টিত। দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥
দণ্ডবৎ হইয়া সেই পড়িলা কথোদূরে। সেবক কহে, 'রঘুনাথ' দণ্ডবৎ করে ॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দর্শন। আয় আয় আজি তোরে করিমু দণ্ডন ॥

প্রথম সাক্ষাতেই প্রভুর স্নেহের আহ্বান। যার ধন তাঁকে না জানিয়ে যদি কেউ নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তবে তাকে চোর বলে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সম্পত্তি। রঘুনাথ নিত্যানন্দকে না জানিয়ে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করে মহাপ্রভুর চরণ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। রঘুনাথ দুবার শান্তিপুর গিয়ে এবং তাঁর নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যাবার চেষ্টা করেছেন। এটাই রঘুনাথের নিত্যানন্দ ধন চুরির চেষ্টা। এখন নিত্যানন্দ প্রভুর হাতে ধরা পড়েছে, তাই তিনি রঘুনাথকে চোর বলে সম্বোধন করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি প্রভুর নিকট গেলেন না।

তখন নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে নিকটে এনে স্বীয় কোটি চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধারণ করে বললেন, "তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়াদধি ভোজন করাও।" নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে শ্রীরঘুনাথ দাস চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। সেই থেকে পানিহাটিতে চিড়াদধি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীরঘুনাথ দাসের সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়।

নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ বিবাহ

তারপর নবদ্বীপের অদূরে বড়গাছির শালিগ্রামের নিকট পণ্ডিত সূর্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবা নামে দুজন সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলা হয়েছে, "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রী বসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবী হলেন বারুণী ও রেবতীর অংশসম্ভূত এবং সূর্যের ন্যায় কুকদ্মির অবতার মহাত্মা সূর্যদাসের কন্যা। কেউ কেউ বসুধা দেবীকে 'কলাবাণী' ও শ্রীজাহ্নবাদেবীকে 'অনঙ্গমঞ্জরী' বলেন। বিবাহের পর নিত্যানন্দ প্রভু পত্নীদের সঙ্গে কিছুদিন কৃষ্ণদাসের গৃহে অবস্থানের পর নবদ্বীপে চলে আসেন। সেখানে শচীমাতার গৃহে উপস্থিত হয়ে স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে গেলেন। সীতা ঠাকুরাণী দুজনকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর শান্তিপুর থেকে পত্নীদ্বয়কে নিয়ে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের গৃহে গমন করেন। সেখানে কয়েকদিন সংকীর্তন শেষে খড়দহে গমন করেন।

অন্তর্ধান

১৫২২ খ্রিস্টব্দের দিকে নিত্যানন্দ প্রভু বসুধা-জাহ্নবাকে নিয়ে খড়দহে আসেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর খড়দহে আগমন, শ্রীহরিনাম প্রচার, বসবাস এবং প্রায় সর্বক্ষণ পরিকর বেষ্টিত সংকীর্তন ভক্তিরসধারার প্লাবনে সমগ্র সমাজকে এমনভাবে আন্দোলিত করেছিলেন, খড়দহ ক্রমশ এক মহাবৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়েছিল। খড়দহে কুঞ্জবাড়িতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসবাস করতেন। এ বাড়িতেই পুত্র বীরচন্দ্র প্রভুর এবং কন্যা গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব স্থান এখনো বর্তমান আছে। মহাপ্রভুর অপ্রকটে মুহ্যমান নিত্যানন্দ প্রভু একদিন তাঁর পত্নীদ্বয়কে নিয়ে জন্মভূমি একচক্রায় গমন করেন। শ্রীবঙ্কিমদেবের আদেশপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবঙ্কিমদেবের দেহে লীন হন। বৈষ্ণব দিগদর্শনীর মতে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে নিত্যানন্দ প্রভু নিত্যলীলায় গমন করেন।
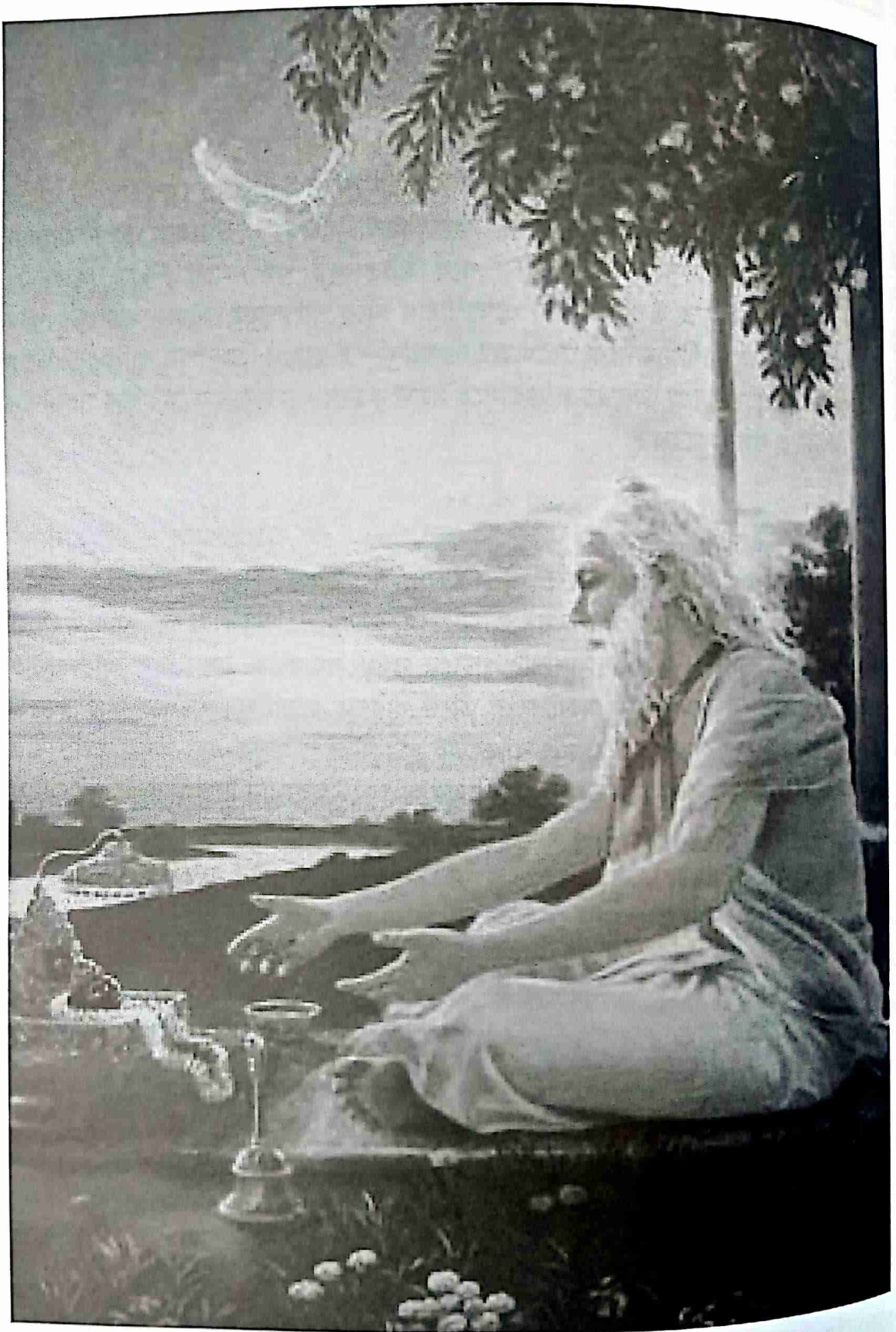
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য

পরিচয়

অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে গৌর আনা ঠাকুর নামেও অভিহিত করা হয়। তাঁরই আহ্বানে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর এ জগতে প্রকটিত হয়েছেন। তিনি মহাবিষ্ণু এবং সদাশিবের মিলিত প্রকাশ। তাঁর মঙ্গলময়ী লীলা দর্শন, শ্রবণ, কীর্তনে জীবের পরম মঙ্গল হয়। অদ্বৈতাচার্যের তত্ত্ব ও মহিমা সাধারণ জীবের ধারণার অতীত। এ সম্পর্কে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলা হয়েছে–

যশ্চ গোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
ননর্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা॥
একদা কার্তিকে মাসি দীপযাত্রামহোৎসবে।
সরামঃ সহগোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যতি যত্নবান্॥
নিরীক্ষ্য মদ্গুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান্।
প্রিয়েন নর্তিতুমারব্ধশ্চক্রভ্রমণলীলয়া॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভূৎ সদাশিবঃ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপালবিগ্রহঃ॥

–গৌ. গ. দী. ৭৭-৮০

অর্থাৎ ব্রজের আবরণরূপতত্ত্বপ্রযুক্ত যিনি সদাশিব ব্যূহ বলে প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর অদ্বৈত আচার্য। তিনি গোপালরূপী হয়ে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে নৃত্য করেছিলেন। এ বিষয়ে শিবতন্ত্রে ভৈরবের বাক্য– একদা কার্তিক মাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে রাম ও গোপালের সাথে শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান হয়ে নৃত্য করেছিলেন। তা দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হয়ে চক্রভ্রমণ লীলার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিবও দুপ্রকার হয়েছিলেন। এক মূর্তি সাক্ষাৎ শিব, অপর মূর্তি গোপাল বিগ্রহ।

শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় বলা হয়েছে–

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে॥

"যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এ জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্তা, ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য তাঁরই অবতার। হরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব বলে তাঁর নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি শিক্ষক বলে তাঁকে 'আচার্য' বলা হয়। সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হলেন মহাবিষ্ণুর অংশ, আর মহাবিষ্ণু হলেন তাঁর অংশী। অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুত অভেদ বশত মহাবিষ্ণুর সাথে শ্রীঅদ্বৈতের কোনো দ্বৈত বা ভেদ নেই

অর্থাৎ অভেদ। তাই তাঁর নাম অদ্বৈত। মহা প্রলয়ের পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীঅদ্বৈত সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান কলিযুগে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাথে অবতীর্ণ হয়ে জগতে ভক্তিধর্মের প্রবর্তন করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন– "মহাবিষ্ণু মায়ার দুই বৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু প্রকৃতিস্থ হয়ে জগতের নিমিত্ত কারণ, তাই বিষ্ণুরূপ; দ্বিতীয় রূপে প্রধানস্থ হয়ে রুদ্ররূপে শ্রীঅদ্বৈত।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখেছেন– "অদ্বৈতাচার্য প্রভু মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। নির্বোধেরা এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝতে না পেরেই আত্মবৃত্তি ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়।" অদ্বৈতাচার্যের অপর নাম 'শ্রীকমলাক্ষ'। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্যকে বৈষ্ণবদের মধ্যে অগ্রগণ্যরূপে ও শঙ্কররূপে বর্ণনা করেছেন–

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। অদ্বৈতাচার্য নাম সর্বলোক ধন্য ॥
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥
–চৈ.চ. আদি ২/৭৮-৭৯

মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আনুমানিক ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে পিতা কুবের পণ্ডিত ও মাতা শ্রীমতি নাভাদেবীকে আশ্রয় করে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীহট্টের নবগ্রামে আবির্ভূত হন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলা হয়েছে, "বিদ্যাম্বর গুহ্যকেশ্বর কুবের, যিনি মহাদেবের মিত্র ছিলেন, তিনিই এ যুগে কুবের পণ্ডিত, তিনিই মহাদেবের (অদ্বৈতের) জনক।' লাগল

বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট-নিকট নবগ্রাম। 'কুবের পণ্ডিত' তথা নৃসিংহসন্তান ॥
কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহাধন্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য ॥
তৈছে তাঁর পত্নী 'নাভাদেবী' পতিব্রতা। জগতের পুজ্যা, যেঁহো অদ্বৈতের মাতা ॥
–ভক্তিরত্নাকর ৫/২০৪১-৪৩

বাল্যলীলা

কুবের পণ্ডিতের পুত্র অদ্বৈতচন্দ্র সকলের আনন্দ বর্ধন করে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে ছ'মাস বয়সে উপনীত হলে কুবের পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী মহাসমারোহে পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। নামকরণের সময় জ্যোতিষী কুবের পণ্ডিতের পুত্রের বিবিধ লক্ষণ দর্শন ও কোষ্ঠী গণনা করে বিষ্ণু-অংশ জেনে 'কমলাক্ষ' নামকরণ করলেন। কমলাক্ষের বাক্য স্পষ্ট হতে শুরু করলে প্রথমেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। শিশুকাল থেকেই তিনি তাঁর গৃহদেবতা শালগ্রামের প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই ভোজন করতেন না। কৃষ্ণ প্রসাদেই তিনি অতিশয় আনন্দ পেতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সকলের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যারম্ভ হলে মাত্র এক মাসের মধ্যেই তিনি সমস্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করলেন।

পণাতীর্থের উৎপত্তি

শ্রীমতি নাভাদেবীর একবার গঙ্গাস্নানের বাসনা হয়। তিনি শেষরাতে স্বপ্নে দেখেন- তাঁর কোলের শিশুটি জ্যোতির্ময় চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু। এমন দিব্যরূপ দর্শন করে নাভাদেবী তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। ঐশ্বর্য ভাবান্বিতা মাতৃদেবীকে তিনি সান্ত্বনা প্রদান করে সমস্ত তীর্থ এনে তাঁকে স্নান করাবার কথা বলেন। শ্রীমতি নাভাদেবীর নিদ্রা ভঙ্গ হলে স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করে চিন্তামগ্ন হন। তিনি স্বপ্নের বিষয় প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে পুত্রের অনুরোধে তা প্রকাশ করে রোদন করতে থাকেন। আমি 'পণ' অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করে বলছি- তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি আজ রাতে সকল তীর্থকে আনয়ন করব, তাতে তুমি স্নান করবে। অদ্বৈত প্রভু রাতেই যোগাবলম্বনপূর্বক তীর্থগণকে আকর্ষণ করলেন। সমস্ত তীর্থ অদ্বৈত প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আহ্বানের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। অদ্বৈত প্রভু বলেন- "মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে (মহাবারুণি) তোমরা সকলে এখানে পর্বতোপরি বিহার করবে- সকলে আমার কাছে এই পণ করো। গঙ্গা-যমুনাদি সকল তীর্থই প্রভুর আজ্ঞা স্বীকার করে পর্বতে বিহার করতে থাকেন।

অদ্বৈতচন্দ্র প্রভাতকালে জননী নাভাদেবীকে বললেন- মা, পর্বতোপরি সমস্ত তীর্থ এসেছে, তুমি সেখানে গিয়ে স্নান করো। নাভাদেবী কৌতূহলবশত পুত্রসহ সেখানে যান। অদ্বৈতচন্দ্র জননী নাভাদেবীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। অদ্বৈত প্রভু তখন বলেন, "দেখ মা তীর্থের জল পড়ছে। এখানে এখন সকল তীর্থ অবস্থান করছে। ঐ দেখ মা মেঘের মতো যমুনার জল তোমাকে ভিজিয়ে ফেলছে, গঙ্গার পূণ্যসলিলবিন্দু তোমাকে সিক্ত করছে।" এভাবে অন্য সকল তীর্থের সলিলরাশি পতিত হতে থাকে। অতি আশ্চর্য এ দৃশ্য দেখে নাভাদেবীর বিশ্বাস হয় যে, সত্যই এখানে তীর্থসকল এসেছেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে তীর্থসমূহকে প্রণাম করে সেই জলে স্নান কন। সেই থেকে এ স্থান পণাতীর্থ নামে খ্যাত হয়।

কালিকা বিগ্রহের বিদারণ

কুবের পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের পৌগণ্ড বয়সে শুভদিনে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য ও অলঙ্কারে পারদর্শিতা লাভ করলেন। অদ্বৈতাচার্য রাজা দিব্যসিংহের পরমপ্রিয় সভাপণ্ডিত কুবেরের পুত্র হলেও তিনি কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত বলে তাঁর প্রতি রাজার বিশেষ বিরাগ ছিল। একবার কালিপূজায় রাজা দিব্যসিংহ তাঁর পরিকরসহ উচ্চ আসনে বসে আছেন। এমন সময় অদ্বৈতাচার্য এসে কালী মাতাকে প্রণাম না করেই সভায় প্রবেশ করলেন। রাজা ক্রোধিত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করলেন। অদ্বৈত আচার্য রাজাকে বললেন, শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র আরাধ্যদেব এবং তাঁকে আরাধনা করলে আর কাউকে আরাধনা করার প্রয়োজন হয় না। তখন রাজাও পাল্টা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করলে অদ্বৈতাচার্য তাঁর যুক্তিসমূহ খণ্ডন করেন। কুবের পণ্ডিত রাজার এমন অবস্থা দেখে কালী মাতাকে প্রণাম করার আজ্ঞা দিলেন। পিতার বাক্য শুনে অদ্বৈতাচার্য

কালীমাতাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করামাত্রই দেবী হঠাৎ অন্তর্ধান হলেন এবং দেবী মূর্তির অঙ্গ বিদীর্ণ হলো। মহাবিষ্ণু ও সদাশিবের অবতার অদ্বৈতাচার্যের প্রণাম দেবী কী করে গ্রহণ করবেন! রাজা তখন অদ্বৈতাচার্যের নিকট বিনীতভাবে স্তুতি করে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলেন। অদ্বৈতাচার্য তখন বললেন, "আমি কৃষ্ণদাস, ক্ষুদ্রজীব, আমাকে স্তুতি করবেন না। আপনি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করেছেন আর দেবী কখনো কৃষ্ণনিন্দা সহ্য করেন না।

মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ

অদ্বৈতাচার্য চৌদ্দ বছর বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হন। কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী অপ্রকট হলে অদ্বৈতাচার্য পিতামাতার পারলৌকিককৃত্য করার জন্য গয়া-যাত্রার ছলে সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবন ধামে এসে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় নিমগ্ন হলে জানতে পারলেন কৃষ্ণ নবদ্বীপে আবির্ভূত হবেন। তীর্থ ভ্রমণকালে বিহারে মিথিলায় বিদ্যাপতির সাথে অদ্বৈতাচার্যের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাপতির সাথে মিলন-প্রসঙ্গটি 'শ্রীঅদ্বৈতবিলাস' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অদ্বৈতাচার্য বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশে ফিরে নবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থানের পর শান্তিপুরে শুভ আগমন করেন। বিরহকাতর শান্তিপুরবাসী ভক্তগণ বহুদিন পর অদ্বৈতাচার্যের দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হলেন।

শান্তিপুর এসে গঙ্গাতীরে তিনি একটি ভজন স্থান নির্মাণ করে সেখানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। ক্রমে ক্রমে সেখানে বহু শ্রোতার আগমন ঘটতে লাগল। কিছুদিন পর মাধবেন্দ্রপুরী চন্দন আনার জন্য পুরী গমনকালে শান্তিপুরে এলেন। সেখানে অদ্বৈতাচার্যের সাথে তাঁর মিলন হয়। দুজনের মিলনে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মাধবেন্দ্রপুরী তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অদ্বৈতাচার্যকে দৃঢ় আলিঙ্গন করেন। অদ্বৈতাচার্য প্রভু তাঁর দুষ্টচিত্ত শোধনের জন্য মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে প্রার্থনা জানান ।

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্যের ঘরে। পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে ॥
তাঁর ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া। চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/১১০-১১১

মাধবেন্দ্রপুরী গোপালের চন্দন সংগ্রহের আদেশের কথা অদ্বৈতাচার্যকে জানান। "তাঁর আদেশেই আমি চন্দন আনার জন্য বের হয়েছি। তাঁর আদেশেই আমি তোমার কাছে এসেছি।" অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনায় মাধবেন্দ্রপুরী সেখানে কিছুদিন অবস্থানপূর্বক কৃষ্ণকথায় দিন অতিবাহিত করেন। তখন অদ্বৈত-ভবনে মদনগোপালের অভিষেক হয়। এ সময় অদ্বৈতাচার্য প্রভু মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর অদ্বৈতাচার্য প্রেমে বিহ্বল হন। তারপর মাধবেন্দ্রপুরী চন্দন আনার জন্য দক্ষিণ দেশে গমন করেন। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হরিদাস ঠাকুরের সাথে মিলন

একদিন অদ্বৈতাচার্য প্রভু ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক সৌম্য দর্শন তরুণ অদ্বৈতাচার্যের কাছে এসে বিনীতভাবে নিজেকে ম্লেচ্ছ পরিচয় দিয়ে দৈন্যোক্তি করতে লাগলেন। হরিদাসের বাক্য শ্রবণ করে তিনি তাঁকে এখানে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করতে বললেন। হরিদাস আচার্যের আশ্রয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, দর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ভাগবত অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। অদ্বৈতাচার্য প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে নাম ভজনের অদেশ দিলেন। হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করতেন।

অদ্বৈতাচার্য হলেন লোকশিক্ষক। তাঁর আচরণ যে সর্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত এবং হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবের ভোজন যে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনতুল্য, তা সাধারণলোককে বোঝাবার জন্য কেবল বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের ভোজ্য শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাস ঠাকুরকে অর্পণ করলেন।

আচার্য কহেন তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন। এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন।

–চৈ.চ. অন্ত্য ৩। ২১৯-২০০

হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করালে শান্তিপুরবাসী অদ্বৈতাচার্যের নিন্দা করতে লাগলেন। নিন্দা শুনে অদ্বৈতাচার্য হরিদাসকে তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে বললেন। তাঁর নির্দেশমতো ব্রহ্মার অবতার হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরের সমস্ত অগ্নি হরণ করলেন। সমগ্র শান্তিপুরে অগ্নির অভাব হলো। অন্য গ্রাম থেকে আগুন আনলে তা-ও নিভে যাচ্ছে। কোনো গৃহেই রান্না করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন সকলে একত্র হয়ে এর কারণ নির্ণয় করলেন, অদ্বৈতাচার্যের নিকট অপরাধের ফলেই এমন হচ্ছে। তখন সকলে মিলে অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করলেন। অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরের শতশত ব্রাহ্মণকে বললেন, "তোমাদের মুখেই তো অগ্নি, তা দিয়ে তোমরা অগ্নি প্রজ্জ্বলন করো।" সকলে তাঁদের অক্ষমতায় লজ্জিত হলো। অদ্বৈতাচার্য বললেন, "তোমরা হরিদাসের মহিমা না জেনেই যবন বলে তাঁর নিন্দা করেছো। তাই তাঁর চরণে তোমাদের অপরাধ হয়েছে। হরিদাস সাক্ষাৎ ব্রহ্মার অবতার, তাই তোমাদের গৃহের সব আগুন হৃত হয়েছে। তারপর সবাই হরিদাস ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে হরিদাস ঠাকুর তৃণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলন করলেন।

বিবাহ লীলা

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নিজস্বরূপের সম্পূর্ণতা প্রকাশের জন্য শক্তি-গ্রহণলীলা করলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর 'সীতাদেবী' ও 'শ্রীদেবী' নামে দুই কন্যা ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর নৃসিংহ ভাদুড়ী বিবাহযোগ্যা দুই কন্যাকে নিয়ে চিন্তায় পড়লেন একদিন তিনি তাঁর দুই কন্যাকে ভগবতী স্বরূপে এবং অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে সদাশিবের রূপে দেখতে পেলেন। স্বপ্ন দর্শন করে শ্যামদাস আচার্যের কাছে গেলে শ্যামদাস আচার্য অদ্বৈত প্রভুর কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা জানান। তারপর অদ্বৈতাচার্য প্রভু নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যার পাণি গ্রহণ করলেন।

আচার্যের ভার্যা দুই জগৎ পূজিতা।
সর্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর সীতা ॥

–ভক্তিরত্নাকর ১২/১৭৮

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশতঃ ॥

–গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৮৬

"ভগবতী-যোগমায়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী 'সীতাদেবী' এবং তাঁর প্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হলেন।"

মহাপ্রভুর অবতরণের জন্য প্রার্থনা

বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভক্তিকল্পতরুর মালাকার ও দাতাভোক্তারূপে মূলবৃক্ষ। শ্রীনবদ্বীপধামে তা প্রথমে রোপিত হয়। পরবর্তীতে পুরুষোত্তমধাম, বৃন্দাবনধাম আদি স্থানে প্রেমফলোদ্যানের বৃদ্ধি হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ হলেন ভক্তিকল্পবৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তাঁর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীতে ঐ অঙ্কুর পুষ্ট হয়। মহাপ্রভু মালী হয়েও আবার অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ হলেন। মূল স্কন্ধের উপরে রয়েছেন শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ।

বৃক্ষের উপরে শাখা হলো দুই স্কন্ধ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ' ॥

–চৈ.চ. আদি ৯/২১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু (অঙ্গ) অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ (উপাঙ্গ) এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দসহ অবতীর্ণ হয়ে জগতে হরিভক্তি প্রচার করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর পার্ষদগণের আবির্ভাব। অদ্বৈতাচার্য আবির্ভূত হয়ে দেখলেন কলির প্রথম সন্ধ্যায় অনাচারের প্রাবল্য এবং জগৎ কৃষ্ণভক্তিশূন্য হয়েছে। এ অবস্থায় কোনো অংশাবতার অবতীর্ণ হয়ে জগতের মঙ্গল করতে পারবেন না। "সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেই জগতের কল্যাণ হবে" –এরূপ চিন্তা করে অদ্বৈতাচার্য গঙ্গাজল-তুলসী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের পূজাবিধান করে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের অবতরণের জন্য হুঙ্কার করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রেমহুঙ্কারেই গোলোকবিহারী শ্রীহরি অবতীর্ণ হতে ইচ্ছা করলেন ।

গঙ্গাজলে, তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু ॥

–চৈ.চ. আদি ৩/১০৮-১০৯

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করে তিনি প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল অর্পণ করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এ জগতে অবতরণ করানোর জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি হুঙ্কার করতেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভগবান এ ধরাধামে অবতরণ করেছিলেন। এতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের মুখ্য কারণ হচ্ছে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আকুল প্রার্থনা। এভাবেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে ধর্মসেতু (যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন) আবির্ভূত হন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে–

জয় জয় অদ্বৈতআচার্য দয়াময়। যাঁর হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ। সে জন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন॥

—ভক্তিরত্নাকর ১২/৩৭৬১-৩৭৬৪

তুলসীমঞ্জরীসহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুতূহলে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ। ভক্তিবেশে আপনে যে হইয়া সাক্ষাৎ॥

—চৈ. ভা. আদি ২/৮১-৮৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশে একচক্রাধামে শ্রীহাড়াইপণ্ডিত ও পদ্মাবতীদেবীকে বাৎসল্যরসের সেবা প্রদান করে শ্রীবলদেব অভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ হলেন। নবদ্বীপের মায়াপুরে শচী-জগন্নাথ মিশ্রের আটটি কন্যা পরপর অন্তর্ধান লীলা প্রকট করলে বিশ্বরূপের আবির্ভাব হলো। তারপর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ কালে নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্তনপিতা অবতারী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হলেন। গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের পর অদ্বৈতাচার্য প্রভুর অনুমতি নিয়ে তাঁর ভার্যা সীতাদেবী শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ-মায়াপুরে উপহার নিয়ে বালক-শিরোমণি গৌরগোপালকে দর্শনের জন্য এলেন এবং ধান-দুর্বা তাঁর মস্তকে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—

অদ্বৈত-আচার্য-ভার্যা, জগৎপূজিতা-আর্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী'।
আচার্যের আজ্ঞা পাইয়া গেল উপহার লইয়া,
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥

— চৈ.চ. আদি ১৩/১১১

শাস্ত্রশিক্ষা প্রদান

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপের শ্রীমায়াপুরে সংস্কৃত টোল তৈরি করে শাস্ত্রানুশীলন লীলা প্রকট করলেন। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে অদ্বৈতসভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে যেতেন। সেখানে অদ্বৈত প্রভু যখন পূজা করতেন, তখন বিশ্বরূপ সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য যে কৃষ্ণভক্তি, তা ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে অদ্বৈতাচার্য প্রভু তাঁর ইষ্টদেবতার পূজা ছেড়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করতেন। "সংসার অনিত্য এবং মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণভজন" —এরূপ বিচার করে বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেন। বালক নিমাই অগ্রজ বিশ্বরূপকে খাওয়ানোর জন্য ডেকে নিয়ে আসতো। অদ্বৈতাচার্য নিমাইয়ের অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ হতেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারতেন না যে, নিমাই-ই তাঁর আরাধ্য ইষ্টদেব।

অদ্বৈতাচার্য প্রভু তীর্থ পর্যটনকালে বৃন্দাবনে 'শ্রীমদনগোপাল'-এর সেবাভার প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষের নিচে অদ্বৈত প্রভু অবস্থান করেছিলেন, তা 'অদ্বৈতবট' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এটি শ্রীমদনমোহন-মন্দির দ্বাদশাদিত্যটিলার নিকটবর্তী।

যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্বত্র হইল সে 'অদ্বৈতবট' খ্যাতি॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫/২০৯১

পিতামাতা বিবাহের আয়োজন করছেন দেখে বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নামে খ্যাত হলেন। শ্রীশচী-জগন্নাথ এবং ভক্তগণ বিশ্বরূপের বিরহে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বিরহে কাতর হলেও 'শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্র প্রকটিত হবেন এবং ভক্তগণের দুঃখ দূর করবেন'– এ কথা বলে সকলকে সান্ত্বনা দিতেন।

ঈশ্বরপুরীর সাথে মিলন

শ্রীবিশ্বরূপ গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শচী-জগন্নাথ ভীত হয়ে নিমাইয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দিলেন। পরে নিমাইয়ের দত্তাত্রেয়ভাবে কথিত মধুর বাণী শুনে ও শিক্ষা লাভ করে পুনরায় নিমাইকে তাঁরা পাঠে নিযুক্ত করলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর নিমাই বিদ্যারসে নিমগ্ন হলে জগন্নাথ মিশ্র অন্তর্ধান হলেন। ক্রমশ নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ পর্যটনকালে নবদ্বীপে এসে গৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হলেন। বিদ্যাবিলাসী শ্রীগৌরসুন্দরের সাথে বল্লভতনয়া লক্ষ্মীদেবীর শুভবিবাহলীলা সম্পাদিত হলো। ঐ সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপ-মায়াপুরে নিজভবনে শাস্ত্রালোচনা ও কৃষ্ণকথা কীর্তন করতেন। বৈষ্ণবগণের প্রিয় সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া শ্রীমুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তন শুনে অদ্বৈতাচার্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সকলেই পরম উল্লসিত হতেন। একদিন শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপে এসে অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরপুরীর অপূর্ব তেজ দেখে তাঁকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলে জানতে পারলেন। পরে অবশ্য ঈশ্বরপুরীপাদের সাথে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মিলন হলো–

হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী। আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি ॥
কৃষ্ণ-রসে পরম বিহ্বল মহাশয়। একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় ॥
তাঁ'ন বেশে তাঁ'নে কেহ চিনিতে না পারে। দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥

–চৈ.ভা. আ. ১১/৭০-৭২

মহাপ্রভু কর্তৃক অদ্বৈতকে আনয়ন

গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পর গৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহজনিত উৎকণ্ঠা ও প্রেমবিকারের কথা শুনে অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস এবং অন্যান্য ভক্তগণ পরম আনন্দিত হলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দ প্রভুকে ব্যাসপূজা করার জন্য ইঙ্গিত করলে নিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে ব্যাসপূজার আয়োজন হলো। ব্যাসপূজার অধিবাস দিনে মহাপ্রভু উপস্থিত সকলকে নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ দেখালেন এবং 'নাড়া' 'নাড়া' বলে অদ্বৈতকে আহ্বান ছলে নিজ অবতারধর্ম প্রকাশ করলেন–

অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার। মোর কর্ণে বাজে আসি নাড়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিনু মুই ক্ষীরোদ-সাগরে। জাগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ॥

–চৈ.ভা. অন্ত্য ৯/২৯৭-২৯৮

শ্রীবাস-অঙ্গনে ব্যাসপূজা সমাপ্তির পর মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাস পণ্ডিতের ছোট ভাই রামাই পণ্ডিতকে (শ্রীরাম পণ্ডিত) নিজপ্রকাশবার্তা জানাবার জন্য অদ্বৈতাচার্যের নিকট প্রেরণ করলেন। অদ্বৈতাচার্য যে গোলোকপতি শ্রীহরিকে ধরাধামে অবতীর্ণ করার জন্য গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়ে পূজা করে সকাতরে আহ্বান করছিলেন, তিনি প্রকটিত হয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও নবদ্বীপে শুভাগমন করেছেন। সুতরাং অদ্বৈতাচার্য যেন সস্ত্রীক পূজার উপকরণসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর নিকট দ্রুত এসে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর নির্দেশক্রমে রামাই পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের কাছে পৌঁছে সকল কথা জানালেন। অদ্বৈত প্রভু রামাইর নিকট মহাপ্রভুর প্রকাশবার্তা শুনে পত্নী সীতাদেবী, পুত্র অচ্যুতানন্দ এবং অন্যান্য অনুচরবর্গসহ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করার জন্য পথে শ্রীনন্দনাচার্য-ভবনে সঙ্গোপনে থাকলেন। এ কথা মহাপ্রভুকে জানাতে রামাইকে নিষেধ করলেও সর্বান্তর্যামী মহাপ্রভু সবই জানতে পারলেন। মহাপ্রভু সকলের সামনে বিষ্ণুখট্টায় নিজ ঐশ্বর্যরূপ প্রকট করলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছত্র ধারণ করলেন, গদাধর সহ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ নানাবিধ সেবায় নিয়োজিত হলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে শীঘ্রই আনার জন্য রামাইকে নন্দনাচার্য-ভবনে প্রেরণ করলেন। মহাপ্রভু সবই জানতে পেরেছেন বুঝে অদ্বৈতাচার্য তাঁর পাদপদ্মে উপনীত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করলেন। মহাপ্রভুর অপূর্ব মহৈশ্বর্য দেখে অদ্বৈতাচার্য স্তম্ভিত হলেন। তিনি মহাপ্রভুর চরণ ধৌতপূর্বক পঞ্চ-উপাচারে পূজা করে এই মন্ত্রে প্রণাম করলেন–

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে নৃত্য করতে আদেশ করলেন। অদ্বৈতাচার্য উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তনে প্রমত্ত হলে ভক্তগণ দেখে চমৎকৃত হলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন–

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব–'সর্বারাধ্য' করি মানি। চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব–'আরাধক' জানি।
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। 'শুদ্ধভক্ত' তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার। 'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি গণন যাঁহার ॥
–চৈ.চ. আদি ৭/১৪-১৭

পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তস্বরূপ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ভক্তাবতার–বিষ্ণুতত্ত্ব। মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য বিষ্ণুতত্ত্ব হয়েও ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় 'ভক্তাবতার'। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের ঈশ্বরত্বের জন্য তাঁদের চরণে তুলসী অর্পিত হয়। অদ্বৈতাচার্যের কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা লাভ করা হয় না–

দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
–শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

মহাপ্রভুর গুরুবুদ্ধিতে দুঃখ

শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে গীতার তাৎপর্য শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট ॥

–চৈ.ভা. মধ্য ১০/১৬৬

ভগবানের, গুরুবর্গের ও বৈষ্ণবের শাসনলাভ জীবের পক্ষে যে অতিশয় মঙ্গলকর ও সৌভাগ্যের বিষয়, তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অদ্বৈতাচার্য এক অদ্ভুতলীলা করলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে তা বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন– "অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই, সেজন্য প্রভুর স্বীয় দাস হলেও মহাপ্রভু তাঁকে গুরুর মতো ভক্তি করেন। অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর এরূপ গৌরব প্রদানকার্যে দুঃখিত হয়ে মহাপ্রভুর দণ্ড প্রসাদ নেওয়ার জন্য শান্তিপুরে গিয়ে কতগুলো দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তা শুনে মহাপ্রভু ক্রোধাবিষ্ট হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত প্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করলেন। সেই প্রহার লাভ করে অদ্বৈত প্রভু এই বলে নাচতে লাগলেন– "দেখ, আজ আমার বাঞ্ছা সফল হলো। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্বক আমাকে গুরু জ্ঞান করতেন, আজ নিজদাস ও শিষ্য জ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্মতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন।" অদ্বৈতাচার্যের এ ভঙ্গি দেখে প্রভু লজ্জিত হয়ে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন।

আচার্য-গোসাইরে প্রভু করে গুরু ভক্তি। তাহাতে আচার্য বড় হয় দুঃখমতি ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥
তবে আচার্য-গোসাইর আনন্দ হইল। লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥

–চৈ.চ. আদি ১৭/৬৬-৬৮

পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান। দুঃখ পাই মনে আমি কৈলুঁ অনুমান ॥
মুক্তি–শ্রেষ্ঠ করি কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥

–চৈ.চ. আদি ১২/৩৯-৪০

শ্রীশচীমাতার অপরাধ ও তা খণ্ডন

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাস মন্দিরে বিষ্ণু খট্টায় বসে প্রেম প্রাপ্তির বরদান করতে আরম্ভ করলেন। যদিও ভক্তগণ সকলেই গৌরাঙ্গের প্রেমের পাত্র, সকলেই মহাপ্রেমিক, তথাপি প্রেমরূপ মহাসমুদ্রের একেক রত্ন একেক দিন মহাপ্রভু কৃপা করে আবিষ্কারপূর্বক বিতরণ করেন। সেদিন শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সেই অপূর্ব প্রেম শচীমাতাকে আস্বাদন করাতে অনুরোধ করলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন–

প্রভু বলে ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস। তাঁরে না দিমু প্রেম ভক্তির বিলাস ॥
বৈষ্ণবের ঠাই তান আছে অপরাধ। এতএব তান হৈল প্রেমভক্তি বাধ ॥

মহাপ্রভু বললেন– বৈষ্ণব অপরাধীর পক্ষে প্রেমভক্তি দুর্লভ। শ্রীবাস বললেন– "তুমি যাঁর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছো, তাঁর অপরাধ থাকতেই পারেনা। যদি কোনো বৈষ্ণবের প্রতি তাঁর অপরাধ থাকে, তা খণ্ডন করে তাঁকে কৃপা করো।" তখন মহাপ্রভু বললেন– শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের

নিকট তাঁর অপরাধ আছে, কিন্তু আমি তা খণ্ডন করতে পারি না। শ্রীঅদ্বৈতার্যের চরণধুলি মাথায় নিলে তিনি যদি অপরাধ ক্ষমা করেন, তাহলে তাঁর প্রেমভক্তি লাভ হতে পারে। তখন সকলে মিলে শ্রীঅদ্বৈতের কাছে গিয়ে সমস্ত বিবরণ বললেন। তখন অদ্বৈতাচার্য বিষ্ণু স্মরণ করে বললেন– "ও কথা মুখে এনো না। যাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে ভগবান পরম স্বতন্ত্র হয়েও তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন, জগন্মাতা বিষ্ণুভক্তির মূর্তিমতী পরম বৈষ্ণবী শ্রীশচীমাতার কখনো অপরাধের সম্ভাবনা থাকতে পারে? দেবকী-যশোদাস্বরূপা 'আই' নাম কেউই মুখে স্মরণ করলে সর্বদুঃখ বিমোচন হয়। আমি তাঁর পদধুলি পেলে কৃতার্থ হই। এ কথা বলতে বলতে 'আই'-এর তত্ত্বে আবিষ্ট হয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সময় বুঝে শচীমাতা সেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পদধুলি মস্তকে ধারণ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনিও বিহ্বল হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলেন। এভাবে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরণধুলি গ্রহণ করা মাত্রই শচীমাতার অপরাধ দূরীভূত হলো এবং তখন তাঁর মধ্যে প্রেমভক্তির উদয় হলো। তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। নিজ জননীকে উপলক্ষ করে বৈষ্ণব অপরাধ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধক জীব সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পূর্বে মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ সর্বদাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর নিকট থাকতেন। কিছুদিন পর তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। শ্রীশচীমাতা তখন দুঃখিত হয়ে ভাবলেন বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গক্রমে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। বৈষ্ণব অপরাধের ভয়ে শচীমাতা কিছু বললেন না। বিশ্বম্ভরকে নিয়ে সব ভুলে গেলেন। মহাপ্রভু আবার যখন প্রকাশাদি আরম্ভ করলেন তখন সর্বক্ষণ শ্রীঅদ্বৈতের কাছে অবস্থান করে কৃষ্ণকথায় রত হলেন। এ প্রকার অবস্থা দর্শন করে শ্রীশচীমাতা বলেছিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এক পুত্রকে গৃহ ত্যাগ করিয়েছেন, এখন বুঝি বিশ্বম্ভরকেও গৃহত্যাগী করবেন।

পুত্র শ্রীবিশ্বম্ভরের গৃহত্যাগের সম্ভাবনা মনে করে দুঃখে শচীমাতা বলেছিলেন– "*কে বলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাই*। এক পুত্রকে বের করে দিলেন, আবার এ পুত্রকেও ঘরে স্থির থাকতে দেন না। আমি 'অনাথিনী' আমার প্রতি একটু দয়া নেই। জগতের কাছে তিনি অদ্বৈত। আমার কাছে তিনি 'দ্বৈত মায়া'।" শ্রীশচীদেবীর এই মাত্র অপরাধ। এর জন্য বিশ্বম্ভর নিজ মাতা শ্রীশচীদেবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রেম প্রদানে বিরত থাকলেন। নিজ মাতাকে লক্ষ্য করে জগতের শিক্ষাগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ও তা খণ্ডনের উপায় জানিয়ে জীবগণকে বৈষ্ণব অপরাধের কবল হতে রক্ষা করার কৌশল প্রদর্শন করলেন।

বিশ্বরূপ দর্শন

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু একদিন মহা আর্তিভরে গোপীভাবে ভক্তগণসহ নৃত্য-কীর্তন করতে লাগলেন। তাঁর আর্তির আর বিশ্রাম হয় না। প্রহর অতিক্রান্ত অতীত হলে ভক্তগণ কোনো প্রকারে স্থির করে গৃহে চললেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ গঙ্গা স্নানে চললেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর আর্তিযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে একাকী শ্রীবাস অঙ্গনে বারবার গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভু তখন নিজ গৃহে ছিলেন। নিজ গৃহে থেকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর আর্তির কথা জানতে পেরে তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভুর তারপর অদ্বৈতাচার্যকে

নিয়ে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার বন্ধ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– আচার্য, তোমার ইচ্ছা কী? তুমি কী চাও? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য বললেন– হে প্রভু, তুমি সর্ববেদ-বেদান্তের সার- এ কথা আমি নিশ্চিতরূপে জানি। তথাপি কিছু বৈভব দর্শন করতে চাই।

অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু, পূর্বে অর্জুনেরে। যাহা দেখাইলা তথি ইচ্ছা বড় ধরে ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখে পুনঃ পুনঃ। সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জুন ॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন। পোড়ে যত পতঙ্গ-পাষণ্ড দুষ্টগণ ॥
যে পাপিষ্ঠ পরনিন্দে পরদ্রোহ করে। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে ॥

পূর্বে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সেই রূপ দেখতে পেলেন। এক সুদৃশ্য রথ চারদিকে সৈন্যদলে বেষ্টিত মহাযুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজিত। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু রথের উপর শ্যামল সুন্দর, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ দর্শন করলেন। চন্দ্র, সূর্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবন, কোটি চক্ষু, বাহু ও মুখ বারবার দেখলেন এবং আরো দেখলেন সামনে অর্জুন স্তুতি করছেন। সেই শ্যামল সুন্দর রূপের বদনসকলে যেন মহা অগ্নি জ্বলছে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সেই রূপ দর্শনে দন্তে তৃণ ধারণ করে কান্না করতে লাগলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পর্যটন সুখে নগর ভ্রমণে রত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর উক্ত প্রকাশের বিষয় অবগত হয়ে সাথে সাথে শ্রীবাস অঙ্গনে এসে বিষ্ণুগৃহের দ্বারে প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আগমন জেনে তাঁকেও ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেখলেন যে, পরিপূর্ণতম শ্রীগৌরাবতারের বিশ্বে প্রকাশিত গৌণ-লক্ষণ-রূপ এক অঙ্গ 'বিশ্বরূপ' দর্শন করে চক্ষুমুদ্রিত করে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে পড়লেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তুলে বললেন– "তুমি আমার সকল অবতার সম্বন্ধে জানো। তোমার কৃপায় আমার দর্শন জীবের পক্ষে সুসম্পন্ন হয়। তুমি এবং অদ্বৈতাচার্য উভয়েই আমার পূর্ণ অবতারীত্ব জ্ঞাত আছ।" শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে উভয়ে নৃত্য আরম্ভ করলেন।

মহাপ্রভুর অদ্বৈত ভবনে বিলাস

শ্রীবাসভবনে ও ভাগীরথী-তীরে নগরসংকীর্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তনের সঙ্গী হলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী। সবে মিলি গায় হই মহা-কুতূহলী ॥
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়। আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায় ॥

–চৈ.ভা. মধ্য ২৩/২৯-৩০

ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়। আগে পাছে 'হরি' বলি সর্বলোকে-ধায় ॥
আচার্য গোসাই আগে জন কত লইয়া। নৃত্য করি চলিলেন পরমানন্দ হইয়া ॥

–চৈ.ভা. মধ্য ২৩/২০২-৩

কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হলে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর অপূর্ব সন্ন্যাসমূর্তি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে প্রদর্শনের জন্য কয়েকটি বালকের মাধ্যমে বৃন্দাবনের পরিবর্তে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরের দিকে মহাপ্রভুকে চতুরতার সাথে নিয়ে এলেন। মহাপ্রভু গঙ্গা দর্শন করে যমুনা ভেবে উৎফুল্ল হলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে আসছেন সংবাদ পেয়ে অদ্বৈতাচার্য নৌকাযোগে বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্যকে দেখে মহাপ্রভু আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, তিনি বৃন্দাবনে, তা অদ্বৈতাচার্য কী করে জানলেন? "মহাপ্রভু যেখানে থাকেন সে স্থানই বৃন্দাবন এবং গঙ্গার পশ্চিম প্রবাহ যমুনা"– অদ্বৈতাচার্যের এরূপ উক্তিতে মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন তাঁকে চতুরতার সাথে শান্তিপুরের পশ্চিমপাড়ের গঙ্গায় নিয়ে আসা হয়েছে। অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুকে স্নান ও বস্ত্র পরিধান করিয়ে শান্তিপুরে নিজগৃহে নিয়ে এলেন। শান্তিপুরে মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ জানতে পেরে শচীমাতা এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্যের গৃহে এসে সমবেত হলেন। সকলেই মহাপ্রভুর অপূর্ব সন্ন্যাসমূর্তি দর্শন করে বিরহ-সুখ অনুভব করলেন। অদ্বৈতশক্তি সীতাঠাকুরাণীর রন্ধনকৃত ও বত্রিশটি আঠিয়া কলার অখণ্ড কলাপাতায় পরিবেশিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করতে থাকলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে অদ্বৈতাচার্যের বহুপ্রকার রহস্য আলাপ হয়। প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরে পুত্রবিরহে কাতর শচীদেবীর দুঃখ দূর করার জন্য মহাপ্রভু শচীদেবীর পাচিত (রান্না করা) দ্রব্যও সেখানে ভোজন করেছিলেন। ভক্তগণের সমাবেশ ও মহোৎসবে শান্তিপুরের অদ্বৈতভবন বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হলো।

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৩। ১৫৬

মহাপ্রভু শান্তিপুরে ভক্তগণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণকালে শচীমাতাকে প্রবোধ দান করে তাঁরই ইচ্ছাক্রমে নীলাচলে অবস্থানের জন্য যাত্রা করলেন। অদ্বৈতাচার্য এবং নবদ্বীপবাসী মহাপ্রভুর অদর্শনে বিরহ সন্তপ্ত হলেন। ১৪৩১ শকাব্দে মহাপ্রভু নীলাদ্রি যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভুর দর্শনার্থে নীলাচলে গমন

ভক্তগণ আনুমানিক তিন বছর পর পুরীতে রথযাত্রার সময় চাতুর্মাস্য-কালে মহাপ্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গৌড়দেশ থেকে প্রথম নীলাচলে গিয়েছিলেন।

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। প্রভুরে দেখিতে কৈলা নীলাদ্রিগমন ॥
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা রহিলা চারিমাস। প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥
বিদায় সময় প্রভু কহিলো সবারে। প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১। ৪৬-৪৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ ২৪ বছরের মধ্যে প্রথম ছয় বছর পুরুষোত্তমধাম গমনাগমনে এবং শেষ

আঠারো বছর সেখানে একটানা অবস্থান করেছিলেন। সেই ছয় বছর রথযাত্রার সময় পুরুষোত্তমধামে মহাপ্রভুর উপস্থিতির সংবাদ নিয়ে মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্য গৌড়দেশ থেকে ভক্তগণ যেতেন। আঠারো বছর মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থিতিকালে ভক্তগণ চাতুর্মাস্যে প্রতিবছরই পুরীতে এসে অবস্থান করতেন।

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা। আঠার বৎসর তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥
প্রতি বর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ। চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৩/২৪৯-২৫০

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস। বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি– যত দাস ॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস। তাঁ-সবা লইয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/২৫৫-৫৬

শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়। নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয় ॥
ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে। সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥
আচার্যগোসাই অগ্রে করি ভক্তগণ। সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন ॥

–চৈ.ভা. অন্ত্য ৮/৪-৬

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রতি বছর চাতুর্মাস্য ব্রতকালে নীলাচলে ভক্তগণসহ এসে নরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি-লীলায়, গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনসেবায় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী হতেন। অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে তাঁর সারগ্রাহী পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌরগতপ্রাণ শ্রীঅচ্যুতানন্দ থাকতেন। রথাগ্রে নৃত্যকীর্তনরত সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ষষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন অচ্যুতানন্দ। প্রথম সম্প্রদায়ের নর্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, মূল কীর্তনীয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর। অদ্বৈতাচার্যের সারগ্রাহী পুত্রগণের মধ্যে গোপাল মিশ্রের নামও উল্লেখ করা আছে। তৃতীয় বছর গৌড়দেশ থেকে ভক্তদের সাথে তাঁদের গৃহিণীরাও মহাপ্রভুর সেবার জন্য নানা দ্রব্য নিয়ে এসেছিলেন।

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ। নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত-আচার্যের পাশে। প্রভু দেখিতে আচার্য চলিলা উল্লাসে ॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী। চলিলা আচার্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৩। ১২-১৩, ২১

অদ্বৈতাচার্যের পুত্র গোপাল মিশ্রের অলৌকিক চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। গোপাল মিশ্র গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সামনে নৃত্য কীর্তন করতে থাকলে তাঁর অদ্ভুত নৃত্য ও ভাব দেখে মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য প্রসন্ন হলেন। গোপাল নৃত্য করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লে, তাঁর দেহে সংজ্ঞা নেই দেখে অদ্বৈতাচার্য বেদনাহত হয়ে পুত্রকে কোলে করে নৃসিংহ মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। নানা মন্ত্র পাঠ করেও গোপালের সংজ্ঞা ফিরে না এলে বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন ভক্তার্তিহর মহাপ্রভু 'উঠহ গোপাল, বল হরি হরি' –এই বলে গোপালের হৃদয় স্পর্শ করলে গোপাল সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞালাভ করে উঠে দাঁড়ালেন। ভক্তগণ মুহুর্মুহু হরিধ্বনি সহযোগে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বিশ্বস্ত ভৃত্য কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈতাচার্যকে ঈশ্বররূপে স্থাপন করে রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে একটি চিঠি লিখেন। কিন্তু তাতে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে অদ্বৈত আচার্যের তিনশত টাকা ঋণ হয়েছে এবং কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রের দেয়া টাকা দিয়ে সেই ঋণ শোধ করতে চান। রাজার কাছে অর্থ চাওয়ায় মহাপ্রভু তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। মহাপ্রভুর শাসন পেয়ে কমলাকান্ত দুঃখিত হলে অদ্বৈতাচার্য তাঁকে বুঝালেন যে, প্রভুর নিকট দণ্ড লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত এ প্রসঙ্গে অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখেছেন– "কমলাকান্ত অদ্বৈত আচার্যকে 'ঈশ্বর' বলে স্থাপন করে রাজার নিকট অর্থ চেয়েছিলেন। এরূপ কার্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য 'ঈশ্বর' হলেও তাঁর জগৎ শিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হয়ে রাজার নিকট অর্থ চাওয়া আচার্যদের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্বতোভাবে পরিহার্য, তাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ-পরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশ করলে ধর্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবত বিষয়ী লোক। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন দুষ্ট হয়; মন দুষ্ট হলে কৃষ্ণস্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকলের জন্যই তা নিষিদ্ধ। বিশেষত ধর্মাচার্যদের জন্য তা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ আচার্যের কর্তব্য, কিন্তু অর্থ নিয়ে যাঁরা নামোপদেশ করেন, তাঁরা 'নামোপদেষ্টা' পদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। এরূপ পক্ষে তা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশকে আচার্য প্রতিগ্রহ করলে তাতে লোক-লজ্জা ও ধর্ম-কীর্তির অত্যন্ত হানি হয়।"

তৃতীয় বছর গৌড়দেশ থেকে মহাপ্রভুর ভক্তগণ– মহাপ্রভু শৈশবকালে যে সকল দ্রব্য ভোজন করতে ভালবাসতেন সেসকল দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে গৃহিণীগণসহ পুরীতে পৌঁছালে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁদের দেওয়া দ্রব্যসমূহ প্রীতির সঙ্গে ভোজন করেছিলেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য প্রভু কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে মহাপ্রভু ভিক্ষার জন্য তাঁর গৃহে গিয়েছিলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী পাক-কার্যের দ্রব্য সজ্জিত করে দিলে অদ্বৈতাচার্য নিজেই রান্না করলেন। অদ্বৈতাচার্যের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, তিনি মহাপ্রভুকে একাকী মনের সাধে খাওয়াবেন। দৈববশত সেদিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় মহাপ্রভুর সাথে যে সকল সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসতেন, তাঁরা কেউ আসতে পারেননি। মহাপ্রভু একাকী উপস্থিত হলে অদ্বৈতাচার্য মনের আনন্দে মহাপ্রভুকে বহুবিধ ব্যঞ্জন ভোজন করালেন। ইন্দ্রদেব অদ্বৈতাচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করায় কৃষ্ণের সেবকরূপে অদ্বৈতাচার্য তাঁর স্তব করলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যের মনোভাব বুঝে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে করতে বললেন– "যাঁর ইচ্ছা স্বয়ং কৃষ্ণ পূর্ণ করেন, ইন্দ্র তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন, এতে আশ্চর্য কী?" শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অদ্বৈতাচার্যের গুণ-মহিমা কীর্তনমুখে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন–

অদ্বৈতাচার্য-গোসাই–'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'। তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্মল ॥
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম। অতএব অদ্বৈত-আচার্য তাঁর নাম ॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি। কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি? ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৭/১৭-১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে রূপ গোস্বামী ও সনাতন

গোস্বামীর মিলন করিয়ে অদ্বৈত-নিত্যানন্দের দ্বারা আশীর্বাদ করিয়েছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী অদ্বৈতাচার্যের কৃপায় মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা শ্রীগোবর্ধন মজুমদার নিষ্কপটভাবে অদ্বৈতাচার্যের সেবা করায় সে সম্পর্কে রঘুনাথ দাস গোস্বামী অদ্বৈতাচার্যের কৃপা-ভাজন হলেন।

তাঁর পিতা সদা করে আচার্য-সেবন। অতএব আচার্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥
আচার্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত। প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ-সাত ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৬/২২৫-২৬

পুরী থেকে বিদায়কালে অদ্বৈতাচার্যের প্রতি মহাপ্রভুর যে উক্তি, তাতে জানা যায় অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর কত প্রিয়–

আইলেন আচার্য-গোসাই মোরে কৃপা করি। প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শোধিতে না পারি ॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া। নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া। পরিশ্রম নাহি মোর তোমার সবার লাগিয়া ॥
সন্ন্যাসী মানুষ, মোর নাহি কোন ধন। কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন? ॥
দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলু সমর্পণ। তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ১২/৭২-৭৪

মহাপ্রভুকে তর্জা প্রেরণ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য পুরুষোত্তমধাম থেকে নদীয়ায় শান্তিপুরে ফিরে এলে মহাপ্রভু কর্তৃক পূর্বে প্রেরিত শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জগদানন্দকে পেয়ে অদ্বৈতাচার্য পরম উল্লসিত হলেন। জগদানন্দ নদীয়া থেকে পুরুষোত্তমধামে প্রত্যাবর্তনকালে অদ্বৈতাচার্যের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে গেলে অদ্বৈতাচার্য পণ্ডিতের দ্বারা মহাপ্রভুর কাছে প্রহেলিকা বচন প্রেরণ করলেন। অদ্বৈতাচার্যের তর্জা-প্রহেলীর অর্থ মহাপ্রভু ছাড়া কেউই বুঝতে পারেননি। তর্জা-প্রহেলী–

প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিহ–লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিহ– হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ–কাযে নাহিক আউল। বাউলকে কহিহ–ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ১৯/১৯-২১

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তর্জার তাৎপর্য অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখেছেন– "মহাপ্রভুকে বলিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নাই। মহাপ্রভুকে বলিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কার্যে নাই। মহাপ্রভুকে বলিও যে, প্রেমোন্মত্ত হয়েই অদ্বৈত এ কথা বলেছে। তাৎপর্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হবার যে তাৎপর্য ছিল, তা সম্পূর্ণ হলো, এখন প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই হউক।"

অন্তর্ধান লীলা

একসময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু "কোথা মোর প্রাণ গৌর" বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। বহুক্ষণ পর তাঁর বাহ্য স্ফূর্তি হলে তাঁর অনুগত প্রিয় পুত্রদের ডেকে বললেন– "হে বৎসগণ,

আমার বাক্য শ্রবণ করো। দুষ্টরা আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের নিন্দা করে। প্রাণ গৌরাঙ্গের নিন্দা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্ত হেতু এ দেহ আমি নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করব। অতএব, গৌর প্রিয়গণকে আমার আজ্ঞা জানিয়ে এখানে আনয়ন করো"। জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ পিতার নির্দেশ অনুযায়ী সকল গৌর ভক্তকে খবর দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর আজ্ঞা জেনে বীর চন্দ্র প্রভু, গৌরীদাস পণ্ডিত, যদুনন্দন দাস, নবদ্বীপ বাসী ভক্তগণ ও বিভিন্ন স্থানের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রিয় শিষ্যগণ শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত সকলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি ও স্তবাদি করলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন– "তোমরা সকলেই আমার প্রিয়জন, আমার একটি নির্দেশ সকলেই পালন করবে। নির্দেশটি হলো এই– শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম-গুণ-লীলাদি যথাসাধ্য সকলে প্রচার করবে। আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষী, পাষণ্ড, অসভ্য, অসারগ্রাহী দুষ্ট জনের সঙ্গ অবশ্যই ত্যাগ করবে। এখন সকলে মিলে গৌরনাম কীর্তন করে আমার চিরকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো"। অদ্বৈত প্রভুর কথা শ্রবণে সকল ভক্তের প্রেম উপজিত হলো। তাঁরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-গুণাদি যোগে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন।

শ্রীগৌরচরণসেবী অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র আর গোপাল এই তিন পুত্রের সাথে বীরচন্দ্র প্রভু, নরহরিদাস ঠাকুর, গৌরীদাস পণ্ডিত এবং পণ্ডিত দামোদর –এই সাত জনে মনোহর নৃত্য করতে লাগলেন। সাথে সাথে গৌর নামকীর্তন আরম্ভ হলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রেম উথলে উঠলে তিনি সংকীর্তন মধ্যে নৃত্য করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সংকীর্তন সিন্ধুর তরঙ্গ বর্ধিত হলে ভাবাবেশে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু তাতে ডুবে গেলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। *"কোথা মোর প্রাণ গৌর"* বলে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে করতে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর তাঁর দেহ কদম্বফুলের ন্যায় হলে তিনি হঠাৎ মদনগোপাল দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং তারপরই লোকচক্ষুর অদৃশ্য হন। ভক্তগণ তাঁকে দেখতে না পেয়ে ক্রন্দন করে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রী অচ্যুতানন্দ প্রভু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতৃদেব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমদনগোপালে অন্তর্ধান করে লীলা সংবরণ করেছেন। তিনি ক্রন্দন করে গৌরভক্তগণের কাছে প্রকাশ করলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেমকল্পতরুর একটি স্কন্ধ ছিল, তাতে মহাপ্রভুর অপ্রকট অসম্পূর্ণ ছিল। আজ সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সংবরণ হলো। এ কথা শ্রবণ করেই সকল ভক্ত অবিশ্রান্তভাবে রোদন করতে লাগলেন।

হা [illegible] হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ।
হায় ভক্ত অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥

এই বলে কীর্তন করতে করতে সকলে বাহ্য জ্ঞান রহিত হলেন। দ্বিতীয় দিনে সবাই গঙ্গা স্নান করেন। তারপর শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর উদ্দেশ্যে মহোৎসব করলেন। সকলে মহপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু ১৪৮০ শকাব্দে পৌষ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে অপ্রকট লীলা করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করে জগজ্জীবকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক যেমন একজন শিক্ষক– কীভাবে পড়তে বা লিখতে হয় তা শেখানোর জন্য তাঁর ছাত্রকে পড়ে শোনান অথবা লিখে দেখান। মনে হতে পারে, তিনি একজন ছাত্রের মতো পড়েন বা লিখেন; কিন্তু শিক্ষক হিসেবে সবকিছু জেনেও মূলত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি তা করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তদ্রূপ ভক্তের ভূমিকা নিয়ে আমাদের ভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার সঙ্গে ভগবদ্গীতা ও ভাগবতের শিক্ষার কোনো পার্থক্য নেই। তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ। ভগবদ্গীতার চরম উপদেশ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। জড়-জাগতিক সুখের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত হওয়ার কারণে ভগবৎ-প্রদত্ত এ জ্ঞান হারিয়ে যেতে বসেছিল। কলিহত জীব এই উপহার হেলায় হারালেও পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ, ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে এসেছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দরভাবে মহাপ্রভুর প্রথম জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আর মহাপ্রভুর শিক্ষা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম জীবনের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁরই এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রী মুরারি গুপ্ত; আর শেষভাগের লীলবিলাসসমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীল দামোদর গোস্বামী বা শ্রীল স্বরূপ দামোদর, যিনি জগন্নাথপুরীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকতেন। এই দুজন ভক্ত মহাপ্রভুর লীলবিলাসের প্রায় প্রতিটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-সম্বন্ধীয় সবকটি গ্রন্থই শ্রীল দামোদর গোস্বামী এবং শ্রীল মুরারি গুপ্তের কড়চার ভিত্তিতে রচিত হয়।

আবির্ভাব

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনি পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন। তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়। বৈদিক প্রথানুসারে চন্দ্রগ্রহণকালে গঙ্গাস্নানসহ বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের বিধান থাকায় ভারতবর্ষজুড়ে তখন উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি হতে থাকে। সবমিলে তৈরি হয় এক দিব্য, ভক্তিময় পরিবেশ। এমন শুভ মুহূর্তেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন।

তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন মহান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁর আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় শিক্ষালাভের জন্য তিনি নবদ্বীপে আসেন, কারণ সে সময় নবদ্বীপ ছিল শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী নামে নবদ্বীপের এক মহান পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী শচীদেবীকে বিবাহ করে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে গঙ্গার তটে বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভে জগন্নাথ মিশ্রের কয়েকটি কন্যা হয়, কিন্তু খুব অল্প বয়সেই তাঁরা অপ্রকট হন। কেবল দুটি পুত্রসন্তান– শ্রীবিশ্বরূপ এবং শ্রীবিশ্বম্ভর প্রকট থেকে তাঁদের পিতা-মাতার স্নেহের দুলালরূপে বর্ধিত হতে থাকেন। সর্বকনিষ্ঠ দশম সন্তান বিশ্বম্ভর পরবর্তীকালে নিমাইরূপে প্রসিদ্ধ হন। তাঁদের বাড়ির উঠোনে একটি নিম গাছের তলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর স্নেহময়ী মাতা তাঁকে আদর করে 'নিমাই' নামটি দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু'।

বাল্যলীলা

ধরাধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত মহামন্ত্রও আবির্ভূত হয়েছিল। শৈশবে তিনি যখন কান্না করতেন, তখন প্রতিবেশী মহিলারা তাঁকে ঘিরে হাততালি দিতে দিতে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করতেন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কান্না থেমে যেত। অবাক বিস্ময়ে প্রতিবেশীরা এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন। কখনো কখনো অল্পবয়সী মেয়েরা ইচ্ছা করেই তাঁকে কাঁদাতো এবং তারপর তারা নাম কীর্তন করে তাঁর সেই কান্না থামাতো। এভাবে শৈশব থেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের' গুরুত্ব প্রচার করেছিলেন।

ছমাস বয়সে তাঁর অন্নপ্রাশনের সময় মহাপ্রভু তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই বৈদিক অনুষ্ঠানে শিশুর ভবিষ্যৎ প্রবৃত্তি কেমন হবে, তা জানার জন্য মুদ্রা এবং গ্রন্থ দেওয়া হয়। মহাপ্রভুর একদিকে রাখা হলো মুদ্রা এবং অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবত। মহাপ্রভু মুদ্রাগুলো গ্রহণ না করে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করেছিলেন।

একটি ছোট্ট শিশুরূপে তিনি যখন উঠোনে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন, তখন একদিন একটি সাপ এসে উপস্থিত হলো এবং নিমাই সেই সাপটির সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। পরিবারের সকলে এ দৃশ্য দেখে ভয়ে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সাপটি চলে গেলে শচীমাতা নিমাইকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর উপর তাঁর স্নেহ বর্ষণ করতে লাগলেন। একবার দুই চোর তাঁর গায়ের গয়নাগুলো চুরি করার জন্য তাঁকেই চুরি করে নিয়ে যায়। তারা একটি নির্জন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ভগবান খুব মজা করে সেই হতভম্ব চোরের কাঁধে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু ভগবানের মায়ার প্রভাবে সেই চোর ঘুরতে ঘুরতে আবার জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনে উপস্থিত হলো এবং ধরা পড়ার ভয়ে শিশুটিকে রেখে পালিয়ে গেল। উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হলেন।

এক সময় এক তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি যখন ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছিলেন তখন নিমাই সেখানে এসে সেই নৈবেদ্য খেতে শুরু করে। সেই নৈবেদ্য ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণ আবার ভোগ বানিয়ে তা ভগবানকে নিবেদন করলেন। এবারও মহাপ্রভু এসে সেই ভোগ খেতে শুরু করলেন। এভাবে তিনবার একই ঘটনা ঘটার পর শিশুটিকে ঘরের ভেতর বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো। মধ্যরাতে যখন সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সেই ব্রাহ্মণ তখন বিশেষভাবে রান্না করা ভোগ ভগবানকে নিবেদন করলেন

এবং ঠিক আগেরই মতো শিশু নিমাই তাঁর নিবেদন নষ্ট করে দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন কাঁদতে শুরু করলেন। কিন্তু যেহেতু সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল, তাই কেউ তার কান্না শুনতে পেলো না। তখন শিশু নিমাই সৌভাগ্যবান ব্রাহ্মণের কাছে তাঁর স্বরূপ উদঘাটন করলেন এবং ব্রাহ্মণ দেখলেন যে, সেই শিশুটি হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। ব্রাহ্মণকে এই ঘটনা সম্বন্ধে কাউকে বলতে নিষেধ করে দিয়ে নিমাই তার মায়ের কোলে ফিরে গেলেন।

তাঁর শৈশবের এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে। একটি দুষ্ট শিশুরূপে তিনি গঙ্গায় স্নানরত গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরিহাস করতেন। ব্রাহ্মণ যখন তাঁর পিতার কাছে এসে অভিযোগ করতেন যে, নিমাই পাঠশালায় না গিয়ে গঙ্গায় তর্পণ করার সময় তাঁদের গায়ে জল ছেটাচ্ছে। তখন মহাপ্রভু হঠাৎ তাঁর পিতার সামনে এমনভাবে আবির্ভূত হতেন, যেন তিনি সবেমাত্র পাঠশালা থেকে ফিরলেন। গঙ্গার তীরে স্নানের ঘাটে তিনি প্রতিবেশী বালিকাদের সঙ্গেও পরিহাস করতেন। তারা যখন ভালো স্বামী লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় শিবের পূজা করতো, তখন বালকরূপী মহাপ্রভু তাদের কাছে এসে বলতেন, “এই মেয়েরা, শিবকে নিবেদন করার জন্য তোমরা যা এনেছো, তা সব আমাকে দাও। শিব হচ্ছে আমার ভক্ত, আর পার্বতী হচ্ছে আমার দাসী। তোমরা যদি আমার পূজা করো, তাহলে শিব আর অন্য দেবতারাও অত্যন্ত প্রীত হবে।” তাদের কেউ কেউ মহাপ্রভুর এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারতো না। আর মহাপ্রভু তখন তাদের অভিশাপ দিতেন, “আমাকে যদি নৈবেদ্য না দাও, তাহলে তোমার বুড়ো স্বামী হবে, আর চারটি সতীন থাকবে।” ভয় পেয়ে বা কখনো ভালোবেসে, বালিকারা তাঁকে তাদের সেই নৈবেদ্য এনে দিত। তখন মহাপ্রভু তাদের আশীর্বাদ করতেন যে অতি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে তাদের বিবাহ হবে এবং তাদের বহু পুত্র-সন্তান হবে। তাঁর এ আশীর্বাদ লাভ করে বালিকারা অত্যন্ত আনন্দিত হতো, কিন্তু কখনো কখনো তারা তাঁর মায়ের কাছে এ নিয়ে অভিযোগও করতো।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়

এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শৈশব-লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর, তখন তিনি একটি চতুষ্পাঠী খুলে শিক্ষা দান করতে শুরু করেন। এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়াতে গিয়েও কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেন।

একসময় কেশব কাশ্মীরি নামে কাশ্মীরের এক মহাপণ্ডিত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিষয়ে তর্ক করার জন্য নবদ্বীপে আসেন। এই কাশ্মীরি পণ্ডিত ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করে সমস্ত বড় বড় পণ্ডিতকে পরাজিত করে ‘দিগ্বিজয়ী’ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর শিষ্যপরিবৃত হয়ে শাস্ত্রকথা আলোচনা করছিলেন, তখন সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে সাদরে তাঁকে বসতে আহ্বান জানালেন। যদিও সেই কাশ্মীরি পণ্ডিত স্বভাবতই নির্ভীক ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করে তাঁর মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশ্মীরি পণ্ডিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর বললেন, “আপনার কবিত্বের সীমা নেই, এমন কিছু নেই যার আপনি বর্ণনা করতে পারেন না। এখন কৃপা করে আপনি

গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করুন, তা শুনে সকলের পাপ বিমোচিত হোক।" মহাপ্রভুর সেকথা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করলেন। তিনি একের পর এক শ্লোক রচনা করতে লাগলেন এবং কতভাবে যে তিনি গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করলেন তার কোনো তুলনা হয় না। তাঁর জিহ্বায় সরস্বতী স্বয়ং অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁর কবিত্ব বুঝতে পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রভুর শতশত শিষ্যরা অবাক হয়ে তাঁর সেই বর্ণনা শুনতে লাগলেন। এভাবে প্রায় এক প্রহর ধরে সেই দিগ্বিজয়ী গঙ্গার মহিমা বর্ণনাসূচক শ্লোক রচনা করে তা আবৃত্তি করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি যখন থামলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর হেসে বললেন– "আপনি যা বর্ণনা করলেন তা যদি বুঝিয়ে না দেন, তাহলে তা বোঝার উপায় নেই। তাই আপনি দয়া করে তা ব্যাখ্যা করে শোনান।" মহাপ্রভুর এই মনোহর বিনয় বাক্য শুনে পণ্ডিত ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করা মাত্রই মহাপ্রভু তার আদি, মধ্য, অন্ত্য তিন স্থানেই ত্রুটি দেখলেন। একবার শোনা মাত্রই পণ্ডিতের সবকটি শ্লোক তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চৌষট্টিতম শ্লোকটির মধ্যে শব্দ এবং অলংকারের নানা রকমের ভুল প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পণ্ডিত ভাবতে লাগলেন যে, কীভাবে এইটুকু একটি ব্যাকরণের ছাত্র তাঁর মতো একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের ভুল ধরতে পারে! তিনি সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই তিনি ভাবতে লাগলেন– "নিশ্চয়ই দেবীর কাছে আমার কোনো অপরাধ হয়েছে, তাই আমার প্রতিভা সংকুচিত হয়েছে।"

সেই রাতে দেবী সরস্বতী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি যাঁর কাছে আজ পরাজিত হলে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নিরন্তর দাসী, তাই তাঁর সামনে আসতে লজ্জা পাই। তুমি যে তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছ, তা তোমার পরাজয় নয়, বিজয়।"

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সেই কাশ্মীরি পণ্ডিত এসে মহাপ্রভুকে প্রণতি জানালেন। মহাপ্রভুও তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এভাবে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাপ্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে বললেন–

'দিগ্বিজয় করিব', বিদ্যার কার্য নহে। ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে ॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 'কৃষ্ণপাদপদ্মে' যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥

এই বলে মহাপ্রভু তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দিলেন।

বিবাহলীলা

তাঁর জীবনের প্রথম ২৪ বছর তিনি নবদ্বীপে শৈশব এবং গার্হস্থ্য লীলাবিলাস করেন। মহা সমারোহে শ্রীমতী লক্ষীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহাপ্রভু যখন পুর্ব বাংলার শ্রীহট্টে তাঁর পূর্বপুরুষের আলয়ে যান, তখন খুব অল্প বয়সী লক্ষীপ্রিয়া দেবী পরলোকগমন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে সম্মত হন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। আজীবন তিনি মহাপ্রভুর বিরহে কালাতিপাত করেন। কারণ, মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর।

চাঁদ কাজী উদ্ধার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই নবদ্বীপে ভগবানের নাম সংকীর্তন প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে কিছু ব্রাহ্মণ খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং তারা তাঁর প্রচারকার্যে নানা রকম বিঘ্ন উৎপাদন করতে শুরু করে। তারা এত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েছিল যে, অবশেষে তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে নবদ্বীপের মুসলমান কাজীর কাছে নালিশ করে। কাজী তখন সেই সংকীর্তন বন্ধ করার জন্য তাঁর পেয়াদা পাঠান এবং তারা সংকীর্তনকারীদের কয়েকটি মৃদঙ্গ ভেঙে দেয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ ঘটনার কথা জানতে পেরে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ভারতবর্ষে এক মহা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তিনি হাজার-হাজার মৃদঙ্গ এবং করতালসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেন এবং কাজীর আইন অমান্য করে এ শোভাযাত্রা নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম কীর্তন করতে করতে কাজীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সেই বিশাল জনসমাবেশ কাজীর বাড়ির সামনে সমবেত হয়ে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের শান্ত হতে বলেন। মহাপ্রভুর আশ্বাস পেয়ে অবশেষে কাজী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মহাপ্রভুকে গ্রাম সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে বলে সম্বোধন করে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, গ্রাম-সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী হচ্ছেন তাঁর মামা এবং সেই সূত্রে তাঁর মা শ্রীমতী শচীদেবী হচ্ছেন তাঁর ভগ্নী। তিনি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেন, "মামার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া কি ভাগ্নের উচিত?" মহাপ্রভু তখন উত্তর দেন যে, যেহেতু কাজী হচ্ছেন তাঁর মামা, তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে ভাগ্নেকে গৃহে স্বাগত জানানো। এভাবে পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত হয় এবং দুই বিদ্বান পণ্ডিত কোরান এবং হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন কাজীকে বোঝালেন এবং কাজী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করলেন। তারপর কাজী ঘোষণা করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞে কেউ যেন কখনো বাধা না দেয় এবং তিনি তাঁর উইলে লিখে যান যে, তাঁর বংশের কেউ যদি সংকীর্তনে বাধা দেয়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ বংশচ্যুত হবে। নবদ্বীপে শ্রীধাম মায়াপুরের সন্নিকটে শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধি এখনও বর্তমান আছে এবং ভগবদ্ভক্তরা এখনও সেখানে গিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

এ ঘটনার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাগবত ধর্ম বা সংকীর্তন আন্দোলন আরো প্রবলভাবে প্রচার করতে শুরু করলেন এবং এ যুগধর্ম প্রচারে যখনই কেউ কোনোরকম বাধা দিতে এসেছে, তিনি বিভিন্নভাবে তাদের শাস্তি দিয়েছেন। চাপাল এবং গোপাল নামে দুজন ব্রাহ্মণ, গ্রাম-সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মামা ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রতি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাদের গলিত কুষ্ঠরোগ হয়। কিন্তু যখন তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তারা রোগমুক্ত হন এবং মহাপ্রভু তাদের উপর তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন।

ভগবানের নাম প্রচার করার জন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন তাঁর অনুগামীদের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন। তাঁর দুই প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরও নগরের ঘরে ঘরে

গিয়ে ভগবানের বাণী প্রচার করতেন। সে সময় সমস্ত নবদ্বীপ তাঁর সংকীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল। তাঁর দুই প্রধান গৃহস্থভক্ত শ্রীবাস ঠাকুর এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর বাড়ি ছিল তাঁর এই সংকীর্তনের কেন্দ্রস্থল। এই দুজন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রধান সমর্থক। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আহ্বানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন।

জগাই মাধাই উদ্ধার

একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নগরের পথ দিয়ে সংকীর্তন করছিলেন। সে সময় তাঁরা জগাই মাধাই নামে মাতাল দুই ভাইয়ের সামনে কীর্তন করতে লাগলেন। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে মাধাই একটি কলসির কানা দিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় আঘাত করল; প্রভুর কপাল কেটে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু এতই করুণাময় ছিলেন যে, এ কাজের জন্য কোনোরকম প্রতিবাদ না করে তিনি বললেন, "তুমি যে আমাকে কলসির কানা ছুঁড়ে মেরেছ, তাতে আমি কিছু মনে করিনি, কিন্তু আমার একমাত্র অনুরোধ যে, তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির নাম কীর্তন করো।"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর এই অদ্ভুত ব্যবহার দর্শন করে অপর ভ্রাতা জগাই অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং সে তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ ধরে তার ভাইকে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করল। মাধাই যখন আবার নিত্যানন্দ প্রভুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো, তখন জগাই তাকে বাধা দিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলল। ইতোমধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর আঘাতপ্রাপ্তির কথা মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে পৌঁছল। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং দুই পাপীকে সংহার করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কলিযুগের সমস্ত অধঃপতিত মানুষকে উদ্ধার করা। জগাই-মাধাই সেই অধঃপতিত মানুষদের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই ভাইকে ক্ষমা করার জন্য মহাপ্রভুর কাছে অনুনয় করতে লাগলেন। তখন জগাই এবং মাধাই উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। একটি শর্তে মহাপ্রভু তাদের ক্ষমা করতে রাজি হলেন যে, এখন থেকে তারা যেন সবরকমের পাপকর্ম বর্জন করে। জগাই এবং মাধাই উভয়েই সমস্ত প্রকার পাপকর্ম বর্জন করতে অঙ্গীকার করল এবং পরম করুণাময় ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীচরণে তাদের স্থান দিলেন। এভাবে মহাপাপী জগাই এবং মাধাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় উদ্ধার লাভ করল।

শ্রীবাস অঙ্গনে আম্রবৃক্ষ রোপণ

একবার শ্রীনিবাস ঠাকুরের বাড়িতে মহাপ্রভু এক অপূর্ব অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। সেখানে তখন সংকীর্তন হচ্ছিল। মহাপ্রভু ভক্তদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁরা কী খেতে

চান। তাঁরা জানালেন যে, তাঁরা আম খেতে চান। যদিও তখন আমের সময় ছিল না তবুও তিনি একটি আমের আঁটি শ্রীনিবাস ঠাকুরের অঙ্গনে পুঁতলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই আঁটি অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে লাগল। অচিরেই তা একটি আম গাছে পরিণত হলো এবং সেই গাছে এত সুপক্ক আম ধরল যে, ভক্তরা তা খেয়ে শেষ করতে পারলেন না। সেই আম গাছটি শ্রীনিবাস ঠাকুরের অঙ্গনেই রইল এবং ভক্তরা তা থেকে তাঁদের ইচ্ছেমতো আম নিয়ে খেতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ

একবার কয়েকজন ছাত্র মহাপ্রভুর দিব্যভাব বুঝতে না পেরে তাঁর নিন্দা করেন। তখন তিনি সমাজের বিভিন্ন ধরনের লোকের কথা বিবেচনা করলেন। তিনি ভাবলেন– "এ যুগের সমস্ত অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করাই হচ্ছে আমার আবির্ভাবের কারণ, কিন্তু তারা যদি আমাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে অপরাধ করে, তাহলে তারা কোনোদিনই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারবে না।" তারপর ২৪ বছর বয়স পূর্ণ হলে মাঘ মাসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেশব ভারতীর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং মুকুন্দ দত্ত। সন্ন্যাস গ্রহণকালে তাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মাতা শচীদেবীর অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি পূর্ণরূপে ভাগবত-ধর্মের প্রচারক হলেন। যদিও তিনি গৃহস্থ আশ্রমে থাকাকালেও ভাগবত-ধর্মের প্রচার করছিলেন, কিন্তু তিনি যখন সেই কার্যে বাধা পেলেন, তখন তিনি পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁর মুখ্য পার্ষদ ছিলেন শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং শ্রীল শ্রীবাস ঠাকুর, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর মুখ্য পার্ষদ হলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, যাঁকে তিনি গৌড়-বঙ্গে প্রচার করার ভার দিয়েছিলেন এবং ষড় গোস্বামী (শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী), যাঁদের তিনি বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের এবং শাস্ত্র প্রণয়নের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছার প্রভাবে বৃন্দাবন ধাম এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হলো।

শান্তিপুরে আগমন

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। তিনদিন ধরে ক্রমান্বয়ে তিনি রাঢ়দেশে (যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত হয় না) ভ্রমণ করলেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দে নিমগ্ন হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু পথ পরিবর্তন করে তাঁকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মহাপ্রভু কয়েকদিনের

জন্য অদ্বৈত প্রভুর গৃহে অবস্থান করলেন। তিনি যে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করেছেন
সেকথা ভেবে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নবদ্বীপে লোক পাঠালেন শচীমাতাকে নিয়ে আসার জন্য,
যাতে তিনি শেষবারের মতো তাঁর পুত্রকে দেখতে পারেন। অদ্বৈত প্রভুর গৃহে শচীমাতার
সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর পুত্রকে দর্শন করে তিনি গভীরভাবে
মর্মাহত হন। শচীমাতা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন জগন্নাথপুরীতে থাকেন,
যাতে লোকমুখে মাঝে মাঝে তিনি তাঁর সংবাদ পেতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর
স্নেহময়ী মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
সমস্ত নবদ্বীপবাসীকে শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে, পুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

জগন্নাথপুরী যাত্রা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দর্শন করেছিলেন।
তিনি রেমুনায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'-এর মন্দির দর্শন করলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য
গোপীনাথজির ক্ষীরচুরি করার কাহিনী মহাপ্রভু পরম আনন্দের সঙ্গে আস্বাদন করলেন।

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথজির মন্দির দর্শন করার
পর মহাপ্রভু আবার পুরীর দিকে যাত্রা করলেন এবং পথে তিনি সাক্ষীগোপাল মন্দির
দর্শন করলেন। দুজন ব্রাহ্মণের পারিবারিক কলহের সমাধান করার জন্য সাক্ষী হয়ে
গোপাল বৃন্দাবন থেকে পায়ে হেঁটে বিদ্যানগরে এসেছিলেন। পরম আনন্দের সঙ্গে
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষীগোপালের কাহিনী শ্রবণ করলেন। সেই বিগ্রহ পরে জগন্নাথ
পুরীর সন্নিকটে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং শ্রীবিগ্রহের নাম অনুসারে সেই জায়গার নাম হয়
সাক্ষীগোপাল। সেখানে একরাত অবস্থান করে মহাপ্রভু পুনরায় রওনা হলেন। পথে
নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সন্ন্যাস-দণ্ড ভেঙে ফেলেন। সেজন্য মহাপ্রভু আপাতভাবে তাঁর
সহগামীদের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করলেন এবং তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে একাই পুরীতে
গেলেন।

জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভুর মূর্ছা

পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে তিনি প্রেমাবেশে মূর্ছিত হলেন। মন্দিরের পাণ্ডারা
মহাপ্রভুর এ অপ্রাকৃত ভাব বুঝতে পারলো না। সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য নামে এক মহা
পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মন্দিরে প্রবেশ করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ
দর্শন করে প্রেমাবেশে তাঁর এই মূর্ছা কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের
সভা-পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গজ্যোতি দেখে আকৃষ্ট হলেন এবং
তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই অপ্রাকৃত সমাধি-অবস্থা অতি উন্নত মার্গের।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের
পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন তাঁকে
জগন্নাথপুরীতে প্রথম দর্শন করেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, মহাপ্রভু অন্যান্য তীর্থ-
যাত্রীদের মতোই সাধারণ এক তীর্থযাত্রী।

ইতোমধ্যে মহাপ্রভুর সহচরেরা মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত মূর্ছার কথা জানতে পারলেন। তাঁরা শুনলেন যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভা-পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন গোপীনাথ আচার্যের ভগ্নীপতি। গোপীনাথ আচার্য সবাইকে নিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ি গেলেন। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে দলের সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে মিলে তখন হরিনাম কীর্তন করতে লাগলেন এবং তখন মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা ফিরে এলো। সার্বভৌম ভট্টাচার্য নিত্যানন্দ প্রভুসহ সবাইকে তাঁর গৃহে অতিথি হতে অনুরোধ করলেন। তারপর মহাপ্রভুসহ সকলে সমুদ্রে স্নান করতে গেলেন।

ইতোমধ্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য কাশী মিশ্রের গৃহে তাঁদের থাকার এবং প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর শ্যালক গোপীনাথ আচার্য তাঁকে সাহায্য করলেন। মহাপ্রভু যে পরমেশ্বর ভগবান সে সম্বন্ধে শ্যালক ও ভগ্নীপতির মধ্যে অনেক আলোচনা হলো। গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে আগে থেকে জানতেন। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি একজন মহান ভক্ত। এভাবে শাস্ত্র প্রমাণে যুক্তিতে তাঁরা তর্ক করতে লাগলেন, জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে নয়।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে শিক্ষা

ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতার সহপাঠী। সে সূত্রে এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য পিতৃবৎ বাৎসল্য অনুভব করলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁর অনেক অনুগামী ছিল। তাই তিনি চাইলেন এই নবীন-সন্ন্যাসীও যেন তাঁর কাছে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভট্টাচার্যের সামনে একজন মূর্খ শিষ্যের অভিনয় করতে লাগলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেহেতু তাঁকে বলেছেন যে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে বেদান্ত অধ্যয়ন করা, সেজন্য তিনি তাঁর কাছে বেদান্ত পাঠ শুনছেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁর ভাষ্য মেনে নিতে পারলেন না।

মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথাকথিত সমস্ত বৈদান্তিকদের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই তির্যক মন্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে তিনি বুঝতে পারেননি সে সম্বন্ধে তিনি কেন কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। মহাপ্রভুর নীরবতার কারণ ভট্টাচার্য বুঝতে পারলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ, শাস্ত্র-জনিত্বাৎ এবং অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞেস– বেদান্তের এই সূত্রগুলো আমি বুঝতে পারি, কিন্তু সে সম্বন্ধে আপনার ব্যাখ্যা আমি বুঝতে পারিনি। সূত্রের অর্থ প্রকাশ করে ভাষ্য, কিন্তু আপনি যে ভাষ্য করেছেন, তাতে সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হয়ে পড়ছে। আপনি সূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যবহার করেননি, আপনার মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তা আপনি আচ্ছাদিত করেছেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রদত্ত সূত্রের সমস্ত কল্পিত ভাষ্যগুলোর দোষ বর্ণনা করলেন। তখন ভট্টাচার্য ন্যায় এবং ব্যাকরণের বাক্য বিন্যাসের দ্বারা তাঁর যুক্তি এবং মায়াবাদ দর্শনের পক্ষে সমর্থন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁর অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা তাঁকে পরাস্ত করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, আমরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত এবং সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই সম্পর্কের বিনিময়ের ফলেই ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়। ভগবৎ-প্রেম লাভ হলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমস্ত জীবের প্রতিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দয়ার প্রকাশ হয়, কেননা সমস্ত জীবই হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত যুক্তি শ্রবণ করে ভট্টাচার্য বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় হতবাক হয়ে যান এবং আর কিছু বলতে সমর্থ না হয়ে তিনি চুপ করে থাকেন। মহাপ্রভু তখন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে পরম পুরুষার্থ– মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তারপর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে বললেন, "যে সমস্ত মুক্ত-আত্মা আত্মোপলব্ধির আনন্দেই মগ্ন এবং যাঁরা সর্বতোভাবে জড়জাগতিক কলুষমুক্ত হয়েছেন, তাঁরাও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত হন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলির প্রভাবে আত্মারামদেরও আকৃষ্ট করেন।"

তখন ভট্টাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৭/১০) 'আত্মারাম' শ্লোকে ভাষ্য শুনতে ইচ্ছা করেন। মহাপ্রভু প্রথমে ভট্টাচার্যকে সেই শ্লোক বিশ্লেষণ করতে বলেন এবং তারপর তিনি নিজে তা বিশ্লেষণ করবেন বলে কথা দেন। ভট্টাচার্য ছিলেন তখনকার দিনে তর্কশাস্ত্রের সবচেয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত। তর্কশাস্ত্রের বিবিধ বিধান অনুসারে তিনি সেই শ্লোকের নয়টি বিভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করেন।

ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। তারপর ভট্টাচার্যের অনুরোধে তিনি ভট্টাচার্যের নয়টি ব্যাখ্যা স্পর্শ পর্যন্ত না করে শ্লোকটির চৌষট্টি রকমের অর্থ বিশ্লেষণ করেন। মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেন যে, 'মুক্তি' শব্দটি হচ্ছে বিষ্ণু বা পরমেশ্বর ভগবান। তাই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে 'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ভট্টাচার্য নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, এ ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা করতে করতে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করলেন এবং দয়াপরবশ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে গ্রহণ করলেন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি তাঁর সামনে তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ এবং তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর বংশীবদন রূপ প্রদর্শন করলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করে অনেক শ্লোক রচনা করতে থাকেন।

রামানন্দ রায়কে শিক্ষা

মহাপ্রভু তারপর কিছুকালের জন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান এবং পথে যার সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকেই তিনি কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছিলেন। সে সমস্ত ভক্তরাও অন্য অনেককে ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবৎ-ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর মহাপ্রভু গোদাবরীর তটে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীল রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনা উচ্চ স্তরের পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ আলোচনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গেলে একটি ছোটখাটো গ্রন্থে পরিণত হবে। তাই এখানে আমরা সংক্ষেপে সেই আলোচনা উল্লেখ করব।

গোদাবরীর তীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে সাধ্য নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়তে আজ্ঞা দেন। রামানন্দ রায় তার উত্তরে বলেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলন করার ফলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। কিন্তু মহাপ্রভু তখন বললেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ বাহ্যিক এবং জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বিষ্ণুভক্তি লাভের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি সামান্য। জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে জড় জগতের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। জীব যখন সেভাবে অগ্রসর হয়, তখন ভগবান তাকে গ্রহণ করেন। তাই ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের চরম পরিণতি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সমস্ত অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমস্ত জীবের উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে তিনি বলেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। তাই সর্বান্তকরণে তাঁরই আরাধনা করতে হবে, কেননা সবকিছু হচ্ছে তাঁর শক্তির প্রকাশ। সেটিই হচ্ছে যথার্থ সিদ্ধি লাভের পন্থা এবং সেই পন্থা সর্বকালের সমস্ত আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম সাধারণত নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাতে পারমার্থিক উপলব্ধি খুবই কম। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বাহ্য অনুষ্ঠান বলে প্রত্যাখ্যান করে পরমার্থ বিষয়ে আরও উন্নত স্তরের বিচার সম্বন্ধে রামানন্দ রায়কে বলতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় তখন 'কৃষ্ণ কর্মার্পণ' সম্বন্ধে বলেন। এ সম্পর্কে ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) বলা হয়েছে–

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥

অর্থাৎ "তুমি যা করো, যা খাও, যজ্ঞে যা অর্পণ করো, যা দান করো এবং যে তপস্যা করো, সে সমস্তই তুমি আমাকে (কৃষ্ণকে) অর্পণ করো।" পরমেশ্বর ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যে জীবকে কর্ম অর্পণ করার যে নির্দেশ দিলেন, তা বর্ণাশ্রম ধর্মের নির্বিশেষ ভাবের এক স্তর উর্ধ্বে, কিন্তু তবুও এ পন্থায় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি। তাই পরমেশ্বর ভগবান রামানন্দ রায়ের এ প্রস্তাবটিকেও অস্বীকার করে আরো উন্নত স্তরের কথা বলতে অনুরোধ করলেন।

রামানন্দ রায় তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হওয়ার কথা বললেন। কিন্তু মহাপ্রভু সেই প্রস্তাবটিকেও অস্বীকার করলেন, কেননা হঠকারিতা করে স্বধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়; তার ফলে অভীষ্ট বস্তু লাভ নাও হতে পারে।

তখন রামানন্দ রায় বললেন যে, সব রকমের জড় ভাবনামুক্ত হয়ে পরাভক্তি লাভই হচ্ছে জীবনের পরম প্রাপ্তি। মহাপ্রভু এ প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করলেন, কেননা এ ধরনের পরমার্থ উপলব্ধির পথে বিবেক-বর্জিত মানুষের দ্বারা পূর্বে প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়েছে, তাই হঠাৎ তা করা সম্ভব নয়। তখন রামানন্দ রায় বলেন যে, নিষ্ঠাভরে ভগবদ্ভক্ত মহাত্মার সঙ্গ করে এবং বিনীত চিত্তে তাদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত বাণী ও তাঁর লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার মাধ্যমেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ প্রস্তাবটি স্বীকার করে নেন। ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ প্রস্তাব করা হয়েছিল। ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের একটি নাম হচ্ছে অজিত, অর্থাৎ কেউই তাঁকে জয় করতে পারে না। কিন্তু এই অজিত ভগবানও একটি অতি সহজ পন্থায় জিত হন। সেই অতি সরল পন্থাটি হচ্ছে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করার উদ্ধত মনোভাব বর্জন করে, অত্যন্ত দীন ও বিনীতভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মহিমা শ্রবণ করা। মহৎ ব্যক্তির মহিমা কীর্তন করার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু তারা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করার শিক্ষা পায়নি। শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করাই হচ্ছে জীবনের চরম সিদ্ধি। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত এবং যাঁর জড় বিষয়ের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। জড়জাগতিক উন্নতি সাধন এবং জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত প্রয়াস হচ্ছে মানব সমাজের অজ্ঞানতাপ্রসূত কার্যকলাপ। ভগবদ্বিমুখ সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি কখনোই লাভ হতে পারে না। তাই নিষ্ঠাভরে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে বিনীত চিত্তে এবং ধৈর্য সহকারে তাঁদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা শ্রবণ করাই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য। উচ্চ অথবা নীচ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের আত্মজ্ঞান লাভের পন্থার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষকে কেবল নিয়মিতভাবে নিষ্ঠাভরে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। আর এ জ্ঞান যিনি শিক্ষা দান করেন, তাঁর যোগ্যতা হচ্ছে যে, তিনি পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের পন্থাস্বরূপ এই ভাগবত-ধর্ম অনুশীলনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সেই ধর্ম নির্দেশকারী অমল-পুরাণ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীরামানন্দ রায়ের মধ্যে এসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার পর, তারও ঊর্ধ্বে পারমার্থিক বিষয়ের আরো নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। তবে সে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করছি না, কেননা যথার্থরূপে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে সেসমস্ত বিষয় বোঝা যাবে না।

তাঁদের সেই আলোচনার চরমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে উপদেশ দিয়েছিলেন– রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীজগন্নাথপুরীতে তাঁর কাছে আসতে,

যাতে তাঁরা একত্রে অবস্থান করে এক অপ্রাকৃত সম্পর্ক আস্বাদন করতে পারেন। তার কিছুদিন পর শ্রীরামানন্দ রায় রাজার কাছ থেকে ভাতা গ্রহণ করে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর তিনি পুরীতে তাঁর বাসস্থানে ফিরে যান এবং সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভক্তে পরিণত হন। জগন্নাথপুরীতে শিখি মাহিতি নামে আরেক মহাত্মা ছিলেন, যিনি ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়েরই মতো মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। জগন্নাথপুরীতে তিন-চারজন অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। এভাবে তিনি ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হয়ে ১৮ বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর সে সমস্ত আলোচনা তাঁর চারজন অতি অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্যতম শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁর কড়চায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সারা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে সেখান থেকে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ উদ্ধার করেন, সেগুলো হচ্ছে– 'ব্রহ্ম-সংহিতা' এবং 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'। ভগবদ্ভক্তদের কাছে এ গ্রন্থ দুটি অমূল্য সম্পদস্বরূপ। তারপর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসেন।

প্রতাপরুদ্রকে কৃপা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে ফিরে এলে সমস্ত উৎকণ্ঠিত ভক্তরা যেন নবজীবন লাভ করলেন। মহাপ্রভু সেখানে অবস্থান করে তাঁর অপ্রাকৃত ভগবৎ-উপলব্ধির উন্নত লীলারস আস্বাদন করেছিলেন। সে সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে তাঁর দর্শন দান। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত। তিনি নিজেকে মনে করতেন জগন্নাথদেবের এক অনুগত ভৃত্য এবং তাঁর কাজ ছিল মন্দির মার্জন করা। তাঁর এ বিনীত মনোভাবের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও রামানন্দ রায় উভয়ের কাছেই অনুরোধ করেছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর এই দুই মহান ভক্তের অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সেই অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের বলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ী এবং স্ত্রীলোকদের সঙ্গ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। কোনো স্ত্রীলোক তাঁকে প্রণাম জানাবার জন্যও তাঁর কাছে আসতে পারতো না। মহিলাদের বসতে দেওয়া হতো মহাপ্রভুর থেকে অনেক দূরে। আদর্শ শিক্ষক এবং আচার্যরূপে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সন্ন্যাস আশ্রম পালন করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণ সম্বন্ধে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আচার্যরূপে তিনি ছিলেন বজ্রের চেয়েও কঠোর এবং ফুলের চেয়েও কোমল। তাঁর এক পার্ষদ, ছোট হরিদাস কামার্ত দৃষ্টিতে এক স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়েছিল বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন এবং আর কখনোই তাকে গ্রহণ করেননি, যদিও অন্য সমস্ত ভক্তরা ছোট হরিদাসের এ অপরাধের জন্য তাকে ক্ষমা করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার

ফলে মনের দুঃখে ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করেছিল এবং তার আত্মহত্যার সংবাদ যখন মহাপ্রভুকে জানানো হয়, তখনও মহাপ্রভু তার সেই অপরাধের কথা ভুলতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন যে, তার অপরাধের জন্য সে উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-বিধানসমূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতেন। তাই যদিও তিনি জানতেন যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত, তবুও যেহেতু তিনি ছিলেন রাজা এবং বিষয়ী, তাই তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর আদর্শ আচরণের শিক্ষা দান করেছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক এবং ধন-সম্পদের সাথে কোনোই যোগাযোগ থাকা উচিত নয়। তাঁর উচিত সবসময় সব রকমের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা। মহারাজ প্রতাপরুদ্র অবশ্য অবশেষে ভক্তদের সুনিপুণ আয়োজনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত ভক্তিমার্গের নবাগত ভক্তদের উপর ভগবানের চেয়ে বেশি কৃপা করেন। তাই শুদ্ধভক্ত কখনোই অন্য শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করেন না। ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ হলে পরম দয়ালু ভগবান কখনো কখনো সে অপরাধ মার্জনা করে দেন। কিন্তু ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধ ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে যাঁরা ভক্তিমার্গের উন্নতি সাধন করতে চান তাঁদের পক্ষে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে ছিলেন, তখন তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁর হাজার হাজার ভক্ত রথযাত্রার সময় সেখানে আসতেন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার আগের দিন মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন হতো। তা ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হতো। এটিই হচ্ছে জনসাধারণকে পারমার্থিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করার পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সংকীর্তন যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন এবং পৃথিবীর সবকটি দেশের নেতারা এই পারমার্থিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আজ সারা পৃথিবীর মানুষই এই শান্তি ও সৌহার্দ্যের অন্বেষণ করছে।

ঝাড়িখণ্ডে সংকীর্তন

এর কিছুদিন পরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার বৃন্দাবন এবং তার নিকটবর্তী তীর্থস্থানগুলো দর্শন করার জন্য উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন মধ্য ভারতের ঝাড়িখণ্ডের বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বনের সমস্ত হিংস্র পশুরা তাঁর সঙ্গে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে দুহাত তুলে নৃত্য করেছিল। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে বনের পশুরা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে, সুতরাং সভ্য মানুষের আর কী কথা! কোনো মানুষই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করতে অস্বীকার করতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলন জাতি, ধর্ম, দেশ ইত্যাদির দ্বারা সীমিত নয়। এখানেই সে মহামিলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে, তিনি তাঁর এই মহান আন্দোলনে বনের পশুদের পর্যন্ত যোগদান করতে দিয়েছিলেন।

সনাতন গোস্বামীর সাথে মিলন

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে তিনি প্রথম প্রয়াগে আসেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে রূপ গোস্বামী এবং তাঁর ছোট ভাই অনুপমের সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি বারানসিতে যান। সেখানে দুমাস ধরে তিনি সনাতন গোস্বামীকে পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

সনাতন গোস্বামীর পূর্বনাম ছিল সাকর মল্লিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারানসিতে অবস্থান করছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামীও তাঁর রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। পূর্বে তিনি ছিলেন বাংলার নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী। রাজকার্য থেকে ছাড়া পেতে তাঁকে প্রথমে একটু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কেননা, নবাব তাঁকে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু তবুও তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বারানসিতে এসেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে ভক্তিতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন।

মহাপ্রভু তাঁকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে, জড় জগতে জীবের বন্ধনের কারণ, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব, বিভিন্ন অবতার রূপে তাঁর প্রকাশ, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশ তিনি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর অপ্রাকৃত আলয়ের প্রকৃতি, ভক্তিমূলক কার্যকলাপ, তার বিভিন্ন স্তর, ধীরে ধীরে পারমার্থিক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, বিভিন্ন যুগে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লক্ষণ এবং শাস্ত্রের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁদের চেনবার উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এক বিরাট অধ্যায়ে সনাতন গোস্বামীকে দেওয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সাথে কথোপকথন

বারানসিতে তখন তিনি তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর আচার্যের আতিথ্য গ্রহণ করেন, যাঁদের সহায়তা করতেন এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তখন শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বারানসির সাধু-সমাজের নেতৃত্ব করছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারানসিতে আসেন, তখন তাঁর সংকীর্তনের প্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছিল। যেখানেই তিনি যেতেন, বিশেষ করে বিশ্বনাথ মন্দিরে, হাজার-হাজার তীর্থযাত্রী তাঁর অনুগামী হতো। কেউ কেউ তাঁর রূপে আকৃষ্ট হতো এবং অন্যরা তাঁর মধুর কীর্তনে আকৃষ্ট হতো। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করে। বারানসিতে এখনো অসংখ্য মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেখা যায়। সংকীর্তনরত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে কিছু লোক মনে করেন যে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নারায়ণ। সেই সংবাদ মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কাছে পৌঁছায়।

ভারতবর্ষে সবসময়ই মায়াবাদ-সম্প্রদায় এবং ভাগবত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পারমার্থিক বিরোধিতা রয়েছে এবং তাই এ সংবাদ যখন প্রকাশানন্দের কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এবং তাই

যারা সেই সংবাদ তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল, তাদের কাছে তিনি মহাপ্রভুর নিন্দা করে বলেন– "ভাবুকের মতো নর্তন-কীর্তন করা সন্ন্যাসীর কাজ নয়।" প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন বেদান্ত-দর্শনের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং তিনি তাঁর অনুগামীদের উপদেশ দিলেন সংকীর্তনে যোগদান না করে বেদান্ত পাঠে মনোযোগ দিতে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক ভক্ত (ব্রাহ্মণ), মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রকাশানন্দের এ সমালোচনায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করেন। প্রকাশানন্দকে যদিও সেই ব্রাহ্মণ কয়েকবার 'চৈতন্য' নামটি উচ্চারণ করতে শুনেছিলেন, কিন্তু তিনি একবারও 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে চাননি এবং তা দেখে সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্মিত হেসে তখন সেই ব্রাহ্মণকে বোঝালেন কেন মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে পারে না। তিনি বলেছিলেন–

মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী। 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। 'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ' – দুইত 'সমান' ॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'– তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাহি – তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম– নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৭/১২৯-১৩২

"তাই কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'লীলাবিলাস' ইত্যাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা স্বপ্রকাশ। কৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি সবই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসম, সবই সচ্চিদানন্দময়।"

তিনি আরো বললেন, "ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার যে আনন্দ (ব্রহ্মানন্দ), শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের মাধুর্য তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আনন্দময়। তা যদি না হতো তা হলে ব্রহ্মজ্ঞানীরা ভগবানের লীলাবিলাসে আকৃষ্ট হতেন না।"

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা এক মহাসভার আয়োজন করেছিলেন, সেখানে তাঁরা প্রকাশানন্দ সরস্বতীসহ বারানসির সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ সভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী, এই দুই বিদগ্ধ পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয় এবং সংকীর্তন আন্দোলনের পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে বর্ণনা করা হলো।

বিখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন–

বেদান্ত পঠন, ধ্যান–সন্ন্যাসীর ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবুকের কর্ম ॥

তখন মহাপ্রভু অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিলেন–

শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥

এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে বেদান্ত পাঠের অযোগ্য বলে মনে করে এ কলিযুগের অসংখ্য মূর্খের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ ধরনের মূর্খেরা যেহেতু অনধিকার চর্চা করে বেদান্ত পাঠ করছে এবং তাদের মনগড়া বিকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করছে, তাই সমাজে আজ

এত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন–

মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার। 'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা, – এই মন্ত্র সার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম। সর্বমন্ত্রসার নাম –এই শাস্ত্রমর্ম ॥
এত বলি এই শ্লোক শিখাইল মোরে। কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

–চৈ.চ. আদি ৭/৭২, ৭৪-৭৬

"আমার গুরুদেবের কাছ থেকে এ আজ্ঞা পেয়ে আমি সর্বক্ষণ এ নাম উচ্চারণ করি এবং তার ফলে আমি এখন উন্মাদ হয়ে গেছি। যখনই আমি এ নাম উচ্চারণ করি, তখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাই এবং আমি কখনো হাসি, কখনো কাঁদি, আবার কখনো উন্মত্তের মতো নৃত্য করি। আমি মনে করেছিলাম যে, এভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে আমি যথার্থই পাগল হয়ে গেছি। তাই আমি আমার গুরুদেবের কাছে গিয়ে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতাম–

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাই, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥

"সে কথা শুনে আমার গুরুদেব বললেন–

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

তিনি বললেন– "এ হচ্ছে জীবনের পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। কৃষ্ণপ্রেমের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ– এ চার পুরুষার্থ তৃণতুল্য। ভগবৎ-প্রেম মুক্তিরও উপরের বিষয়, তাই তাকে বলা হয় পঞ্চম পুরুষার্থ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। আর তোমার হৃদয়ে যে সেই প্রেমের উদয় হয়েছে, তা তোমার বহু ভাগ্যের ফল।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে সেকথা শুনে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত অধ্যয়ন করলে ক্ষতি কী?" প্রকাশানন্দ সরস্বতী জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্বে নবদ্বীপে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি যে নিজেকে মহামূর্খ বলে ঘোষণা করছেন, তার নিশ্চয়ই কোনো নিগূঢ় অর্থ রয়েছে। তাঁর কাছ থেকে এ প্রশ্ন শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা যদি দুঃখ না পান, তাহলে আমি আপনাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেব।" সেকথা শুনে সমস্ত সন্ন্যাসীরা বললেন–

তোমার বচন শুনি, জুড়ায় শ্রবণ। তোমার মাধুরী দেখি, জুড়ায় নয়ন ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন– "বেদান্ত-সূত্র হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। তাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব– এসমস্ত দোষ নেই। উপনিষদের বাণী বেদান্ত-সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে এবং তা-ই হচ্ছে বেদান্ত-সূত্রের মৌলিক অর্থ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তার যে গৌণ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন, তার সঙ্গে সূত্রের কোনো সম্পর্ক নেই।

"ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে ভগবানকে বোঝান হচ্ছে, যিনি চিদৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ এবং যাঁর চেয়ে বড় অথবা সমান আর কেউ নেই, তাঁর বিভূতি, দেহ– সবই চিন্ময়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর চিৎ-বিভূতি আচ্ছাদন করে তাঁকে 'নিরাকার' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর দেহ, স্থান, পরিবার– এ সবই চিদানন্দময়। শঙ্করাচার্য যে এভাবে বেদান্ত-সূত্রের বিকৃত অর্থ করেছেন, তাতে তাঁর কোনো দোষ নেই, কেননা তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞাবাহী দাস। ভগবানের আজ্ঞাতেই তিনি এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এ মতবাদ যে শ্রবণ করে তার সর্বনাশ হয়। কেননা, পরমেশ্বর ভগবানের দেহকে প্রাকৃত বলে মনে করা সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ।"

জগন্নাথপুরীতে তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যে কথা বলেছিলেন, সে কথাই তিনি তাঁদের বললেন এবং তাঁর প্রবল যুক্তির কাছে বেদান্ত-সূত্রের মায়াবাদ ভাষ্য সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হলো। সেখানকার সমস্ত সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে চিনতে পেরে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন–

বেদময়-মূর্তি তুমি –সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ– পূর্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥

সমস্ত সন্ন্যাসীরা তখন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হলেন এবং তাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মাঝখানে বসিয়ে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এভাবে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের আত্মসাৎ করার ফলে বারানসিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল এবং হাজার হাজার মানুষ তাঁকে দর্শন করার জন্য আসতে লাগল। এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্য সমস্ত আধ্যাত্মিক মতবাদ পরাস্ত করে ভাগবত-ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর বারানসিতে সকলেই সংকীর্তনের অপ্রাকৃত আনন্দে নিমজ্জিত হলেন।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে গমন

মথুরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান দর্শন করতে যান। তারপর তিনি বৃন্দাবনে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অতি বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে, আর তার ওপর সন্ন্যাসীরূপে তিনি ছিলেন সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের গুরু। কিন্তু তিনি সব শ্রেণীর বৈষ্ণবদের কাছ থেকে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। মথুরার সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ সমাজকে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে ভোজন করেছিলেন, কেননা সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শাখায় দীক্ষিত।

বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যমুনার চব্বিশটি বিশেষ বিশেষ ঘাটে স্নান করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবনের বারোটি বিশেষ বিশেষ বনে ভ্রমণ করেছিলেন। সেই সমস্ত বনের পশুপাখিরা তাঁকে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল। সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে–

পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া। প্রভুকে বেড়য় আসি হুঙ্কার করিয়া ॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে। বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥

সুস্থ হইয়া প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডুয়ন। প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥
কষ্টে-সৃষ্ট্যে ধেনু সব রাখিল গোয়াল। প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে। ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥
শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি 'পঞ্চম' গায়। শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায় ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে। অঙ্কুর পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥
ফুল-ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন 'ভেট' লইয়া যায় ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম। আনন্দিত– বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥
তা-সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে। সবা সনে ক্রীড়া করে হইয়া তার বশে ॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে। 'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল–বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি। প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৭/১৯৪-২০৬

বৃন্দাবনের যেসমস্ত বিশেষ বিশেষ স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, তার কয়েকটি হচ্ছে–কাম্যবন, আদিশ্বর, পাবন সরোবর, খাদিরবন, শেষশায়ী, খেলা তীর্থ, ভাণ্ডীর বন, ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, মহাবন, গোকুল, কালীয়হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য, কেশীতীর্থ ইত্যাদি। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের স্থানটি দর্শন করছিলেন, তখন তিনি প্রেমাবেশে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। যতদিন তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি অক্রুর ঘাটে অবস্থান করেছিলেন।

প্রয়াগে শ্রীরূপ শিক্ষা

মহাপ্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস বিপ্র মাঘ মেলার সময় প্রয়াগে স্নান করার জন্য সেখানে তাঁকে যেতে অনুপ্রাণিত করলেন। সেই আবেদনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্মত হয়েছিলেন এবং কয়েকজন সঙ্গীসহ প্রয়াগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন পাঠানের সাক্ষাৎ হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান-শাস্ত্রে পারদর্শী মৌলানা। তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর সহচরদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কিছু কথোপকথন হয় এবং তিনি সেই মৌলানাকে বোঝান যে, কোরানেও প্রচ্ছন্নভাবে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের এবং ভাগবত-ধর্মের কথা রয়েছে। তারপর সেসমস্ত পাঠানেরা তাঁর আনুগত্য বরণ করে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন।

তিনি যখন প্রয়াগে উপস্থিত হন, তখন শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম তাঁর সঙ্গে বিন্দুমাধব মন্দিরের সন্নিকটে সাক্ষাৎ করেন। তখন সমস্ত প্রয়াগবাসী গভীর শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বাগত জানান। বল্লভ ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল নামক গ্রামে বাস করতেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে অবস্থান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যমুনায় ঝাঁপ দেন। তখন বহু কষ্টে বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে অচেতন অবস্থায় জল থেকে তুলে তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দশদিন ধরে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বোঝান যে, চুরাশি লক্ষ

বিভিন্ন যোনিতে জীব ভ্রমণ করে। তাদের মধ্যে মনুষ্য জাতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই মনুষ্যের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা বৈদিক নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁদের বলা হয় ধর্মাচারী এবং সেই ধর্মাচারীদের মধ্যে অধিকাংশই 'কর্মনিষ্ঠ'। এরকম অসংখ্য কর্মনিষ্ঠর মধ্যে 'একজন জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ। আবার অসংখ্য জ্ঞানীর মধ্যে দুয়েকজন কেবল 'মুক্ত'। আর এরকম কোটি কোটি মুক্তের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ছিলেন শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যখন তাঁর কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি দুনৌকা বোঝাই স্বর্ণ তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করার জন্য তিনি যখন গৃহত্যাগ করলেন, তখন তিনি তাঁর সেই সম্পদের অর্ধাংশ ভগবানের সেবায় এবং তাঁর ভক্তের সেবায় দান করেছিলেন, এক চতুর্থাংশ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দিয়েছিলেন এবং অপর এক চতুর্থাংশ ভবিষ্যতের জন্য গচ্ছিত রেখেছিলেন। এভাবে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তীকালের সমস্ত গৃহস্থদের জন্য এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে বলেছিলেন যে, এই ভক্তি হচ্ছে একটি লতার মতো এবং তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, অত্যন্ত যত্ন-সহকারে এই ভক্তিলতাকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধরূপী মত্ত হস্তীর আক্রমণ থেকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে রক্ষা করতে। আর তাছাড়া সেই লতাটিকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, নির্বিশেষবাদের সাযুজ্য মুক্তি এবং হঠযোগ-সিদ্ধির বাসনা থেকেও রক্ষা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক। তেমনই জীব-হিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা এগুলোও ভগবদ্ভক্তির বা ভাগবত-ধর্মের পথে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক। শুদ্ধভক্তি যেন অবশ্যই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা, সকাম কর্মের বাসনা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের কলুষ থেকে মুক্ত থাকে। সবরকম উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয় যখন সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়, তখনই কেবল বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়। হৃদয়ে যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা থাকে অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা থাকে অথবা যোগ-সিদ্ধির বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধভক্তি লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

ভগবদ্ভক্তি দুটি স্তরে অনুশীলন করা হয়। যথা– প্রাথমিক সাধনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ। সাধন-ভক্তি অনুশীলন করতে করতে 'রতি'র উদয় হয়, রতি থেকে 'প্রেম'। প্রেম বৃদ্ধির ফলে যথাক্রমে – স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং সর্বোচ্চ স্তরে মহাভাবের উদয় হয়। ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির পাঁচটি স্তর রয়েছে–

১) জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হওয়ার পর পারমার্থিক উপলব্ধির যে স্তর, তাকে বলা হয় শান্ত।

২) তারপর যখন ভগবানের দিব্য ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অপ্রাকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন ভক্ত দাস্য রসে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

৩) এই দাস্য রস বর্ধিত হয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ হয় এবং তারও ঊর্ধ্বে ভক্ত ভগবানের সমবয়সী খেলার সাথী বলে মনে করেন। এই দুটি স্তরকেই সখ্য ভক্তির স্তর বলা হয়।

৪) ভগবদ্ভক্তি আরো বর্ধিত হয়ে ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বাৎসল্য স্নেহের যে বিকাশ হয়, তাকে বলা হয় বাৎসল্য ভক্তি।

৫) তারও পরে হচ্ছে মাধুর্য প্রেম এবং এ স্তরকে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর বলে গণ্য করা হয়। এ স্তরগুলো প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃত এবং তাদের মধ্যে গুণগতভাবে কোনো ভেদ নেই।

এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন এবং তাঁকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের স্থানগুলো, যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, উদ্ধার করার দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারানসিতে ফিরে যান এবং সেখানে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। সেকথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লিখিতভাবে তাঁর শিক্ষা কেবল আটটি শ্লোকের মধ্যে রেখে গেছেন। সেই শ্লোকগুলো 'শিক্ষাষ্টক' নামে পরিচিত। তাঁর অপ্রাকৃত শিক্ষা বিশদভাবে লিখে রেখে গেছেন তাঁর মুখ্য অনুগামী ছয় গোস্বামী এবং তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত যে তত্ত্ব-দর্শন তা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তা যে এ যুগের যথার্থ ধর্ম, সেকথা পৃথিবীর সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীরা একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। এ ধর্ম বিশ্ব-ধর্ম রূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত হওয়ার শক্তি সমন্বিত। আমরা উদগ্রীব হয়ে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছি, যেদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভাগবত-ধর্ম বা প্রেমধর্ম পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত হবে এবং সমস্ত জগতকে তা অপ্রাকৃত শান্তির দিব্য আনন্দে প্লাবিত করবে।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৪৮ বছর এ জগতে তাঁর প্রকট লীলাবিলাস করেন। তারপর ১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীশ্রী জগন্নাথপুরীতে তিনি অপ্রকট হন।
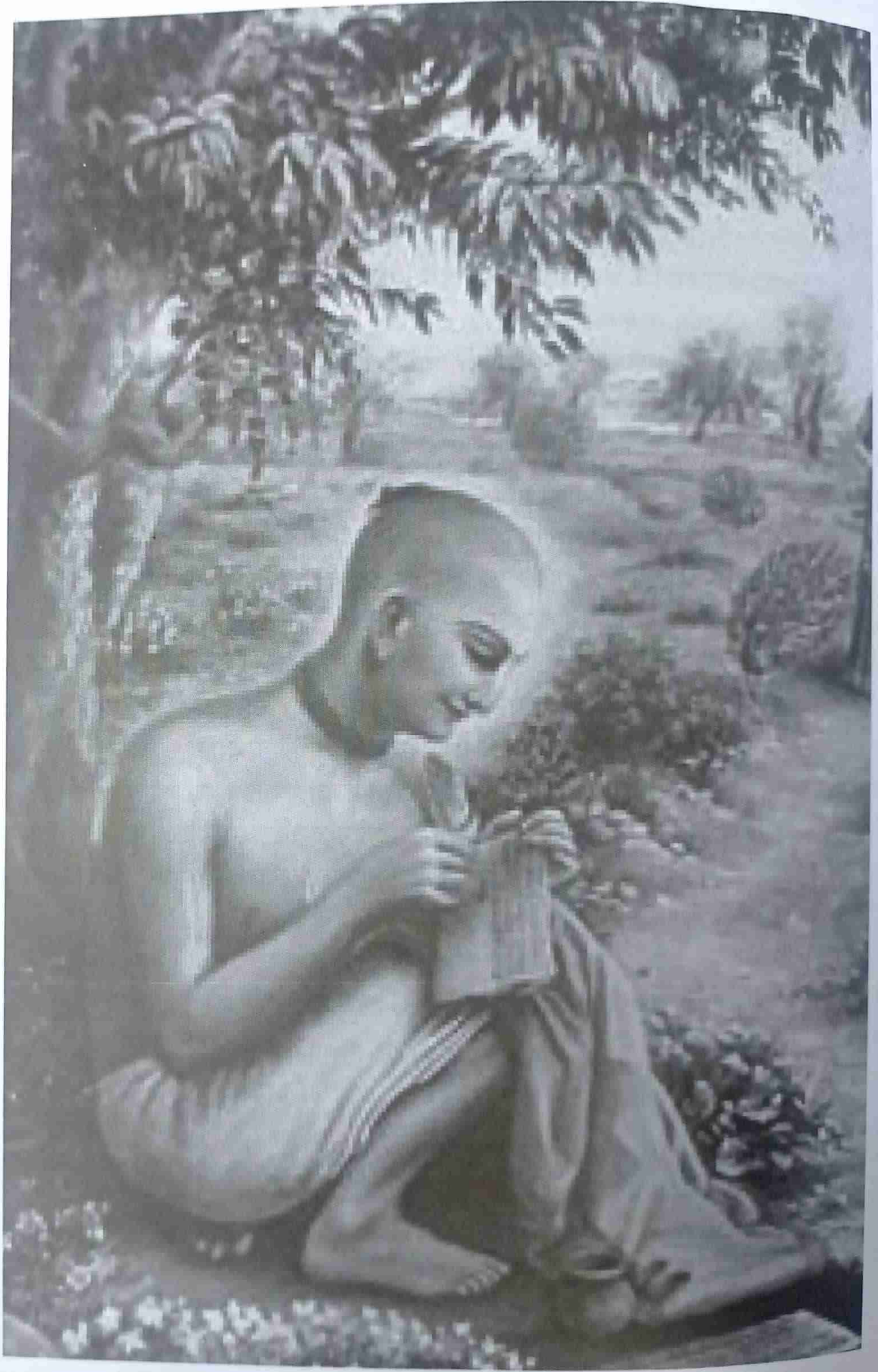
শ্রীল রূপ গোস্বামী

শ্রীল রূপ গোস্বামী

আবির্ভাব ও পরিচয়

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট সংস্থাপক রূপে বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সভ্যগণ কর্তৃক পূজিত। শ্রীব্রজমণ্ডলে কৃষ্ণচন্দ্রের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশ, ভক্তিসদাচার প্রচার এবং সাধন ভজনের জন্য উচ্চাঙ্গের বহু ভক্তিরস গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের রত্নসিংহাসনে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৯ পরিচ্ছেদে) বলেছেন–

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলীর্বাতাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎ কঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ ন প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম ॥

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে ভগবান যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চারিত করে লোক সৃষ্টি বিস্তার করেছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে শ্রীরূপ গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চারপূর্বক কালবশে বিলুপ্ত বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় রসকেলীকথা পুনর্বার সর্বত্র বিস্তার করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সজ্জনতোষণী পত্রিকা থেকে জানা যায়– শ্রীল রূপ গোস্বামীর আবির্ভাব ১৪১১ শকাব্দে বা ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে, প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর, ব্রজে বাস ৫৩ বছর, গৃহে স্থিতি ২২ বছর এবং অন্তর্ধান ১৪৮৬ শকাব্দ শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী।

ষড়গোস্বামীর মধ্যে শ্রীল রূপ গোস্বামী অন্যতম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে এ জগতে তাঁর শিক্ষা ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রচার করেছেন। ভক্তগণ এ দুজনকে সেনাপতি বলে অভিহিত করেছেন।

শ্রীল কবি কর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'-তে শ্রীরূপ গোস্বামী সম্বন্ধে লিখেছেন–

শ্রীরূপমঞ্জরীখ্যাত যাসীদ্ব বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্যা গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ ॥

–গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা– ১৮০

"পূর্বে যিনি বৃন্দাবনে রূপমঞ্জরী নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি অধুনা গৌরলীলা পুষ্টির জন্য রূপগোস্বামীরূপে প্রকটিত হয়েছেন।" রাধারাণীর অনুগতা সখীগণের মধ্যে প্রধানা ললিতা সখী, ললিতা-অনুগতা মঞ্জরীগণের মধ্যে প্রধানা রূপমঞ্জরী। এজন্য গৌরলীলায় ষড়গোস্বামীর মধ্যে প্রধান রূপগোস্বামী।

শ্রীল রূপগোস্বামীর বংশ পরিচয় শ্রীল জীব গোস্বামী 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী'-তে উল্লেখ করেছেন– শ্রীসর্বজ্ঞ জগৎগুরু নামে কর্ণাট দেশাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অভ্যুদয়কাল ১৩০৩ শকাব্দ। শ্রীসর্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ দেব। শ্রীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র, শ্রীরূপেশ্বর ও

হরিহর। রূপেশ্বর ছিলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং হরিহর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধানের পর রূপেশ্বর ছোট ভাই হরিহর কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। তখন তিনি আটটি অশ্বসহ পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন এবং পৌলস্ত্যের রাজা শ্রীশিখরেশ্বরের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীভাব হয়। রূপেশ্বরের পরম সুন্দর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের নাম রাখা হয় শ্রীপদ্মনাভ দেব। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাসের অভিপ্রায়ে নৈহাটি নামক গ্রামে এলেন এবং সেখানে সাধ্বী পত্নীসহ সুখে বাস করতে লাগলেন। তিনি শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি পূজা করতেন। শ্রীপদ্মনাভ দেবের ১৮টি কন্যা এবং পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে ৫টি পুত্র হয়। মুকুন্দ দেবের পুত্র কুমারদেব। তিনি পরম সদাচারী ও বিপ্রকুলের রত্নসদৃশ ছিলেন এবং নিরন্তর যাগ-যজ্ঞ পরায়ণ ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বজনদের দ্বারা পীড়িত হয়ে তিনি নৈহাটী পরিত্যাগ করে বঙ্গদেশে 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ' গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানকার স্বজনদের দ্বারা তিনি পরম আদৃত হলেন। কুমারদেব যশোরে ফতেয়াবাদ নামক গ্রামেও এক বসতবাড়ি করেছিলেন। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন। তাঁর মধ্যে তিনটি পুত্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ ॥
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চিত অতিশয় ॥

–ভক্তিরত্নাকর ১/ ৫৬৭-৫৬৮

শ্রীরূপ গোস্বামীর পিতৃপ্রদত্ত নাম সন্তোষ। তাঁর বড় ভাই হলেন শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং ছোট ভাই শ্রী বল্লভ বা অনুপম। শ্রীঅনুপমের পুত্র হলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

শিক্ষা গ্রহণ

শ্রীরূপ-সনাতন ছিলেন এক প্রাণ। তাঁরা এক সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন। সনাতন গোস্বামী 'দশম টিপ্পনী'-এর বন্দনাতে যাঁদের নিকট বেদান্ত আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁদের বন্দনা করেছিলেন–

ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্ ।
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্ ॥

"আমি অধ্যাপক সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গৌড়দেশের বিদ্যাভূষণ, বিদ্যা বাচস্পতি, রসপ্রিয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য এবং বাক্‌চতুর অধ্যাপক রাম ভদ্রাদিকে বন্দনা করি।" এ শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী যাঁদের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁদের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরূপ-সনাতন অল্প বয়সে সকল বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরম বিদ্বান হয়েছিলেন। তাঁদের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

মন্ত্রিত্ব লাভ

একবার রাজা হোসেন শাহ্ হিঙ্গা পিয়াদা নামে এক পদাতিককে নিয়ে মন্দিরা স্তম্ভ দেখতে গিয়েছেন। স্তম্ভের আস্তরণ হয়নি দেখে তিনি তন্ময় অবস্থায় হিঙ্গাকে বললেন, "তুমি শীঘ্র 'মোরগ্রাম' গমন করো"। কেন সেখানে যেতে হবে তা বলার মুহূর্তে মুরশীদ এসে পেছন থেকে ডাকলে হিঙ্গাকে আর কাজের কথা বলা হলো না। কিন্তু বারবার দৃষ্টিপাত করতে থাকলে হিঙ্গা ভীত হয়ে খোদাকে স্মরণ করতে করতে মোরগ্রাম মাধাইপুরে গেলেন। রূপ-সনাতন তখন হিঙ্গাকে অন্তর্মনা হয়ে এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে তার কাছ থেকে বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে উপযুক্ত বুদ্ধি দিলেন। রূপ-সনাতনের বুদ্ধি অনুসারে হিঙ্গা রাজমিস্ত্রী নিয়ে বাদশাহর কাছে উপস্থিত হলে রাজা হিঙ্গার বুদ্ধির প্রশংসা করে পুরস্কার দিতে চাইলে হিঙ্গা রূপ-সনাতন (সন্তোষ-অমর)-এর কথা রাজাকে বলল এবং অন্যান্য মুরশীদরাও এ দুই ভাইয়ের কথা শুনে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগল।

এ কথা শুনে গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ্ জোর করে শ্রীরূপ ও সনাতনকে এনে রাজমন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করেন। তাঁরা অনিচ্ছুক হলেও যবনরাজের ভয়ে রাজকার্য করতে লাগলেন। বাদশাহ তাঁদের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন তখন থেকে গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বসবাস করতে লাগলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ তাঁদের গৃহে আগমন করতেন এবং বহুবিধ শাস্ত্রচর্চাদি করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে বহু যত্নপূর্বক তাঁদের বাসস্থান প্রদান করতেন। গঙ্গার তীরে তাঁদের বসতবাড়ি স্থাপিত হওয়ায় আজও ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত।

রূপগোস্বামী শাসনবিভাগের বিশেষ দায়িত্বশীল উজীর (মন্ত্রী) পদবী লাভ করেছিলেন। রূপগোস্বামীর বাদশাহ প্রদত্ত নাম 'দবির খাস' এবং সনাতন গোস্বামীর নাম ছিল 'সাকর মল্লিক'।

রামকেলিতে মহাপ্রভুর সাথে মিলন

বারবার রূপ-সনাতনের দৈন্যপত্র পেয়ে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে নবদ্বীপের কুলিয়া হয়ে গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে গমন করেন। রূপ-সনাতনের সাথে সাক্ষাৎ করাই মহাপ্রভুর প্রধান উদ্দেশ্য। সেখানে মহাপ্রভুর সাথে রূপ-সনাতনের মিলন হয়।

ভৌমলীলায় জগদ্বাসীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ভক্ত ও ভগবান নিজেদের স্বরূপগত ভাব গোপন রাখার চেষ্টা করলেও পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বরূপগত ভাবের প্রাকট্য হয়। এজন্য রূপ-সনাতন মহাপ্রভুকে দর্শন করামাত্রই মহাপ্রভুতে আকৃষ্ট এবং মহাপ্রভুও তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সাংসারিক লোকের শিক্ষার জন্য তাঁরা সাংসারিক লোকের ন্যায় আচরণ করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অগণিত ভক্তসহ রামকেলি গ্রামে এলে তদানীন্তন বাংলার বাদশাহ হোসেন শাহ্ ভীত হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভুকে সন্দেহ করেছিলেন। কেশব নামে এক ক্ষত্রিয় ভক্ত মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তিনি বাদশাহকে বুঝিয়ে দিলেন– "একজন ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন, সঙ্গে দুচারজন লোক আছে, এতে ভয়ের কিছু নেই।" বাদশাহ রূপগোস্বামীকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে রূপগোস্বামীও

মহাপ্রভুর মহিমা বলে তাঁর সংশয় দূর করলেন। পরে রূপ-সনাতন দুই ভাই মাঝরাতে মহাপ্রভুর সাক্ষাতের আশায় প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সাথে মিলিত হলেন। তাঁরা রূপ-সনাতনকে মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে এলেন। তাঁরা দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করে গলবস্ত্র হয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হলেন। তারপর অঝোরে কান্না করতে লাগলেন।

জগাই-মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ। অধম পতিত পাপী আমরা দুইজন ॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম। গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম মোর হাতে-গলায় বান্ধিয়া। কুবিষয়বিষ্ঠা-গর্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের অত্যন্ত দৈন্যোক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে করুণায় আবিষ্ট হয়ে রূপ-সনাতন সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন, তাতে রূপ-সনাতন যে বদ্ধজীবের ন্যায় সাধারণ মানুষ নয়, তাঁরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে–

শুনি মহাপ্রভু কহে– শুন দবির খাস। তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন'। দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/২০৭-২০৮

তাঁদের প্রার্থনা শ্রবণ করে মহাপ্রভু বললেন– "প্রিয় দবির খাস, তোমরা দুই ভাই আমার পুরাতন (নিত্য) দাস। আজ থেকে তোমাদের নাম রূপ ও সনাতন। তোমাদের এ দৈন্য ত্যাগ করো। তোমাদের দৈন্য দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে।"

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন। তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে। সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥
ভাল হৈল, দুই-ভাই আইলা মোর স্থানে। ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই-কিঙ্কর আমার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।
এত বলি দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে। দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/২১২-২১৬

মহাপ্রভু বললেন– "আমার গৌড়ে আসার কোনো কারণ ছিল না, কেবল তোমাদের দুজনকে দেখার জন্যই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু আমার মনের কথা কেউ জানে না। খুব ভালো হলো যে, তোমরা দুই ভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো। এখন তোমরা ঘরে যাও। মনে কোনো ভয় করো না। জন্মে জন্মে তোমরা আমার নিত্য সেবক। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করবেন।"

ভক্তকৃপার দ্বারাই জীবের উদ্ধার হয়। জগদ্বাসীকে শিক্ষা দেবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর আদি ভক্তবৃন্দের দ্বারা রূপ-সনাতনকে আশীর্বাদ করালেন।

যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবনে যাইবার এ নহে পরিপাটী'॥

সনাতন গোস্বামীর এরূপ কথা শ্রবণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত করে, কানাই নাটশালা হতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

শ্রীরূপ–সনাতনের দ্বারা তিনি জগদ্বাসীকে শিক্ষা দেবেন– তার সূচনা হয় রামকেলি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাথে তাঁদের দেখা হওয়ার মধ্য দিয়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় রূপ-সনাতনের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, যা তাঁদের সংসার ত্যাগের ইঙ্গিতস্বরূপ। দুইভাই বিষয় ত্যাগের উপায় চিন্তা করে বহু ধন দিয়ে দুই ব্রাহ্মণকে বরণ করে কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ করালেন।

প্রয়াগে গমন

শ্রীল রূপগোস্বামী রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন গোস্বামীর জন্য গৌড়ের এক মুদি দোকানে দশ হাজার মুদ্রা রেখে অবশিষ্ট সমস্ত ধন নিয়ে নৌকাযোগে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে এলেন। সেখানে অর্ধেক ধন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দান করলেন। এক-চতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ আপদধন হিসেবে এক বিশ্বাসী বিপ্রের কাছে গচ্ছিত রাখলেন। মহাপ্রভু বনপথে কখন বৃন্দাবনে যাত্রা করবেন তা জানার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাজ ছেড়ে দিয়ে অসুস্থের ভান করে পণ্ডিতদের নিয়ে ঘরে ভাগবত আলোচনা করতে থাকলেন। বাদশাহ হুসেন শাহ্ প্রথমে বৈদ্যের মাধ্যমে এবং পরে নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষভাবে বললেন। কিন্তু শ্রীরূপের অনিচ্ছা দেখে বাদশাহ তাঁকে কারারুদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য উড়িষ্যায় যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন– এ কথা জানতে পেরে শ্রীরূপ গোস্বামীও গৃহত্যাগ করে তাঁর ভাই অনুপম মল্লিকসহ মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রূপগোস্বামী চিঠির মাধ্যমে সনাতন গোস্বামীকে এ সংবাদ জানিয়ে দেন। চিঠিতে রূপ গোস্বামী কারাগার থেকে যেকোনোভাবে মুক্ত হয়ে বৃন্দাবন যাবার জন্য সংকেত দিয়েছিলেন। রূপগোস্বামী প্রয়াগে এসে দাক্ষিণাত্যে বিপ্রগৃহে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। দন্তে দুইগুচ্ছ তৃণ ধারণ করে শ্রীরূপ ও অনুপম নানা শ্লোক উচ্চারণমুখে অত্যন্ত দৈন্যভরে বারবার মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতে থাকলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হয়ে বললেন– *"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে। বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে ॥"* ভগবানের অভক্ত চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্বপচকুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অধিক প্রিয়। ভগবান যেমন পূজ্য, তাঁর ভক্তও তেমনই পূজ্য। ভক্ত-মহিমাসূচক এমন শ্লোক উচ্চারণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু দুজনকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করে কৃপা করলেন। মহাপ্রভুর কৃপা লাভে কৃতার্থ হয়ে দুজনে করজোড়ে প্রণাম করলেন– "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥" রূপগোস্বামীর কাছ থেকে সনাতন গোস্বামীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে মহাপ্রভু ভবিষদ্বাণী করলেন যে, সনাতন গোস্বামী অচিরেই কারামুক্ত হয়ে তাঁর সাথে মিলিত হবেন। দাক্ষিণাত্যে বিপ্রের নিমন্ত্রণে শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রী অনুপম সেদিন সেখানে অবস্থান করার পর মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পেলেন।

বল্লভ ভট্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ

যমুনার অপর পাড়ে আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভ ভট্টের কাছে মহাপ্রভুর শুভাগমন-সংবাদ পৌঁছলে তিনি মহাপ্রভুর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তারপর মহাপ্রভুর প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখে বল্লভ ভট্ট চমৎকৃত হলেন। বল্লভ ভট্টকে দেখে শ্রীরূপ ও অনুপম দূর থেকে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। বল্লভ ভট্ট তাঁদের স্পর্শ করতে ইচ্ছুক হলে দুইভাই– তাঁরা অস্পৃশ্য পামর, তাঁদের স্পর্শ করা উচিত নয়, এই বলে দূরে সরে গেলেন। রূপ ও অনুপমের দৈন্য দেখে মহাপ্রভু প্রসন্ন হলেন, ভট্টের বিস্ময় হলো। মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে বললেন– তিনি বৈদিক কুলীন ব্রাহ্মণ, বয়সে প্রবীণ, রূপ-অনুপম তাঁর স্পর্শযোগ্য নয়, কারণ তাঁরা জাতিতে হীন। বল্লভ ভট্ট বুঝতে পারলেন, মহাপ্রভুর এ কথার মধ্যে কোনো রহস্য আছে। যাঁরা সর্বদা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁরা কী করে অধম হন। বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে ভক্তগণসহ নিজগৃহে এনে মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সেবা করলেন এবং মহাপ্রভুকে ভোজন করিয়ে ভুক্তাবশেষ প্রসাদ দ্বারা শ্রীরূপ ও অনুপমকে পরিতৃপ্ত করালেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভুর শিক্ষা

বল্লভ ভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে নৌকাযোগে দশ দিন অবস্থান করে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছলেন। সেখানকার নিভৃত স্থানে মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর মধ্যে শক্তি সঞ্চারপূর্বক কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব এবং কালধর্মে লুপ্ত বৃন্দাবনের রাসকেলিবার্তা বিস্তার করেছিলেন যা পরবর্তীতে 'শ্রীরূপশিক্ষা' নামে প্রসিদ্ধ হয়।

সেখানে মহাপ্রভু দশদিন ধরে শ্রীল রূপগোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। তিনি শ্রীল রূপগোস্বামীকে বোঝান যে, চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জীব ভ্রমণ করে। তাদের মধ্যে মনুষ্য জাতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই মনুষ্যের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা বৈদিক নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁদের বলা হয় ধর্মাচারী এবং সেই ধর্মাচারীদের মধ্যে অধিকাংশই 'কর্মনিষ্ঠ'। এরকম অসংখ্য কর্মনিষ্ঠের মধ্যে 'একজন জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ। আবার অসংখ্য জ্ঞানীর মধ্যে একজন বা দুজন কেবল 'মুক্ত'। আর এরকম কোটি কোটি মুক্ত-এর মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে বলেছিলেন যে, ভক্তি হচ্ছে একটি লতার মতো। তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, অত্যন্ত যত্ন সহকারে এ ভক্তিলতাকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধরূপী মত্ত হস্তীর আক্রমণ থেকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে রক্ষা করতে। তাছাড়া সেই লতাটিকে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, নির্বিশেষবাদের সাযুজ্য মুক্তি এবং হঠযোগ-সিদ্ধির বাসনা থেকেও রক্ষা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক। তেমনই জীব-হিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা- এগুলোও ভগবদ্ভক্তির বা ভাগবত-ধর্মের পথে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক।

শুদ্ধ-ভক্তি যেন অবশ্যই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা, সকাম কর্মের বাসনা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের কলুষ থেকে মুক্ত থাকে। সবরকম উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয় যখন সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়, তখনই কেবল বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়। 'বিরজা' 'ব্রহ্মলোক' ভেদি 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলক-বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেম ফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ। অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদগম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটী', 'জীবহিংসন'। 'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়। স্তব্ধ হইয়া মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥

–চৈ.চ. ম ১৯/১৫১-১৬১

হৃদয়ে যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা অথবা যোগসিদ্ধির বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধভক্তি লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

ভগবদ্ভক্তি দুটি স্তরে অনুশীলন করা হয়। যথা– প্রাথমিক সাধনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ। সাধন-ভক্তি অনুশীলন করতে করতে 'রতি'-র উদয় হয়, রতি থেকে 'প্রেম'। প্রেম বৃদ্ধির ফলে যথাক্রমে– স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং সর্বোচ্চ স্তরে মহাভাবের উদয় হয়। ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ লেখার সাক্ষাৎ নির্দেশ প্রয়াগে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পূর্ববিভাগ ১/২ শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামী তা ব্যক্ত করেন।

হৃদির্যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

"হৃদয়ে যাঁর প্রেরণা দ্বারা আমার মতো সামান্য কাঙ্গাল ভক্তিগ্রন্থ রচনায় প্রবর্তিত হয়েছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশদিন অবস্থান করে শ্রীল রূপগোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করে প্রয়াগ হতে বারানসি যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শ্রীল রূপগোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাথে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবন যেতে এবং বৃন্দাবন হতে প্রত্যাবর্তনকালে গৌড়দেশ হয়ে নীলাচলে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আদেশ করলেন।

নীলাচলে গমন

রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশ পালনের জন্য প্রয়াগ থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে একমাস অবস্থান করেছিলেন। তারপর সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অনুসন্ধানে গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে এলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী কাশী হতে প্রয়াগে এসে

রাজপথ দিয়ে মথুরা যাত্রা করায় শ্রীরূপ-অনুপমের সাথে সনাতনের সাক্ষাৎ হয়নি। সনাতন গোস্বামী মথুরায় এসে সুবুদ্ধি রায়ের কাছ থেকে শ্রীরূপ ও অনুপমের সকল বৃত্তান্ত জানতে পারলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী অনুপমসহ গঙ্গাতীর-পথে গৌড়দেশে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে (গঙ্গাতীরে) অনুপম দেহ রাখেন। বৃন্দাবনে থাকাকালেই শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁর রচিত 'নাটক চন্দ্রিকা' অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা নাটকে নন্দীশ্লোক রচনা করেছিলেন। (গ্রন্থের শুরুতে আশীর্বচন, নমস্কার, বস্তুনির্দেশাদিরূপ যে কার্য তাকে 'নন্দী' বলে।)

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কারণে শ্রীরূপগোস্বামীর গৌড়দেশ হতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাথে একত্রে পুরী যাওয়ার সুযোগ হয়নি। এজন্য তাঁর পুরীতে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়েছিল। গৌড়দেশ থেকে পুরী আসার সময় তিনি উড়িষ্যার সত্যভামাপুরে একরাত অবস্থান করেছিলেন। সত্যভামাপুর গ্রামে তিনি সত্যভামা কর্তৃক তাঁর নাটক পৃথকভাবে লেখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

স্বপ্ন দেখি রূপ-গোঁসাই করিলা বিচার। সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক নাটক করিবার ॥
ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা। দুইভাগ করি এবে করিমু রচনা ॥

—চৈ.চ. অন্ত্য ১/৪৩-৪৪

শ্রীল রূপগোস্বামী পুরীতে পৌঁছে দৈন্যবশত জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করতে, এমনকি কাশীমিশ্র-ভবনে মহাপ্রভুর সাথে দেখা করতে গেলেন না। জগন্নাথ মন্দিরে বা কাশীমিশ্র-ভবনে তাঁর যাওয়াতে কোনো বাধা ছিল না, কেননা তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবুও তিনি ম্লেচ্ছের অধীনে চাকুরী করেছিলেন বলে নিজেকে ম্লেচ্ছবোধে সেখানে গেলেন না। তিনি সিদ্ধবকুলে হরিদাস ঠাকুরের নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে সর্বোত্তম অধিকারী জেনেও রূপগোস্বামীর মাধ্যমে জগৎবাসীকে ভক্তির অনুকূল দৈন্য শিক্ষা দেয়ার জন্য রূপগোস্বামীকে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে আদেশ করেননি।

হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥

—ভক্তিরত্নাকর ১/৬৩১

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের স্থানে রূপগোস্বামীকে দর্শন দানের জন্য হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। রূপগোস্বামীর দৈন্য-রসসিক্ত-প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। হরিদাস ঠাকুর ও রূপগোস্বামীর সাথে বসে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুশল প্রশ্ন, সনাতনের বার্তা প্রভৃতি বিষয়ে সংলাপ এবং ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। তারপর একদিন মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে নিয়ে সেখানে সমবেত হলে রূপগোস্বামী সকলের চরণ বন্দনা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হয়ে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারা রূপগোস্বামীকে আশীর্বাদ করালেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল রূপগোস্বামী গোবিন্দের মাধ্যমে প্রতিদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ পেয়ে কৃতকৃতার্থ হলেন। একবার মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে নির্দেশ দিলেন—

কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছ থেকে ভঙ্গিক্রমে এরূপ নির্দেশ প্রাপ্তি শ্রীল রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' রচনার মূল সূত্রপাত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসত্যভামা দেবীর ইচ্ছা জেনে শ্রীল রূপগোস্বামী 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নামে দুটি পৃথক নাটক রচনা করলেন।

রথাগ্রে মহাপ্রভুর ভাব অবগত হলেন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীল রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর হৃদয়ের গুঢ়ভাবসমূহ অবগত হয়েছিলেন। রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শনে রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে কাব্য প্রকাশের সামান্য একটি শ্লোক উচ্চারণ করে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করেছিলেন। উক্ত শ্লোকের গুঢ়ার্থ স্বরূপ দামোদর ব্যতীত সকলেরই দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী একটি স্বরচিত শ্লোকে এর গুঢ়ার্থ সুমধুর ভাষায় ব্যক্ত করে তালপাতায় লিখলেন। তিনি তালপাতাটি চালে গুঁজে সমুদ্রস্নানে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেখানে এসে চালে গুঁজা তালপাতাটি খুলে শ্লোক পাঠ করে চমৎকৃত হলেন–

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

–পদ্যাবলী

"হে সহচরি, আমার সেই অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই কুরুক্ষেত্রে আমার মিলন হয়েছে, আমিও সেই রাধা, আর এখন আমাদের মিলন হয়েছে। তা অত্যন্ত সুখকর, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত যমুনা তীরের বনের জন্য আমার চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে।"

শ্রীল রূপগোস্বামী স্নান করে ফিরে এলে "আমার হৃদয়ের গুঢ়ার্থ তুমি কী করে বুঝলে?" –এই বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে চাপড় মেরে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন।

সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইলা। স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিলা ॥
মোর অন্তর-বার্তা রূপ জানিল কেমনে। স্বরূপ কহে- জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ১/৮৫-৮৬

রূপের কবিত্বের প্রশংসা

একদিন শ্রীল রূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব নাটক রচনা করছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হঠাৎ সেখানে উপনীত হয়ে রূপগোস্বামীর মুক্তার ন্যায় হস্তাক্ষরের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর তালপাতায় লিখিত কৃষ্ণনামের মহিমা সূচক অপূর্ব শ্লোক পাঠ করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃকৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

–বিদগ্ধমাধব

" 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি যে কত অমৃতের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তা জানি না। যখন এ নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন মনে হয় তা যেন মুখে নৃত্য করছে। তখন বহু মুখ পাওয়ার ইচ্ছা হয়। সেই নাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন লক্ষ লক্ষ কর্ণ লাভ করার স্পৃহা জন্মায় এবং যখন এ দিব্যনাম চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনী রূপে উদিত হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে পরাজিত করে এবং তাই তখন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া স্তব্ধ হয়।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রূপগোস্বামীকৃত শ্লোকে কৃষ্ণনামের অদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করে পরমোল্লাসে নৃত্য করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাহা নাহি শুনি ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু– স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য আদি ভক্তগণকে নিয়ে রূপগোস্বামীর নিকট এলেন। রূপগোস্বামীকৃত *প্রিয়ঃ সোহয়ং...* শ্লোক স্বরূপদামোদর পাঠ করে সবাইকে শুনালেন। মহাপ্রভুর কৃপার ফলেই ব্রহ্মার দুর্বোধ্য সিদ্ধান্ত রূপগোস্বামীর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে– এই বলে রায় রামানন্দ ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশক্রমে রূপগোস্বামী কৃষ্ণনামের মহিমাত্মক, *তুণ্ডে তাণ্ডবিনী...* শ্লোক পাঠ করলে ভক্তগণ আনন্দে বিস্মিত হলেন। *সবে বলে নাম-মহিমা শুনেছি অপার। এমন মাধুর্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥* শ্রীরায় রামানন্দ বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধবের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রূপগোস্বামীর সাথে আলোচনা করে চমৎকৃত হলেন। রায় রামানন্দ রূপগোস্বামীর নিকট ইষ্টদেব সম্বন্ধে বর্ণনা শুনতে ইচ্ছা করলেন। রূপগোস্বামী প্রথমে মহাপ্রভুর সামনে বলতে সঙ্কোচবোধ করলেন। মহাপ্রভুর বারবার নির্দেশক্রমে পরে তিনি তা পাঠ করে শুনালেন। কিন্তু মহাপ্রভু একে 'অতিস্তুতি হইল' বলে বাহ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্লোক শুনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন। বিদগ্ধমাধবের ১ম অঙ্কে মঙ্গলাচরণের ২য় শ্লোক-

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

"সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমার হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেননি, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

শ্রীল রূপগোস্বামীর অপ্রাকৃত প্রেমরসযুক্ত কবিত্ব শুনে রায় রামানন্দ সহস্রমুখে এর প্রশংসা করতে লাগলেন–

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে। রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে ॥

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥"
– চৈ.চ. অন্ত্য ১/১৯২-১৯৪

কালিদাসের কাব্যের মহিমা ততদিনই ছিল যতদিন রূপগোস্বামী অপ্রাকৃত রসযুক্ত কাব্যের প্রকাশ হয়নি।

বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেবের প্রকট

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশক্রমে প্রথমে সনাতন গোস্বামী পুরী হতে ঝাড়িখণ্ড পথে বৃন্দাবনে এসে পৌছলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবনে যেতে হওয়ায় তিনি একবছর পরে বৃন্দাবনে পৌছে সনাতন গোস্বামীর সাথে মিলিত হলেন। ভূসম্পত্তি ও সঞ্চিত ধন কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে যথাযথরূপে বন্টন করে দেয়ার জন্য শ্রীল রূপগোস্বামীকে গৌড় দেশে আসতে হয়েছিল।

বৃন্দাবনে শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রকাশ করলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রী গোবিন্দদেবের প্রকটের কথা বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে চারটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। যথা: লুপ্ত তীর্থউদ্ধার, শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ, শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও নামপ্রেম প্রচার। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর নির্দেশ যথাযথরূপে পালন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা প্রকাশ কীভাবে হবে এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে শ্রীরূপগোস্বামী ব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দদেবের অন্বেষণে গ্রামে-গ্রামে বনে-বনে ভ্রমণ করছিলেন। কিন্তু ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে অন্বেষণ করে কোথাও গোবিন্দের দর্শন না পেয়ে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে যমুনার তীরে বিরহ ব্যাকুল হৃদয়ে বসে রইলেন। এমন সময় ব্রজবাসীর রূপ ধারণ করে সুন্দর এক পুরুষ তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। সেই ব্রজবাসী অত্যন্ত মধুর বচনে রূপগোস্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন– "চিন্তার কোনো কারণ নেই। বৃন্দাবনে গোমাটিলা নামক যোগপীঠে 'গোবিন্দদেব' গোপনে অবস্থান করছেন। একটি শ্রেষ্ঠ গাভী প্রতিদিন সকালে উল্লাসভরে সেখানে দুধ প্রদান করেন।" এ কথা বলে ব্রজবাসী অন্তর্ধান হলে রূপগোস্বামী "কৃষ্ণ এসেছিলেন, চিনতে পারলাম না" বলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। শ্রীল রূপগোস্বামী কোনোরকমে বিরহ-দুঃখ সংবরণ করে ব্রজবাসীগণকে গোবিন্দদেবের প্রকট-স্থানের কথা নির্দেশ করলেন। ব্রজবাসীগণ পরমোল্লাসে গোমাটিলা-ভূমি খনন করলে সেখান থেকে কোটি কন্দর্পমোহন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাব হয়। গোবিন্দদেব বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র কর্তৃক প্রকটিত বলে কথিত। গোমাটিলাতে গোবিন্দদেবের পুনপ্রকটের পর প্রথমে পর্ণকুটীরে সেবিত হচ্ছিলেন, পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দের মন্দির ও জগমোহনাদি নির্মাণ করেছিলেন। ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ লাল প্রস্তর সংস্কার করালে অদ্ভুত কারুকার্যখচিত এক মন্দির প্রকাশিত হয়। তা হিন্দু স্থাপত্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন। গ্রৌজ সাহেব 'মথুরা' গ্রন্থে গোবিন্দজিউর মন্দির সম্বন্ধে বলেছেন– গোবিন্দ দেবের মন্দির কেবল দৃষ্টিনন্দনই নয়, তা ভারতের হিন্দু শিল্পের এ যাবৎকালের

সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ধর্মীয় প্রাসাদ। সাততলা মন্দির এত উঁচু ছিল যে, আওরঙ্গজেব আগ্রা থেকে চূড়া দেখে মন্দিরের একটি তলা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। শ্রীগোবিন্দজিউর মূল বিগ্রহ ম্লেচ্ছ ভয়ে উঠিয়ে বৃন্দাবন হতে প্রথমে ভরতপুরে, পরে জয়পুরে রাখা হয়।

রঘুনাথের প্রাণরক্ষা

শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর নিজ-গ্রন্থে মহাপ্রভুর সাথে রূপের মিলনের কথা অনেক কীর্তন করেছেন–

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা লপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষচ দেব- স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

–চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৯/৩৮

"কালের প্রভাবে বৃন্দাবনকেলি-বার্তা লুপ্ত হয়েছিল, সেই লীলা বিশেষ করে বিস্তার করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ দেব সেখানে শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করেছিলেন।"

প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

–চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

"নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট মুখ্যরূপ এবং নিজের অনুরূপ এমন স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপগোস্বামীতে মহাপ্রভু (ভক্তিরস-শাস্ত্র) বিস্তার করেছিলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বরূপদামোদরের হাতে সমর্পণ করলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপদামোদরের আনুগত্যে পুরুষোত্তমধামে ১৬ বছর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা সম্পাদন করেন। তাঁদের অন্তর্ধানের পর রঘুনাথ দাস গোস্বামী তীব্র বিরহব্যাকুল অবস্থায় বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের পাদপদ্ম দর্শন করে গোবর্ধনপর্বত থেকে লাফ দিয়ে দেহত্যাগের সঙ্কল্প নিয়ে বৃন্দাবনে আসেন। রূপ-সনাতন তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হয়ে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে তৃতীয় ভাইরূপে নিজের কাছে রেখে দেন, দেহত্যাগ করতে দেননি। বৃন্দাবনে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাথে রূপ গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শ্রীরূপের আনুগত্য বরণ

ষড়-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বারানসিধামে থাকাকালে রঘুনাথের পিতা তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করতেন, তখন শ্রীরঘুনাথের বাল্যাবস্থায়ই শ্রীমন্মাহপ্রভুর উচ্ছিষ্ট মার্জন ও পাদ-সম্বাহনাদি সেবার সৌভাগ্য হয়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রাপ্ত বয়স্ক হলে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট যান। সেখানে নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে মহাপ্রভুকে পরিতৃপ্তি সহকারে আটমাস ভোজন করিয়েছিলেন। পরে মহাপ্রভুর নির্দেশে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার জন্য কাশীতে এসে চার বছর ছিলেন। পিতামাতা অপ্রকট হলে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করে আবার পুরীতে এলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে রূপগোস্বামীর আনুগত্যে অবস্থান করতে বললেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর পাদপদ্মে এসে

পৌঁছান এবং রূপগোস্বামীর ইচ্ছাক্রমে কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত হয়ে তাঁকে ভাগবত শ্রবণ করান।

শ্রীরূপ-সনাতনের অত্যদ্ভুত ভজনাদর্শ–

অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী। শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে। নাম-সংকীর্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥

রাধারাণীর কৃপা লাভ

শ্রীনন্দগ্রাম ও যাবটের মধ্যস্থলে টেরকদম্ব কুণ্ডতটে শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ একটি ঝোপ বেঁধে ভজন করতেন। কথিত আছে, এক সময় শ্রীল রূপগোস্বামীর ভজন কুটিরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আগমন করলে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে, আজ এ গহীন বনে যদি দুগ্ধাদি পাওয়া যেত, তাহলে তার দ্বারা পরমান্ন তৈরি করে ভগবানকে ভোগ দিয়ে প্রভু সনাতনকে ভোজন করাতাম। অন্তর্যামী রাধারাণী শ্রীরূপের মনোভাব বুঝতে পেরে এক গোপবালিকার বেশে তাঁর নিকট দুগ্ধ নিয়ে এলেন।

ঘৃত-দুগ্ধ-তণ্ডুল-শর্করাদিক লইয়া। গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥
রূপ প্রতি কহে স্বামী এই সব লেহ। শীঘ্র পাক করি কৃষ্ণে সমর্পি ভুঞ্জহ ॥
মাতা মোরে এই কথা কহিলে কহিতে। কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে ॥
এত কহি শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা। শ্রী রূপগোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা ॥

রাধারাণী প্রদত্ত দুগ্ধ আদি অন্যান্য উপাদান পেয়ে শ্রীরূপগোস্বামী তা রান্না করে সনাতন গোস্বামীকে নিবেদন করলেন। সনাতন গোস্বামী পরমান্ন দর্শন করেই বুঝতে পারলেন এই পরমান্ন কোনো সাধারণ বস্তু নয়। সুগন্ধে চারদিক সুবাসিত হয়ে গেল। অশ্রুসিক্ত নয়নে সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপকে জিজ্ঞেস করলেন– "তুমি পরমান্ন রান্না করার জন্য দুগ্ধ-চাল ও চিনি কোথায় পেলে?" তারপর তিনি সব ঘটনা সনাতন গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করলেন। রাধারাণীই যে এসব উপাদান প্রদান করেছেন তা তিনি শ্রীরূপগোস্বামীকে বললেন। রাধারাণী এত কষ্ট করে এসব উপাদান প্রদান করেছেন ভেবে তিনি রূপগোস্বামীকে আর কখনো এমন অভিলাষ করতে নিষেধ করলেন।

শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বার বার। ঐছে ভক্ষ দ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর ॥
এত কহি মহাপ্রসাদ সেবন কৈলা। শ্রীরূপ গোস্বামী অতি খেদযুক্তা হৈলা ॥
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন। প্রবোধিলা শ্রীরূপে জানিলা সনাতন ॥

এভাবে রাধারাণী রূপগোস্বামীর মনোভীষ্ট পূরণ করেন। টের কদম্বে আজও শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী বর্তমান। টের কদম্বকুণ্ডের যে ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধৌত করতেন, সেই ঘাটে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রত্যহ স্নান করতেন।

শ্রীরূপের ভজনে বিঘ্ন

একসময় রূপ গোস্বামী মানসে রাধা কৃষ্ণের নিত্যলীলায় মগ্ন ছিলেন। তিনি রাধা গোবিন্দের একটি অপূর্ব লীলা দর্শন করছিলেন। রাধারাণী পুষ্প চয়ন করার জন্য বাগানে প্রবেশ করেছেন। একটি পুষ্পবৃক্ষের শাখায় সুগন্ধী পুষ্প দেখে রাধারাণীর তা চয়ন করার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু শাখাটি কিছু উঁচুতে থাকায় রাধারাণী অনেক চেষ্টা করেও শাখাটি ধরতে সক্ষম হননি।

কিছুক্ষণ পর, শ্যামসুন্দর আড়ালে এসে পেছন থেকে শাখাটিকে নিচে চেপে ধরলেন। রাধারাণী এক হাত দিয়ে বৃক্ষের শাখা ধরে আরেক হাত দিয়ে পুষ্প চয়ন করছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ শাখাটি ছেড়ে দিলেন। শাখাটি রাধারাণী সহ উপরে উঠে পড়লে শ্রীমতি রাধারাণী হায়! হায়! করতে করতে ঝুলতে লাগলেন। তা দেখে কৃষ্ণ হো হো করে হাসতে লাগলেন। রসশাস্ত্রে একে কিলকিঞ্চিতভাব বলে। এ লীলা দর্শন করে শ্রীল রূপ গোস্বামীও মৃদু হাসতে লাগলেন। এমন সময় খঞ্জ কৃষ্ণদাস শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের দর্শন কামনায় এসে তাঁকে হাস্য করতে দেখলে তাঁকে উপহাস করছে ভেবে অসন্তুষ্ট মনে সেখান থেকে চলে যান। তার ফলে শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভজনে বিঘ্ন ঘটে এবং লীলা স্মরণে বাধা পড়ে যায়। এ ঘটনা রূপ গোস্বামীপাদকে জানালে তিনি বৈষ্ণব অপরাধ হয়েছে বলে জানান। তারপর রূপ গোস্বামী অপরাধ খণ্ডনের নিমিত্তে সনাতন গোস্বামীর নির্দেশ মতো বৈষ্ণব ভোজনের আয়োজন করেন। তখন খঞ্জ কৃষ্ণদাসকে নিমন্ত্রণ প্রদানকালে খঞ্জ কৃষ্ণদাস তাঁর কষ্টের কথা খুলে বললেন এবং উভয়েই উভয়ের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

তিরোধান

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামীর মাধ্যমে বৃন্দাবনের রাসকেলি সম্বন্ধে এবং ব্রজ প্রেমলাভের অভিধেয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন–

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত ॥

–চৈ.চ. আদি ৫/২০৩

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥

চৈ.চ. মধ্য ১৯/১

"পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্ম ভগবৎ-তত্ত্ব) প্রেরণা দান করেছিলেন, সেই রূপগোস্বামীতে সমুৎসুক হয়ে নিজ শক্তি সঞ্চার করে কালধর্মে লুপ্ত বৃন্দাবনের রসকেলি বার্তা বিস্তার করেছিলেন।"

শ্রীল রূপগোস্বামী-রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১৬টি বিশেষ গ্রন্থের নাম 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

শ্রীহংসদূতকাব্য, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির বিধি, শ্রীবৃহদ্ গণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপ্রিয়গণের মনোহরা স্তবমালা, প্রসিদ্ধ বিদগ্ধমাধব

ও ললিত মাধব, দানলীলাকৌমুদী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও শ্রীরূপগোস্বামী উপদেশামৃত নামাষ্টক, সিদ্ধান্তরত্ন, কাব্যকৌস্তুভ ইত্যাদি লিখেছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্মকে সর্বস্বরূপে বরণ করেছেন।

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম।
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এই দুই নয়নে।
সেরূপ মাধুরীরাশি, প্রাণ কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিন ॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

–নরোত্তম দাস ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্মের ধুলিকে সর্বস্ব এবং শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু নেই– এরূপ উক্তি করেছেন। যথা–

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি ॥

বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পেছনে শ্রীল রূপগোস্বামীর মূল সমাধি মন্দির এবং ভজনকুটির অবস্থিত। এছাড়া নন্দগ্রামের নিকটে টেরিকদমেও শ্রীল রূপগোস্বামীর ভজনকুটির রয়েছে। ভাদ্রমাসের শ্রীঝুলন একাদশীর পরদিন শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীল রূপগোস্বামী তিরোধান লীলা করেন।
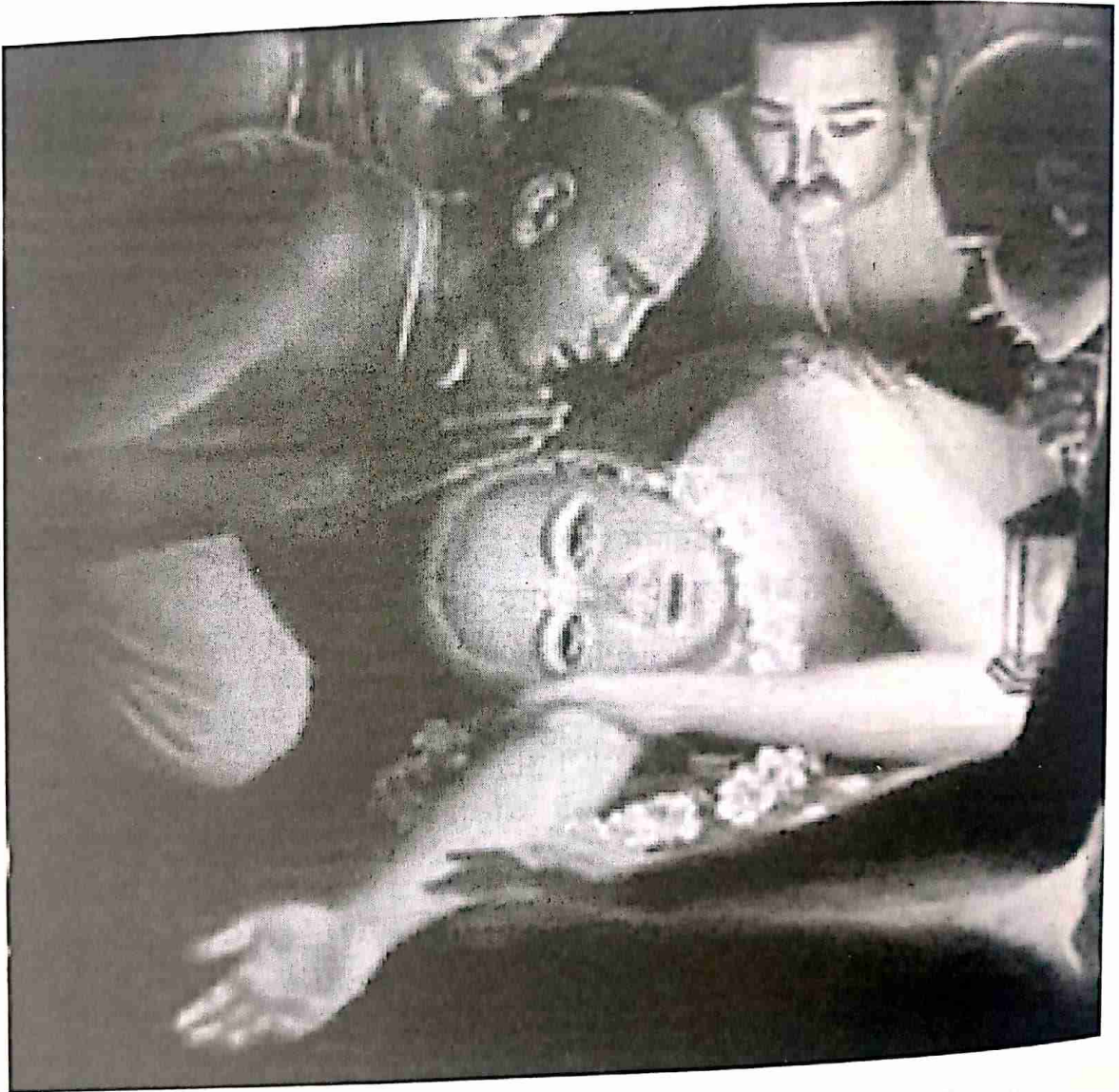
শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী

আবির্ভাব ও পরিচয়

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী অন্যতম ছিলেন। গৌরলীলায় রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-কলেবর শ্রীস্বরূপ দামোদর। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ বলে মহাপ্রভুর অবতারের ও লীলারহস্যের গূঢ় কারণসমূহ অবগত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় লীলা-রহস্য প্রচারিত হয়েছে। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় স্বরূপ দামোদরকে ব্রজলীলায় বিশাখা সখী বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

কলামশিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে অন্ত্যলীলার শেষ বারো বছর নিরন্তর রাধাভাবে বিভাবিত থেকে কেবল অন্তরঙ্গতম দুই পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে গূঢ় প্রেমরস আস্বাদন করেছিলেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায়, শুনে পরম আনন্দ।
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ, এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥

–চৈ.চ. মধ্য ২/৭৭-৭৮

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে–

চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহা বিস্তারিলুঁ, ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃত প্রবাহভাষ্যে লিখেছেন– "স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রেখেছিলেন, অর্থাৎ একে কণ্ঠস্থ করে কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করেছিলেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক পুস্তক আকারে লিখিত হয়নি। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।" স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কত প্রিয় তা কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন–

এত কহি গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে শুন, স্বরূপ-রামরায়।
কাঁহা কঁরো, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়।

এভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিনের পর দিন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের

সঙ্গে বিলাপ করতেন। মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কৃষ্ণলীলার গান করতেন ও রায় রামানন্দ উপযুক্ত শ্লোক পাঠ করতেন। এভাবে তাঁরা মহাপ্রভুকে আশ্বাস দিতেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদ্যাপতির কবিতা এবং জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দের শ্লোক পাঠ করে ও গান করে তাঁরা মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও স্বরূপ দামোদরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমরসময় কীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার কথাও চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

দামোদর স্বরূপের উচ্চ সংকীর্তন। শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ ॥
সন্ন্যাসীপার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়। দামোদর স্বরূপ সমান কেহো নয় ॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাইরে। দামোদর স্বরূপে তত প্রীতি করে ॥
দামোদর স্বরূপ–সঙ্গীত রসময়। যাঁর ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥

–চৈ.ভা. অন্ত্য ১০/৪০-৪৩

ভৌমলীলায় শ্রীস্বরূপ দামোদরের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, তিনি পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য বা পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য নামে খ্যাত ছিলেন। 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' শ্রীপুরুষোত্তম আচার্যের পিতা-মাতা ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে– পিতার নাম শ্রীপদ্মগর্ভাচার্য। মাতার নামের উল্লেখ নেই, তবে মাতামহের নাম শ্রীজয়রাম চক্রবর্তী বলে উল্লেখ আছে। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্যের আদি নিবাস ছিল ভিটাদিয়ায় (পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী)। জয়রাম চক্রবর্তী নবদ্বীপে বাস করতেন। তিনি তাঁর কন্যার সাথে পদ্মগর্ভাচার্যের বিবাহ সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে পদ্মগর্ভাচার্য নবদ্বীপে বাস করেছিলেন। কিছুদিন পর পুরুষোত্তম আচার্যের আবির্ভাব হলে পদ্মগর্ভাচার্য পত্নী ও পুত্রকে শ্বশুরালয়ে রেখে মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রস্থান করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য নবদ্বীপে মাতামহের গৃহে লালিত পালিত হতে থাকলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মহাপ্রভুর বিরহে পুরুষোত্তম আচার্য নবদ্বীপে থাকতে না পেরে তিনিও বারানসিতে গিয়ে চৈতন্যানন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর সন্ন্যাস গুরু 'চৈতন্যানন্দ ভারতী' তাঁকে আদেশ দিলেন– "বেদান্ত পাঠ করে সকলকে বেদান্ত পড়াও"। স্বরূপ দামোদর ছিলেন বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং পরম পণ্ডিত। তিনি কায়মনে 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত' আশ্রয় করেছিলেন। নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করার জন্য উন্মত্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, কিন্তু যোগপট্ট নিলেন না, তাই তাঁর নাম হলো 'স্বরূপ'। স্বরূপ দামোদর ছিলেন পণ্ডিতের অবধি, অর্থাৎ তাঁর মতো এত বড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। তিনি একটি নির্জন স্থানে থাকতেন এবং লোকজন তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারত না। কেউ যখন কোনো গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তা শোনাতে চাইতেন, তখন স্বরূপ

দামোদর প্রথমে তা পরীক্ষা করে দেখতেন এবং শুদ্ধ হলেই কেবল সেগুলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শোনানো হতো।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এ প্রসঙ্গে অনুভাষ্যে লিখেছেন– "বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসীগণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য প্রবর্তিত এই বিধি দেখা যায় যে, 'তীর্থ' ও 'আশ্রমাখ্য' দণ্ডীদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণার্থী হলে দণ্ডী গুরুমহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণের বিধানানুসারে 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্যই 'দামোদর স্বরূপ' নামে ব্রহ্মচারী আখ্যা লাভ করেন। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরই 'স্বরূপ' উপাধির পরিবর্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়।"

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখেছেন–"পুরুষোত্তম আচার্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখে 'শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস' গ্রহণ করলেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম 'স্বরূপ দামোদর' হলো। যোগপট্ট নেয়ার যে প্রকরণ, তিনি তা স্বীকার করলেন না। কেননা, কোনো প্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর সন্ন্যাস ছিল না; কেবল নিশ্চিন্ত হয়ে কৃষ্ণভজন করব– এই মানসেই স্বীকৃত হলো।"

নীলাচলে আগমন

শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি 'স্বরূপ দামোদর' নাম প্রাপ্ত হয়ে নীলাচলে এসে মহাপ্রভুকে দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণামকালে এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন–

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ॥
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

"হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যা-তে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করেছিলেন) প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করেন, যার ভক্তিবিনোদ ক্রিয়া সর্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য-মর্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।" স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর প্রেমালিঙ্গনরূপ কৃপা লাভের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীপরমানন্দ পুরীর চরণ বন্দনা করলেন এবং জগদানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে (চন্দনপুকুরে) চন্দনযাত্রাকালে এবং শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্বরূপ দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের জলকেলি লীলাকালে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। স্বরূপ দামোদর ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মধ্যে জলক্ষেপণ লীলা হয়েছিল।

দুই সখা বিদ্যানিধি, স্বরূপ দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥

–চৈ.ভা. অন্ত্য ৮/১২৪

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যখন টোটা গোপীনাথে প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠ করতেন, তখন তাঁর শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু এবং স্বরূপ দামোদর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, দাসগদাধর প্রভৃতি গৌরাঙ্গের মুখ্য পার্ষদবৃন্দ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হতে প্রহ্লাদচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র একশবার শ্রবণের লীলা করেছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভাগবতপাঠ ও শ্রীস্বরূপ দামোদরের কীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হতো।

ভাগবত পাঠে গদাধর মহাশয়। দামোদর-স্বরূপের কীর্তন বিষয় ॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণগায়। বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার। যতকিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥
মূর্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে। নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা সবা-সনে ॥
–চৈ.ভা. অন্ত্য ১০/৩৬-৩৯

ওড়নষষ্ঠী যাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথের এক প্রকার লীলা হয়। সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরান। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু শ্রীজগন্নাথের সেবকগণের এরূপ আচরণ দেখে সহ্য করতে না পেরে ভর্ৎসনা করলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এ বিষয়ে স্বরূপ দামোদরের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। স্বরূপ দামোদর তখন বিদ্যানিধিকে বুঝিয়ে বললেন– "ঈশ্বরের আচার স্বতন্ত্র, লৌকিক স্মৃতির শাসনাধীন নয়।" বিদ্যানিধি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন– "জগন্নাথ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বীকার করলাম, তাই বলে সেবকগণ কি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, তাঁরাও কি ব্রহ্ম হলেন, মাড়যুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করলে হাত ধৌত করতে হয় তা-ও কি তাঁরা জানেন না?" সেবকগণের প্রতি এরূপ মনোভাব পোষণ করায় জগন্নাথ -বলরাম দুইভাই রাতে স্বপ্নে এসে বিদ্যানিধি প্রভুর দুই গালে এমনভাবে চপেটাঘাত করলেন যে গাল ফুলে গেল। এ লীলার দ্বারা শ্রীজগন্নাথ– তাঁর সেবকগণের আচরণে দোষ দর্শন করা উচিত নয়, এই শিক্ষা দিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথ-বলরামের শ্রীহস্ত স্পর্শ লাভ করে পরমানন্দ লাভ করলেন। স্বরূপ দামোদর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এমন সৌভাগ্য দেখে উল্লসিত হলেন–

বিদ্যানিধি-প্রতি দেখি স্নেহের উদয়। আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস। দুইজনে হাসেন পরমানন্দ-হাস ॥
দামোদরস্বরূপ বলেন–'শুন ভাই। এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে। আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে ॥
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে। রাত্র-দিন না জানেন কৃষ্ণকথা-রসে ॥
–চৈ.ভা. অন্ত্য ১০/১৭৩-১৭৭

যখন মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে রায় রামানন্দ পুরীতে এসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন রামানন্দ রায় চৈতন্য মহাপ্রভুকে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সে সময় স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে রায় রামানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রায় রামানন্দ পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর ও

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুসহ সকলের চরণ বন্দনা করেছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে রথযাত্রার আগের দিন গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনকালে স্বরূপ দামোদর মুখ্য পার্ষদরূপে উপস্থিত ছিলেন।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১২/১০৯

শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জনের সময় বঙ্গদেশ থেকে আগত এক সুবুদ্ধি সরল বৈষ্ণব মন্দিরের ভেতরে হঠাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এক কলস জল ঢেলে তা পান করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হওয়ায় মন্দিরের ভেতর তাঁর পাদপদ্মধৌত জল পান করায় পরমার্থ বিচারে কোনো দোষ হয়নি, কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই বৈষ্ণবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তখন মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে বললেন–

শিক্ষা লাগি স্বরূপে ডাকি কহিল তাঁহারে। এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে ॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পা ধোয়াইল। সেই জল লইয়া আপনি পান কৈল ॥
তবে স্বরূপ গোসাই তাঁর ঘাড়ে হাত দিয়া। ঢেকা মারি পুরীর রাখিলেন লইয়া ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১২। ১২৬-১২৮

তারপর স্বরূপ দামোদর গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন- "সেই লোকটি না জেনে অপরাধ করেছে। তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দাও।" বৈষ্ণবগণ বাহ্যিকভাবে কঠোর ব্যবহার প্রদর্শন করলেও হৃদয়ে সর্বদা সকল জীবের প্রতি করুণাপরায়ণ থাকেন।

রথাগ্রে সংকীর্তন

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বহস্তে ভক্তগণকে সুগন্ধী চন্দন এবং পুষ্পমালা প্রদান করে চারটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রথম দলে মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদরকে প্রধান কীর্তনীয়া হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। চারটি দলের সঙ্গে কুলীন গ্রামের, শান্তিপুরের ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হয়ে সাতটি দল হলো। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুটি করে সাত সম্প্রদায়ে ১৪টি মৃদঙ্গ হলো।

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥

সাত সম্প্রদায়ে কীর্তন আরম্ভ হলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ করলেন। "যেরূপ রাসে ও মহিষী-বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ বহু বিগ্রহ হয়ে 'প্রকাশ' হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ সেই শক্তি প্রকাশপূর্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে নিজেকে 'প্রকাশ' করেছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেছিলেন যে, 'প্রভু আমার সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নেই'।" – শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন উদ্দণ্ড নৃত্যের ইচ্ছা হলো তখন সাত সম্প্রদায়কে একত্র করে নয়জন গায়ককে বণ্টন করে দিয়ে স্বরূপ দামোদরকে প্রধান কীর্তনীয়ারূপে নিয়োজিত

করলেন। ভক্তগণ সংকীর্তনানন্দে মত্ত হলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে বহুক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করলেন। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহের উদয় হলো। স্বরূপ দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব বুঝে বিরহগীত গাইতে লাগলেন– "*সেই ত পরাণনাথ পাইনু। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।*" "তাণ্ডব নৃত্য ছেড়ে মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদিত হলো। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটি স্বভাবতঃই এসে উপস্থিত হলো।" –শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিচ্ছেদের পর মিলনের ভাব যখন উদিত হলো, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে লাগলেন–

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

–কাব্যপ্রকাশ

"যিনি কৌমারকালে রেবা নদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করেছিলেন, তিনিই এখন আমার পতি হয়েছেন। সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সুগন্ধও আছে। কদম্বকানন হতে ব্যাপারলীলায় আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবাতটস্থ বেতসীতরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

মহাপ্রভু এ শ্লোক যে এত আদরে পাঠ করেছিলেন, তার গূঢ় তাৎপর্য স্বরূপ দামোদর ব্যতীত আর কেউই জানতেন না।

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৩/১২২

শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত শ্লোক ব্যাখ্যা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উক্ত কাব্যপ্রকাশের শ্লোক শুনে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ-প্রকাশক একটি শ্লোক তাল পাতায় লিখে ঘরের চালে গুঁজে রাখলেন। দৈববশত শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত তালপাতা দেখতে পেয়ে সেই শ্লোক পাঠ করে প্রেমাবিষ্ট হলেন। সে সময় রূপগোস্বামী পর্ণকুটিরে এলেন। তখন তিনি দৈবাৎ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে চালে গোঁজা তালপাতায় লেখা সেই শ্লোকটি দেখতে পেলেন এবং তিনি তখন সেই শ্লোকটি পাঠ করলেন। তখন মহাপ্রভু উঠে গিয়ে তাঁকে স্নেহভরে একটি চাপড় মারলেন। তাঁরপর তাঁকে কোলে করে বললেন– "আমার শ্লোকের অভিপ্রায় কেউ জানে না, কিন্তু তুমি আমার মনের কথা জানলে কি করে?" তারপর মহাপ্রভু সেই শ্লোকটি স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– "*মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে?*"

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন–

স্বরূপে পুছেন প্রভু হয়ে বিস্মিতে। মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥
স্বরূপ কহে – যাতে জানিল তোমার মন। তাতে জানি–হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/৬৬-৭২

মহাপ্রভু বললেন– "শ্রীরূপের প্রতি আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য তাঁর মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করে তাঁকে আমি আলিঙ্গন করেছি।" আমি মনে করি, শ্রীরূপ ভগবদ্ভক্তের গূঢ়রস হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ এবং তুমিও তাঁর কাছে ভগবদ্ভক্তির গূঢ়রস বিশ্লেষণ করো। শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্লোক–

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

"হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ আজ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করছে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরকে কুরুক্ষেত্র এবং গুণ্ডিচা মন্দিরকে বৃন্দাবন দর্শন করে কৃষ্ণবিরহে রথের রজ্জু ধরে টানার সময় যে দিব্যভাবসমূহের প্রকাশ হয়েছিল, তা স্বরূপ দামোদরই অনুভব করেছিলেন।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে। রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥
নৃত্যকালে সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া। শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-মুখ চাইয়া ॥
স্বরূপ-গোসাইর ভাগ্য না যায় বর্ণন। প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ। আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৩/১৬১-১৬৪

শ্রীজগন্নাথদেব দ্বারকায় নিবাস করেন, বছরে একবার বৃন্দাবন যেতে ইচ্ছা করেন; এজন্য শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা শ্রীজগন্নাথ মন্দির (দ্বারকা) হতে গুণ্ডিচা মন্দির (বৃন্দাবন) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবন যাওয়ার সময় ভগবান লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে যান না, কারণ লক্ষ্মীদেবীর বৃন্দাবনলীলায় অধিকার নেই, অধিকার ব্রজগোপীগণের, গোপীশ্রেষ্ঠ শ্রীমতি রাধারাণীর।

স্বরূপ কহে– শুন প্রভু কারণ ইহার। বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥
বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ। গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৩/১২২-১২৩

গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্মল উজ্জ্বল রস-প্রেমরত্ন-খনি ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১৪/১৬০

শ্রীজগন্নাথদেব লক্ষ্মীদেবীকে 'কালই আসবো'– এই বলে রথযাত্রায় বের হয়ে ফিরতে বিলম্ব করায় লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ হলো, তিনি নিজ সম্পত্তি সাজিয়ে প্রিয়ের উপর আক্রমণ করতে গেলেন, লক্ষ্মীদেবীর পরিচারিকাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের ভৃত্যগণকে বেঁধে লক্ষ্মীদেবীর চরণে এনে ফেললেন। লক্ষ্মীদেবীর মান অপেক্ষা ব্রজগোপীগণের মান শ্রেষ্ঠ এবং তার চেয়ে রাধিকার মান শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীগণের মান ও শ্রীমতি রাধারাণীর মানের কথা শুনতে চাইলে স্বরূপ দামোদর প্রভু তা বিস্তারিতভাবে মহাপ্রভুকে শোনালে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হলেন। স্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব বুঝতে পারার কারণে সর্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ বিধান করেছিলেন।

বিপ্রকবিকে উপদেশ

হালি-শহরবাসী খঞ্জ শ্রীভগবান আচার্যের সাথে স্বরূপ দামোদরের সখ্যভাব ছিল। ভগবান আচার্য অত্যন্ত উদার সরল বৈষ্ণব হলেও তাঁর পিতা শতানন্দ খাঁ অত্যন্ত বিষয়ী এবং তাঁর ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য মায়াবাদী ছিলেন। গোপাল ভট্টাচার্য পুরীতে এসে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাথে মিলিত হলে সরল বৈষ্ণব ভগবান আচার্য স্বরূপ দামোদরকে গোপাল ভট্টাচার্যের নিকট বেদান্তভাষ্য শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বরূপ দামোদর প্রভু ক্রোধ প্রকাশ করে মায়াবাদ শাঙ্করভাষ্য শ্রবণ করতে নিষেধ করলেন।

বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র কবি একটি নাটক লিখে ভগবান আচার্যকে শোনালে ভগবান সেই নাটক সম্বন্ধে স্বরূপ দামোদরকে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ স্বরূপ দামোদরের অনুমতি হলে তা মহাপ্রভুর নিকট উপস্থাপিত হতো। অনেক বৈষ্ণব উক্ত নাটক লেখার প্রশংসা করলেন। ভগবান আচার্যের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় স্বরূপ দামোদর উক্ত লেখা শুনতে সম্মত হলেন। কিন্তু উক্ত নাটকের নান্দী শ্লোকেই স্বরূপ দামোদর ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ দোষসমূহ প্রদর্শন করলেন। তা শুনে সকলে আশ্চর্য হলেন। বৈষ্ণব হলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবোধ সকলের হয় না। স্বরূপ দামোদর সেই বিপ্র-কবির দুঃখ দেখে তার প্রতি সদয় হয়ে উপদেশ করলেন–

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৫/১৩১-১৩২

শ্রীভগবান আচার্যের গৃহেই ছোট হরিদাস মাধবী দেবীর কাছ থেকে সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা উপলক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ করায় মহাপ্রভু তাঁকে বর্জন করেছিলেন। ছোট হরিদাস দুঃখে আহার ত্যাগ করলেন। মহাপ্রভু বজ্রের ন্যায় কঠোরতা প্রকাশ করলে স্বরূপ দামোদর অনেক বুঝিয়ে ছোট হরিদাসকে অন্ন গ্রহণ করিয়েছিলেন। পরে অবশ্য মহাপ্রভুর কৃপা না হওয়ায় বছর শেষে ছোট হরিদাস প্রয়াগে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী মথুরা হতে একাকী ঝাড়িখণ্ডপথে পুরুষোত্তম ধামে আসার সময় শরীরে পাঁচড়া হয়েছিল। তিনি পুরীতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে ছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁর কুণ্ডরসাযুক্ত শরীর বারবার স্পর্শ করায় তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন। মহাপ্রভু

তাঁর (সনাতনের) শরীর তাঁর নিজ-ধন বলে তাঁকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, তখন চাতুর্মাস্যের সময় অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ও স্বরূপ দামোদরের সাথে তিনি মিলিত হয়েছিলেন।

মহাপ্রভু কর্তৃক রঘুনাথদাসকে সমর্পণ

শ্রীগোবর্ধন মজুমদারের পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বীয় গুরু ও পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্যের কাছ থেকে ছল করে অনুমতি নিয়ে গৃহ থেকে পলায়ন করে পদব্রজে বারো দিনে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁকে শ্রীস্বরূপ দামোদরের শ্রীহস্তে সমর্পণ করেছিলেন। তখন থেকে তিনি 'স্বরূপের রঘু' নামে খ্যাত হয়।

রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া। স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া ॥
"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে। পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় আমার গণে। 'স্বরূপের রঘু'— আজি হৈতে ইহার নামে ॥"
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিলা। স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥

—চৈ.চ. অন্ত্য ৬/২০১-২০৪

রঘুনাথ দাস গোস্বামী সরাসরি মহাপ্রভুর কাছে কিছু নিবেদন করেননি। কোনো কিছু নিবেদন করতে ইচ্ছা করলে স্বরূপ দামোদর বা গোবিন্দের মাধ্যমে করতেন। মহাপ্রভুর কাছ থেকে উপদেশ শ্রবণের জন্য রঘুনাথ বারবার স্বরূপ দামোদরকে তাঁর হয়ে মহাপ্রভুর কাছে তা নিবেদন জানাতে প্রার্থনা করলে স্বরূপ একদিন মহাপ্রভুকে সে বিষয়ে নিবেদন করেছিলেন। তখন মহাপ্রভু হেসে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বললেন— "আমি ইতোমধ্যেই স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে তোমার উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছি, তুমি তাঁর কাছে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শেখো। তিনি যা জানেন, আমি ততটা জানি না। তবুও আমার আজ্ঞায় যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তাহলে আমার এই নির্দেশ নিশ্চিতভাবে পালন করো। তখন মহাপ্রভু বললেন—

গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ। স্বরূপের ঠাই ইহার পাবে সবিশেষ ॥

—চৈ.চ. অন্ত্য ৬/২৩৩-২৩৮

পুরীতে নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের নির্যান সময়ে মহাপ্রভুর মহাসংকীর্তনকালে হরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও শ্রীস্বরূপ দামোদর ভক্তগণসহ নাম সংকীর্তন করেছিলেন। স্বরূপ দামোদর হরিদাস ঠাকুরের নির্যান-মহোৎসবের জন্য জগন্নাথ মন্দির হতে মহাপ্রসাদ আনার ব্যবস্থা এবং জগদানন্দ ও অন্যান্য ভক্তসহ পরিবেশনও করেছিলেন।

তপন মিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী থেকে গৌড়দেশ হয়ে যখন পুরীতে পৌছলেন, সে সময় মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য ভক্তগণের সাথে মিলন করে দিলেন।

মহাপ্রভুর জন্য কলাপাতার তোশক তৈরি

কাশীমিশ্র ভবনে একসময় মহাপ্রভু কঠোর বৈরাগ্যভাব প্রকট করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণবিরহ-কাতরাবস্থায় দিনদিন ক্ষীণ হতে লাগলেন। তীব্র বৈরাগ্যভাব আসায় কলার বাকলের উপর শুতেন, শরীরে কোনো প্রকার ব্যথায়ও ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তা দেখে ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সহ্য করতে না পেরে সূক্ষ্মবস্ত্র গেরুয়া রং করে শিমুল তুলা ভর্তি করে সুন্দর তোষক তৈরি করে স্বরূপ দামোদরকে দিলেন উক্ত তোষক দ্বারা মহাপ্রভুর শয্যা রচনার জন্য। স্বরূপ দামোদর সেদিন উক্ত তোষকের দ্বারা শয্যা তৈরি করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সুন্দর শয্যা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন– "কে এই শয্যা করালো?" গোবিন্দের নিকট জগদানন্দের নাম শুনে মহাপ্রভুর ভয় হলো। কারণ, জগদানন্দ সত্যভামার অবতার, ভয়ঙ্কর অভিমানী। তবুও শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দকে দিয়ে তোষক সরিয়ে কলার বাকলে শুলেন। তোষকে না শুলে জগদানন্দ পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখ পাবেন স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে এ কথা বললে মহাপ্রভু বললেন– "ভালো কথা, তাহলে একটা খাট আন। জগদানন্দ আমাকে বিষয় ভোগ করাতে চাচ্ছে। সন্ন্যাসী ভূমিতে শয়ন করবে! খাট বালিশ এসব কী? অত্যন্ত লজ্জার কথা।" স্বরূপ দামোদর জগদানন্দকে তা জানালে জগদানন্দ অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। সেবায় অত্যন্ত কুশল স্বরূপ দামোদর কলার শুকনা পাতা চিরে চিরে মহাপ্রভুর বহির্বাসের মধ্যে ভর্তি করে অন্যভাবে বালিশ তোষক তৈরি করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা গ্রহণ করলেন। স্বরূপ দামোদরের তৈরি তোষকে মহাপ্রভু শয়ন করায় ভক্তগণ অত্যন্ত প্রীত হলেন। স্বরূপদামোদরের সেবাকুশলতার এটি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মহাপ্রভুর বাহ্যদশায় অন্তরঙ্গ সঙ্গ

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সমাধিস্থ হয়ে তিন দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় পুরীতে গম্ভীরায় শুয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দ দেখলেন তিনদ্বার রুদ্ধ, কিন্তু মহাপ্রভু নেই। তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে তাঁরা মহাপ্রভুকে সর্বত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন, দেখলেন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরে মহাপ্রভু অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। স্বরূপ দামোদর ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর কানের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করতে থাকলে মহাপ্রভু 'হরিবোল' বলে গর্জে উঠে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। মহাপ্রভুর বাহ্যস্মৃতি হলে স্বরূপ দামোদর তাঁকে পুনরায় গম্ভীরায় নিয়ে এলেন। একদিন মহাপ্রভু চটক পর্বতকে গোবর্ধন পর্বত মনে করে ধাবিত হলেন। স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ পেছনে পেছনে চললেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার অবস্থায় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সব ভক্তগণ তা দেখে কাঁদতে লাগলেন। ভক্তগণের মহাসংকীর্তনে মহাপ্রভুর সংজ্ঞা ফিরে এলে তিনি অর্ধবাহ্য-দশায় প্রলাপে উক্তি করতে লাগলেন– "আমি গোবর্ধনে ছিলাম, কৃষ্ণ গাভী চরাচ্ছিল, কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করল, তা শুনে গোপীগণসহ রাধাঠাকুরাণী সেখানে এলো, রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ কন্দরে প্রবেশ করল, এমন সময় তোমরা আমাকে এখানে আনলে, কেন আনলে দুঃখ দিতে?"– এই

বলে মহাপ্রভু ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করতে থাকলে ভক্তগণও কাঁদতে লাগলেন।

তারপর একদিন গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে অর্ধরাত অতিবাহিত করলেন। অনেক যত্ন করে মহাপ্রভুকে শুইয়ে স্বরূপ দামোদর ও রায়রামানন্দ নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। গম্ভীরার ঘরে গোবিন্দ শয়ন করলেন। মাঝরাতে মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করতে করতে হঠাৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনতে পেলেন, ভাবাবেশে গম্ভীরা থেকে বের হয়ে চলে গেলেন, অথচ তিন জায়গায়ই দরজা বন্ধ। সিংহদ্বার-দক্ষিণে তৈলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায়, মহাপ্রভুকে দেখতে না পেয়ে স্বরূপ দামোদরকে খবর দিলেন। স্বরূপ দামোদর অন্যান্য ভক্তগণের সাথে দীপ নিয়ে মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। সিংহদ্বারে গাভীগণের মাঝে মহাপ্রভুকে দেখতে পেলেন, পেটের ভেতর হস্তপদ প্রবিষ্ট হয়ে কূর্মাকার রূপ ধারণ করেছেন। মুখে ফেনা, শ্রীঅঙ্গে পুলক, নেত্রে অশ্রুধারা, কুষ্মাণ্ডফলের ন্যায় পড়ে আছেন। বাইরে বিষজ্বালা, ভিতরে আনন্দ। গাভীগণ চারদিক থেকে মহাপ্রভুর অঙ্গের গন্ধ শুঁকছে, সরিয়ে দিলেও আবার আসছে। অনেক চেষ্টা করেও জ্ঞান না ফিরলে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে উঠিয়ে গম্ভীরায় নিয়ে এলেন। বহুক্ষণ মহাপ্রভুর কানের সামনে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করলে মহাপ্রভু জ্ঞান ফিরে পেলেন, পুনরায় শ্রীঅঙ্গ স্বাভাবিক হলো। মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞেস করলেন– "তুমি আমাকে কোথা থেকে আনলে? আমি বংশীধ্বনি শুনে বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গোষ্ঠে বেণু বাজাচ্ছে, বেণুর সঙ্কেত বুঝে রাধারাণী কুঞ্জকুটিরে এসেছে, আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম, তাঁর অলঙ্কারের ধ্বনি, গোপীগণের কণ্ঠধ্বনি, হাস্য-পরিহাস শুনে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তোমরা আমাকে জোর করে এখানে এনেছো। আর সেই অমৃতময় মুরলীধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না।"

স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর ভাব বুঝে মধুর কণ্ঠে ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করলেন–

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥

–ভা. ১০/২৯/৪০

"হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হয়ে ত্রিলোকের মধ্যে কোন স্ত্রী আর্যরচিত (ধর্ম) হতে বিচলিত না হয়? ত্রিলোকের সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এ রূপ দেখে গোসকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক ধারণ করে থাকে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক শোনামাত্র গোপীভাবাবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণের প্রতি গোপীর ভাবসমূহ গান করতে লাগলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আরো একটি অলৌকিক ঘটনার কথা লিখেছেন। একদিন রাসলীলার উদ্দীপনাময় শারদীয় জ্যোৎস্না রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রান্তবর্তী উদ্যান (বিশ্রামস্থান) আইটোটা হতে ভক্তগণসহ ভ্রমণকালে রাসলীলার গীতসমূহ আস্বাদন

করছিলেন। ভ্রমণ করতে করতে সমুদ্র দেখেই যমুনাভ্রমে ঝাঁপ দিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ ভাসতে ভাসতে কোণার্কের দিকে চলল। এক জেলে বড় মাছ মনে করে জাল দিয়ে টেনে তুললো, দেখলো হস্তপদ সম্প্রসারিত বিশাল পুরুষ। তাঁকে স্পর্শ করামাত্র ধীবর প্রেমাবিষ্ট হয়ে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগল। এদিকে স্বরূপ দামোদর অন্যান্য ভক্তগণসহ মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। বহু অন্বেষণের পর জেলের কাঁধে মহাপ্রভুকে দেখতে পেলেন। স্বরূপ দামোদর প্রেমবিকারযুক্ত জেলেকে মহাপ্রভুর তত্ত্ব বুঝিয়ে মাথায় তিন চাপড় মেরে আশ্বস্ত করলেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করতে থাকলে মহাপ্রভু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্ধবাহ্যদশায় চিত্রজল্পোক্তি শ্রবণে ভক্তগণ মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ উপলব্ধি করে পুলকিত হলেন– গোপীগণের সাথে কৃষ্ণের রাসলীলা ও জলক্রীড়া লীলায় মহাপ্রভু প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। পরে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় নিয়ে এলেন।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রেরিত তর্জাপ্রহেলিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ইঙ্গিত পেয়ে স্বরূপ দামোদর বিমনা হলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ উন্মাদনা আরো বৃদ্ধি পেলো।

নামসংকীর্তনই যে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সর্বোত্তম উপায়, তা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়রূপে জানিয়েছেন–

হর্ষে প্রভু কহেন– শুন স্বরূপ রামরায়। নামসংকীর্তন–কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ। সর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ২০/৮-১১

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোকার্থ আস্বাদন করতে করতে ক্রমশ দৈন্য কৃষ্ণবিরহ বর্ধনক্রমে রাধাভাববিভাবিত প্রেমে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশায় স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দই সারাক্ষণ অবস্থান করে তাঁর বিপ্রলম্ভ ভাবের পুষ্টি সাধন করেছিলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিতে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু অপ্রকট হয়েছিলেন।
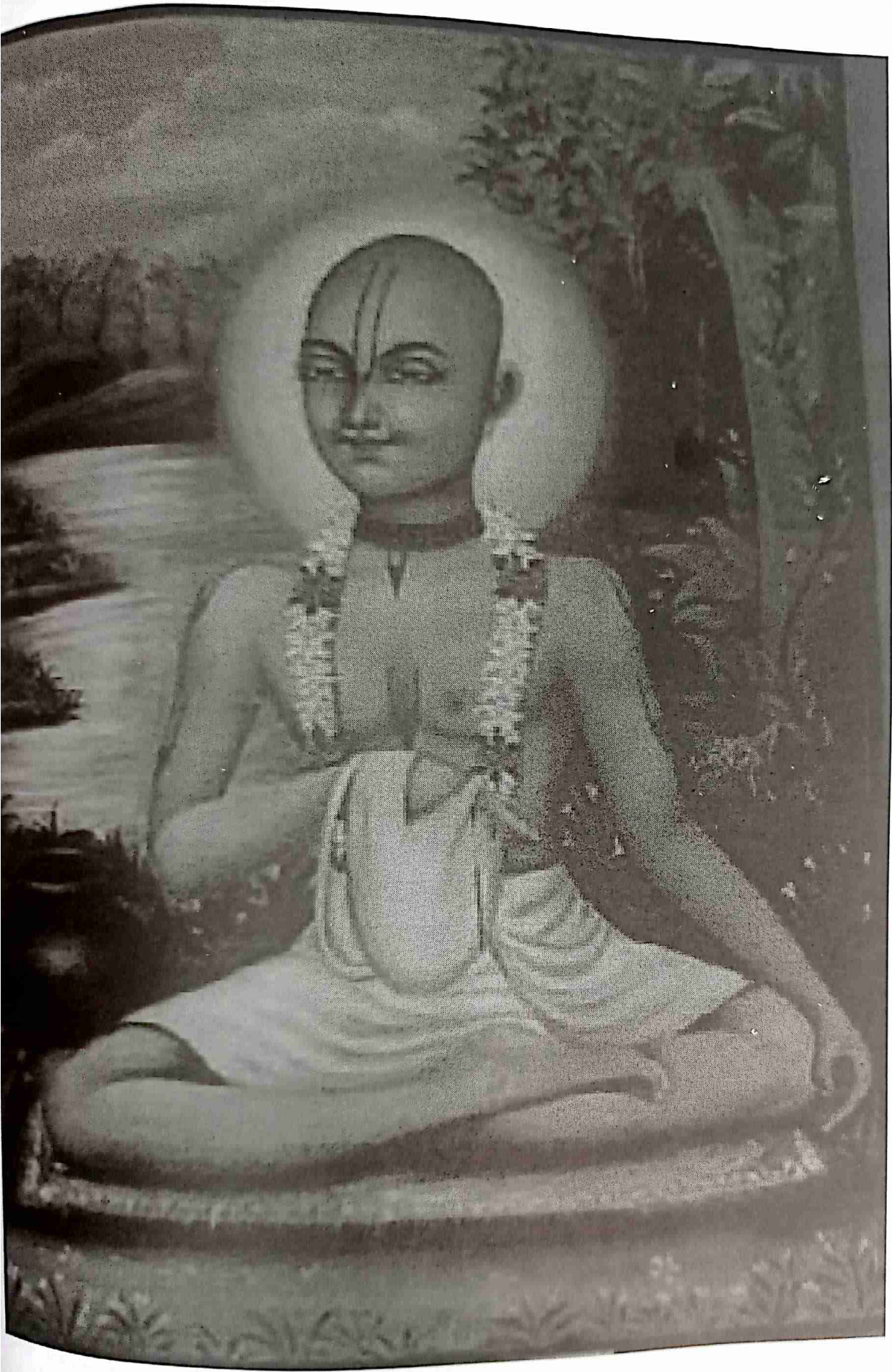
শ্রীল সনাতন গোস্বামী

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীধাম বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণব স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়নাদি এবং সাধন ভজনের আচার্যরূপে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি ভগবানের নিত্য পরিকর হলেও, সাংসারিক মোহ স্বরূপত তাঁর না থাকলেও বৈষয়িক লোকের শিক্ষার জন্য শ্রীভগবানেরই ইঙ্গিতে সংসারাসক্ত লোকের ন্যায় আচরণ করেছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসার সাগরে নিমজ্জিত পরমার্থ বিমুখ লোকের ভজনক্রম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক ষড়গোস্বামীগণের সর্বজ্যেষ্ঠ ও সর্বপূজ্য। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলা হয়েছে–

যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।
সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ ॥
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্বারাধ্যঃ সনাতনঃ
তমেব প্রাবিশৎ-কার্যান্মুনিরত্নং সনাতনঃ ॥

–গৌরগণোদ্দেশ ১৮১

"কৃষ্ণলীলায় যিনি রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী অথবা লবঙ্গমঞ্জরী, তিনিই গৌরাভিন্নতনু শ্রীসনাতন গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। চতুঃসনের অন্তর্গত 'সনাতন' তার মধ্যে প্রবিষ্ট আছেন।"

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান'-এ লিখিত আছে যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী আনুমানিক ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উর্ধ্বতন সাতপুরুষের কথা জানা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় উল্লেখ করেছেন (রূপগোস্বামীর জীবনীতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে)। সনাতন গোস্বামীর পিতার নাম কুমারদেব এবং মাতা রেবতী দেবী। কুমারদেবের অনেক পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র প্রসিদ্ধ। তাঁদের নাম যথাক্রমে সনাতন (অমর), রূপ (সন্তোষ) এবং শ্রীবল্লভ (অনুপম)। সনাতন তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

ভাগবত প্রাপ্তি এবং শিক্ষা গ্রহণ

বাল্যকালেই সনাতন ভাগবতে অত্যন্ত প্রীতি পোষণ করতেন। তাঁর প্রথম বয়সেই এক বিপ্র স্বপ্নে তাঁকে ভাগবত প্রদান করেন। স্বপ্ন ভেঙে গেলে সনাতন ভাগবত প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হলেন। পরদিন সকালে ঐ বিপ্র এসে সনাতনকে ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করেন। সনাতন ভাগবত পেয়ে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী অল্পবয়সে অধ্যাপক শিরোমণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ

ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হলেও ম্লেচ্ছের চাকরি করেছিলেন বলে বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশত নিজেকে সর্বদা দীনহীন জ্ঞান করতেন।

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥
সর্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যার ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাই ॥

–ভক্তিরত্নাকর ১/৫৯৮-৫৯৯

সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী সর্বদা শাস্ত্রচর্চা করতেন। তাঁরা ন্যয়শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করতেন আবার নিজেরাই তা খণ্ডন করতেন। সমগ্র দেশব্যাপী তাঁদের গুণগান হতে লাগল–

সর্বত্র ব্যাপিল এ দোহার গুণগান। কর্ণাট দেশাদি হৈতে আইসে বিপ্রগণ ॥
সনাতন-রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে। বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে ॥

রাজকার্যে নিযুক্তি ও মহাপ্রভুকে দর্শনের উৎকণ্ঠা

রূপ-সনাতনের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি সব বিষয়ে সর্বোত্তম জেনে তৎকালীন রাজা হোসেন শাহ তাঁদের রাজ্যভার প্রদানের অভিমত প্রকাশ করলেন। রাজাজ্ঞা না মানলে অসুবিধা হতে পারে, এ আশঙ্কায় অগত্যা রাজ্যভার গ্রহণে দুই ভাই স্বীকৃত হলেন। তখন হোসেন শাহ অমরকে (সনাতন) সাকর মল্লিক এবং সন্তোষকে (রূপ) দবির খাস নামে ভূষিত করে নিজ রাজধানীতেই সুরম্য বাসস্থান, যানবাহনাদি এবং সেবক ও ভোগ-বিলাসের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজকার্য বহন করা সত্ত্বেও রূপ-সনাতন নিজেদের দৈন্য ও দুরবস্থা জ্ঞাপন করে মহাপ্রভুর নিকট অনেকবার পত্র প্রেরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র বিহরে নদীয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া ॥

মহাপ্রভু তাঁদের মনের আকুলতা জেনে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য পত্র দ্বারা একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন। শ্লোকটি ছিল–

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ নবসঙ্গরসায়নম্ ॥

অর্থাৎ পর পুরুষে অনুরক্তা রমণী যেমন গৃহকর্মে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেও সর্বদা অন্তঃকরণে কান্তের স্মরণের দ্বারা নবনব সঙ্গম রস আস্বাদন করে। তদ্রূপ রাগমার্গীয় ভক্ত বাহ্যে বিষয়ীর ন্যায় লোকব্যবহার প্রদর্শন করেও অন্তরে অনুক্ষণ নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ স্মৃতিতে সংলগ্ন থাকেন। এ বাক্যের দ্বারা মহাপ্রভু রূপ-সনাতনকে রাজকার্যে মন নিবিষ্ট রাখার কথা বললেন।

মহাপ্রভুর রামকেলি আগমন

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হয়ে পুরীতে গেলেন। সেখান থেকে গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবন যাত্রাকালে মহাপ্রভুর সাথে বহু লোক ছিল। মহাপ্রভু মালদহে রামকেলি গ্রামে পৌঁছালে তাঁর সাথে শ্রীরূপ-সনাতনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাথে অসংখ্য হিন্দু দেখে যবনরাজ বাদশা প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন। বাদশা যাতে মহাপ্রভুর সাথে শত্রুতা না করে সেজন্য ক্ষত্রিয় কেশব বাদশাকে সেভাবে প্রবোধ দিলেন। সৌভাগ্যের

কথা বলে তাঁকে উৎসাহিত করলেন। ক্ষত্রিয় কেশব গোপনে ব্রাহ্মণ পাঠালে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের মাধ্যমে রূপ-সনাতনকে শীঘ্র অন্যত্র চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন যুক্তি করে উভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হয়ে অত্যন্ত দৈন্যার্তি জ্ঞাপন করে বললেন–

জগাই-মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ। অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসেবী, করি ম্লেচ্ছকর্ম। গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিয়া। কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্তে দিয়াছে ফেলাইয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। পতিতপাবন তুমি– সবে তোমা বিনে ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/১৯৬-১৯৯

আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ।
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে। তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/২০৪-২০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনে কৃপার্দ্রচিত্ত হয়ে বললেন– "তোমরা আমার পুরাতন দাস, আজ হতে তোমাদের নাম 'রূপ' 'সনাতন'। গৌড়-রামকেলিগ্রামে আমি এসেছি তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করবেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্য লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ২০৮ পয়ার) অনুভাষ্যে লিখেছেন– শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদদানে দবির খাসের নাম রূপ এবং সাকর মল্লিকের নাম সনাতন রেখেছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধিকারীদের নামকরণ একটি সংস্কার। যারা নাম প্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই; জড় প্রতিষ্ঠায় তারা মত্ত থাকে। "*শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ পুণ্ড্রধারণদ্যাত্মলক্ষণম। তন্নাম করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোতচ্যতে ॥*' প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণুদাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্তমানে তারা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য নয়। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরু প্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জেনে প্রাগবর্ণোচিত নামাদি সংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।"

রামকেলিতে মহাপ্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাচস্পতি, গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি ভক্তগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের উপর আশীর্বাদ করালেন। বিদায়কালে সুবিচক্ষণ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর পাদপদ্মে এই বলে নিবেদন করলেন–

ইঁহা হৈতে চল, প্রভু, ইহাঁ নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি। তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন-যাত্রার এ নহে পরিপাটী ॥

–চৈ.চ. মধ্য ১/২২২-২২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাই নাটশালা পর্যন্ত যাওয়ার পর সনাতনের পরামর্শের কথা চিন্তা করে বৃন্দাবন না গিয়ে শান্তিপুর হয়ে পুরী যাত্রা করলেন।

গণসহ সনাতন-রূপে কৃপা করি।
রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥

–ভক্তিরত্নাকর ১/৬৩৫

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ-সনাতন গৌরলীলার পুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হয়ে সাধকরূপে লীলাবিলাসকালে রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরে তীব্র বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা প্রকট করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম শীঘ্র লাভের আশায় তাঁরা কৃষ্ণমন্ত্রে দুটি পুরশ্চরণ করালেন।

সনাতনের রাজকার্য ত্যাগ

শ্রীরূপ গোস্বামী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে সনাতন গোস্বামীর জন্য গৌড়দেশে মুদিখানায় দশ হাজার মুদ্রা রেখে নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নিয়ে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে গেলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও আত্মীয়স্বজনকে অর্থ বণ্টন করে দিলেন এবং চার ভাগের এক ভাগ বিভিন্ন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রাখলেন। তারপর মহাপ্রভু বনপথে কবে বৃন্দাবন যাত্রা করবেন তা জানার জন্য রূপগোস্বামী দুজন ব্যক্তিকে পুরুষোত্তম ধামে প্রেরণ করলেন।

বাদশা হুসেন শাহ্ সনাতন গোস্বামীকে ছোট ভাইরূপে দেখতেন এবং খুব প্রীতি করতেন। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করলেন, বিষয়ী ব্যক্তির প্রীতি বন্ধনের কারণ। কোনোভাবে রাজা ক্রুদ্ধ হলে বিষয়ের বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া যাবে। বিষয়ী ব্যক্তির ক্রোধ ও অনাদর হতে মঙ্গল সাধন হয়। এজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী অসুস্থতার ছলে রাজকার্য না করে নিজের গৃহে পণ্ডিতগণকে নিয়ে ভাগবত চর্চা করতে লাগলেন। হঠাৎ সনাতন রাজকার্য ত্যাগ করায় বাদশা চিন্তিত হলেন। সনাতনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি বৈদ্য পাঠালেন। বৈদ্য ফিরে এসে বাদশাকে জানান যে, সনাতন সুস্থ এবং তিনি পণ্ডিতগণের সাথে ভাগবত আলোচনা করছেন। তা শ্রবণ করে বাদশা নিজেই সনাতনের কাছে এলেন। বাদশা তাঁকে অনেক প্রীতিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু সনাতন রাজকার্য করতে অস্বীকার করলেন এবং উড়িষ্যার বাদশার সঙ্গে যুদ্ধে যেতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাদশা চিন্তিত হয়ে সনাতনকে কারারুদ্ধ করে যুদ্ধে গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবনে যাত্রা করেছেন সংবাদ পেয়ে শ্রীরূপগোস্বামী ছোট ভাই অনুপম মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন এবং যেকোনোভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আসার জন্য সঙ্কেত লিখে সনাতন গোস্বামীর নিকট পত্র পাঠালেন।

পত্রের সঙ্কেত বুঝে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হলেন। সুবুদ্ধিমান সনাতন কী করে কারাগার থেকে মুক্ত হবেন চিন্তা করে কারারক্ষীকে (যাকে তিনিই পূর্বে উক্ত চাকরিতে নিয়োগ দিয়েছিলেন) প্রথমে অনেক প্রশংসামুখে 'একজন বদ্ধকে মুক্ত করলে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করেন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত করলেও যবনকারারক্ষীর মন দ্রবীভূত হলো না। তখন তিনি প্রত্যুপকার প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ তিনি তাকে চাকরি দিয়েছিলেন সেই উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার চাইলেন। তা সত্ত্বেও কারারক্ষী তাঁকে মুক্ত করতে রাজি না হলে সনাতন গোস্বামী তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রলোভন দেখালেন। মুদ্রার কথা শুনে যবন কারারক্ষীর কঠোর মনোভাব শিথিল হলো। কিন্তু মুক্তি দিলে বাদশার দ্বারা দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করল। সনাতন তাকে বুঝালেন–"বাদশা যুদ্ধে গেছেন। যদি ফিরে আসেন, বলতে হবে

সনাতন বাহ্যকৃত্যে গিয়েছিল, গঙ্গা দেখে ঝাঁপ দিল, কোথায় চলে গেল দেখতে পেলাম না।” তিনি আরো বললেন যে, তিনি এখানে থাকবেন না, দরবেশ হয়ে মক্কা যাবেন, সুতরাং তার চিন্তা নেই। এভাবে নানাবিধ মিষ্টবাক্যে বুঝালেও যবনমন প্রসন্ন না হলে সনাতন গোস্বামী মুদিখানায় রক্ষিত অর্থ থেকে সাত হাজার মুদ্রা এনে যবন কারারক্ষীর সম্মুখে রাখলেন। মুদ্রা দেখে যবনের লোভ হলো এবং সে বেড়ী কেটে সনাতনকে গঙ্গা পার করে দিলেন।

কাউকে তোষামোদ করা, কারও কাছে প্রত্যুপকার প্রার্থনা করা, কাউকে প্রলোভিত করা, কাউকে মিথ্যা বলতে শিক্ষা দেওয়া, কাউকে উৎকোচ দেওয়া সবই আমরা অন্যায় বলে মনে করি। কিন্তু সনাতন গোস্বামী ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য বা ভগবৎসেবার জন্য সবগুলোই প্রয়োগ করলেন। মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করার জন্য সবকিছুরই যৌক্তিকতা নিরূপিত হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তার উপর ঐ কার্যের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নির্ভর করে। রামদাস শ্রীহনুমানজী পরমব্রহ্ম শ্রীরামের সেবার জন্য লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও বহু প্রাণী হত্যা করেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলময় শ্রীহরির প্রীতির জন্য হওয়ায় তাতে সকলেরই কল্যাণ হয়েছে এবং হনুমান আজও সমাদৃত হয়ে পূজিত হচ্ছেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে মন্দির পূজা করাও তামসিক হয়ে যায়, যদি উদ্দেশ্য অপরের অনিষ্টসাধন হয়। জাগতিক বিচারেও আমরা দেখতে পাই যে, নরহত্যা করলে প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দেশকে বাঁচাবার জন্য শত্রু পক্ষের লোকজনকে হত্যা করলে প্রাণদণ্ডতো হয়-ই না, বরং পুরস্কৃত হয়। কারণ, এ কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়নি, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হয়েছে। এটা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তদ্রূপ ক্ষুদ্র দেশ বা পৃথিবী নয়, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক মঙ্গলময় ভগবানের জন্য যা করা যায় তা-ই সুসঙ্গত এবং তাতে সকলেরই মঙ্গল হয়। ‘*মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে*’ ভগবানের জন্য কৃত পাপকার্যও ধর্ম। কিন্তু কপটতা আশ্রয় করে ভগবানের নাম করে যদি আমরা নিজের প্রাকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম করি, পাপ করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের নরকগামী হতে হবে। হনুমানের প্রাকৃত অভিমান বা উদ্দেশ্য ছিল না।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

–*গীতা ১৮/১৭*

যখন আত্মার অহৈতুকী ভক্তি প্রকটিত হয়, যখন যথার্থই ভগবানের জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা আসে, তখন জগতের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিচার বিসর্জিত হয়। অহৈতুকী ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে বৈরাগ্য প্রকাশ হয়। প্রধানমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী রিক্তহস্তে জেল থেকে মুক্ত হয়ে রাজপথ পরিত্যাগ করে গ্রামের পথ দিয়ে দুর্বার গতিতে চলতে চলতে পাতড়া পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। পর্বত পার হওয়ার রাস্তা খুঁজে না পেয়ে সনাতন গোস্বামী এক দস্যু-দলপতির সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর পুরাতন ভৃত্য ঈশানও সঙ্গে ছিল। দস্যু দলপতি জানতে পারলেন যে, ঈশানের কাছে আটটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, এজন্য সে সনাতনকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল। সুবুদ্ধিমান রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তা করলেন, অপরিচিত ব্যক্তির এত আদর-যত্নের কারণ কী! সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞেস করলেন তার কাছে কিছু আছে কিনা। ঈশান একটি মোহর গোপন করে সাতটি মোহরের কথা

বললেন। সনাতন গোস্বামী *'সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কালযম?'* –এ বাক্যের দ্বারা ঈশানকে মৃদু ভর্ৎসনা করে তার কাছ থেকে সাতটি মোহর নিয়ে দস্যু দলপতিকে দিয়ে তাঁকে পর্বত পার করে দিতে অনুরোধ করলেন। দলপতি তখন ঈশানের কাছে আটটি মোহর থাকার কথা এবং রাতেই তাঁদের হত্যা করার সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে প্রসন্ন চিত্তে মোহর ফেরত দিতে চাইলেও সনাতন গোস্বামী তা গ্রহণ করলেন না। কারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্বদা জানেন– *"অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদপি ভয়ঙ্করঃ" "ধূর্তস্য বচনে কাস্থা, ক্বচিৎ সত্যং ক্বচিৎ মৃষা, ক্বচিৎ রৌদ্রং, কশ্চিৎ বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য ঘনো যথা।"* ধূর্তের বচনের কোনো স্থিরতা নেই।

পর্বত পার হওয়ার পর সনাতন গোস্বামী ঈশানকে অবশিষ্ট মোহর নিয়ে দেশে ফিরে যেতে বললেন। 'মোহর' রক্ষা করবে এমন জড় নির্ভরশীলতা থাকলে তার সংসার ত্যাগের অধিকার হয় না। অনধিকারী ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করলে তার ত্যাগকৃত আশ্রম দূষিত হয়। সনাতন গোস্বামী তাঁর ভৃত্য ঈশানের মাধ্যমে এই শিক্ষা দিলেন। তিনি ঈশানকে বিদায় দিয়ে চলতে চলতে পাটনার অপর পারে হাজীপুরে এসে পৌঁছালেন। সেখানে ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সাথে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ হলো। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে বিশ্রামের জন্য একদিন থাকতে অনুরোধ করলেও মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যাকুল সনাতন গোস্বামী অপেক্ষা করতে অস্বীকার করলেন। তখন শ্রীকান্ত তাঁকে একটি মূল্যবান ভোটকম্বল দিলেন এবং তা নিয়ে সনাতন গোস্বামী আবারও মহাপ্রভুর উদ্দেশে রওনা হলেন।

চন্দ্রশেখর ভবনে মিলন

সনাতন গোস্বামী কয়েক দিনের মধ্যেই বারানসিতে পৌঁছে শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানতে পেরে পরমানন্দিত হলেন। তিনি প্রথমে চন্দ্রশেখরের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ না করে বহির্দ্বারে বসে রইলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভুর ভক্তের আগমন জানতে পেরে চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে তাঁকে গৃহাভ্যন্তরে আসতে বললেন। সনাতন গোস্বামী গৃহে প্রবেশ করলে মহাপ্রভু ছুটে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব মিলনে উভয়ের অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকটিত হলো। মহাপ্রভু সনাতনকে পাশে বসিয়ে অত্যন্ত স্নেহাপ্লুত হয়ে তাঁর অঙ্গ মার্জন করতে লাগলেন। সনাতন গোস্বামী সঙ্কুচিত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে নিষেধ করলে মহাপ্রভু বললেন–

প্রভু কহে– "তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্বেন্দ্রিয়-ফল– এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥

–চৈ.চ. মধ্য ২০/৫৬, ৬০

সনাতন গোস্বামী তাঁর ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করতে পারেন, এমনকি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে তাঁর স্পর্শে পবিত্র হবেন– এরূপ ভাবনায় মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে স্পর্শ করছেন; এ কথা বলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন– শুন সনাতন, "কৃষ্ণ কৃপার সমুদ্র, পতিতপাবন, তোমাকে মহারৌরবরূপ নরক হতে উদ্ধার করলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে থাকতেন এবং শ্রীতপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহ করতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশে সনাতন গোস্বামী চন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং তপন মিশ্রের সাথে মিলিত হলেন। তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণে সনাতন গোস্বামীও তাঁর গৃহে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পেলেন। বহুদিন কারাগারে থাকায় সনাতন গোস্বামীর কেশ-শ্মশ্রু অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, মহাপ্রভু তাঁকে ক্ষৌরকার্য করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে বললেন। বৈষ্ণবগণের পক্ষে দাড়ি-গোফ রাখা বিধি নয়। চাতুর্মাস্য ব্রতাদি পালনের জন্য নখ-রোম রক্ষা করলেও অন্য সময় ক্ষৌরকার্য করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বৈষ্ণব সদাচার। তবে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রতি পূর্ণিমায় ক্ষৌর বিধান আছে। প্রতিদিন ক্ষৌরকর্ম দ্বারা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

সনাতন ক্ষৌরকার্যের পর গঙ্গাস্নান করে এলে শ্রীচন্দ্রশেখর নতুন বস্ত্র দিতে চাইলেন। সনাতন তা গ্রহণ না করে পুরাতন বস্ত্র চেয়ে নিলেন। যিনি হাজার হাজার লোককে বস্ত্র দিতে পারেন, আজ তিনি নতুন নিতে সংকোচ বোধ করছেন।

ভগবদ্ভজনের জন্য যখন নিষ্কপট আর্তি জাগে, তখন ভালো পোশাক, ভালো আহারের প্রতি রুচি থাকে না। বৈষ্ণব প্রদত্ত দ্রব্য বা বৈষ্ণবগণের ব্যবহৃত বস্তু প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে বিষয়ের দোষ থাকে না। সনাতন গোস্বামীর প্রতি আচরণের মধ্যে নিঃশ্রেয়স্বার্থী সাধকের অপূর্ব শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। "*মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট গৌর ভগবান ॥*" জাগতিক ভোগবিলাসে প্রমত্ততা ও প্রতিযোগিতা এলে পারমার্থিক জীবনের পতন ঘটে।

এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র– সনাতন গোস্বামী যতদিন কাশীতে থাকবেন, ততদিন তাঁর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ করলে সনাতন গোস্বামী বললেন– তিনি একস্থানে প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ না করে মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করবেন। শুদ্ধ হরিভজনকারী ব্যক্তির দেহসুখের স্পৃহা থাকে না।

সনাতন গোস্বামীর পুরাতন বস্ত্রের বহির্বাস ও উত্তরীয়ের সাথে মূল্যবান ভোটকম্বলের প্রতি মহাপ্রভু বারবার দৃষ্টি দিতে থাকলে সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন যে, মহাপ্রভু এতে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। তখন সনাতন গোস্বামী গঙ্গাতটে গিয়ে একজন গৌড়ীয় বাবাজিকে ঐ ভোটকম্বলটি দিয়ে তাঁর ব্যবহৃত কাঁথা পরিধান করে এলেন। মহাপ্রভু তা দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন।

প্রভু কহে– "ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষে বিষয়-ভোগ? রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। ধর্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥

–চৈ.চ. মধ্য ২০/৯০-৯২

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হয়েও সর্বোত্তম আচার্যের লীলা করেছেন, তিনি যেমন স্বয়ং আচরণ করে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর পার্ষদগণও তদ্রূপ।

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥

–চৈ.চ. আদি ৩/২০-২১

মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলে তাঁর সদ্ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করার যোগ্যতা হলো। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ববিষয়ে পরিপ্রশ্ন বা নিষ্কপট জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। নিজে যা বুঝেছি তা-ই ঠিক– এরূপ মনে করে অথবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য যে প্রশ্ন, তাকে তর্ক পন্থা বলে, তাতে বস্তু লাভ হয় না। প্রপত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছা হতে যে প্রশ্ন, তাকে পরিপ্রশ্ন বলে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

–গীতা, ৪/৩৪

যখন মানুষের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সংসার হতে মুক্তি লাভের দিন আসে, তখন গুরুপাদপদ্মে কী প্রশ্নের উদয় হয়, তা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী অজ্ঞ সাধকরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করে জগদ্বাসীকে জানাচ্ছেন–

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম। কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম!
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি! গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন-কৃপাতে কহ 'কর্তব্য' আমার ॥
'কে আমি' 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'। ইহা নাহি জানি–'কেমনে হিত হয়' ॥
'সাধ্য'-'সাধন' তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি ॥

–চৈ.চ. মধ্য ২০/৯৯-১০৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে বললেন– "কর্তব্য কী? তা আমাকে বলুন"। তখন তিনি তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন–

১. **কে আমি?** –স্বরূপত আমি কে? আমার এ দেহটাই কি আমি?
২. **কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?** তাপ তিনপ্রকার– ক. আধিদৈবিক– শীত, উষ্ণ, বর্ষা, বিদ্যুৎ জনিত তাপ। খ. আধিভৌতিক– মানুষ, পশু, পাখি ও বিভিন্ন জীবজন্তু হতে প্রাপ্ত দুঃখ। গ. আধ্যাত্মিক– রোগাদি শারীরিক তাপ এবং কাম-ক্রোধাদি জনিত মানসিক তাপ। এই তিন প্রকার তাপ আমায় দুঃখ দেয় কেন?
৩. **কেমনে হিত হয়?** অর্থাৎ কীভাবে আমার মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ হবে?

তারপর সনাতন গোস্বামী বললেন– সাধ্য-সাধনতত্ত্ব কী? তা আমি জানি না। কৃপা করে আমাকে বলুন। মহাপ্রভু বললেন– "সনাতন, তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা। যার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, তাঁর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সবই তুমি জান। তবুও সাধুদের এটাই স্বভাব যে, জানা থাকলেও তাঁরা আরো দৃঢ়তার জন্য বারবার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বললেন–

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশ-কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয় ॥

–চৈ.চ. মধ্য. ২০/১০৮-১০৯

জীব তাঁর স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস। সে কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, তাই সে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের

ভেদ ও অভেদ প্রকার, ঠিক যেমন সূর্যের কিরণ অথবা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যুগপৎ সূর্য বা অগ্নি থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার। এখানে অবস্থিত অগ্নি যেমন সর্বত্র ব্যপ্ত হয়, সেরকম পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ জুড়ে ব্যপ্ত হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণের এ তিন শক্তির স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে চিৎশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। তারপর মহাপ্রভু তার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এ জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তার ভয় উপস্থিত হয়। ভগবানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তার স্মৃতি বিপর্যস্ত হয়। অর্থাৎ তখন সে কৃষ্ণের দাস হওয়ার পরিবর্তে কৃষ্ণের প্রতিযোগী হয়। তা-ই জীবের ত্রিতাপ দুঃখের কারণ। মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন জীব তার নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জীবকে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন। তারপর মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীপাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেন।

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

সাধু-শাস্ত্র হতে জীব যদি তার পতনের কারণ সম্বন্ধে জেনে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তবে সে নিস্তার লাভ করে এবং মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়। কেবল মায়ামুক্তিই জীবের পরম মঙ্গল নয়। তাই মহাপ্রভু আবার বললেন–

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তারপর গুরুসেবা দ্বারা কৃষ্ণের ভজনা করলে গুরুর কৃপাতেই কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি হয়।

তিনি সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ণয়ে বা সম্বন্ধ–অভিধেয়-প্রয়োজন নির্ধারণে যে উপদেশ প্রদান করেছেন, তাতে 'কৃষ্ণই' সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে নির্ণীত হয়েছে।

বেদশাস্ত্র কহে-'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'–প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'–প্রাপ্তের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি,' 'প্রেম' প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম-মহাধন ॥

–চৈ.চ. মধ্য ২০/১২৪-১২৫

বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে নিত্য-সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, তাকে বলা হয় 'সম্বন্ধ'। সে সম্বন্ধে অবগত হয়ে সে অনুসারে আচরণ করাকে বলে 'অভিধেয়'; আর ভগবানের প্রতি প্রেম হচ্ছে জীবের চরম লক্ষ্য এবং তাকে বলা হয় প্রয়োজন। জীবের প্রাপ্য 'কৃষ্ণ' যে তত্ত্ব, তা সম্বন্ধ জ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সাধনের নাম ভক্তি।

উপরিউক্ত বিষয়টি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলার বিংশ হতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সাথে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

মূল কথা হলো ঈশ্বর-জীব সম্বন্ধে ভেদ ও অভেদ উভয়ই শ্রুতিতে আছে। আচার্যগণ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করেছেন। শাস্ত্র মানতে হলে শাস্ত্রের ভেদ ও অভেদ উভয় প্রমাণ মানাই সমীচীন এবং তাদের মধ্যে কী সামঞ্জস্য, তা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন– যা পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

বৃন্দাবনে গমন

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে কিছু বিশেষ সেবাভার প্রদান করেছিলেন– ১. শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র প্রচার– (শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন), ২. লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ৩. বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকাশ, ৪. বৈষ্ণব আচার, ৫. বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্বক বৈষ্ণব সদাচার প্রবর্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণব সমাজ সংস্থাপন।

তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার। মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥
–চৈ.চ. মধ্য ২৩/১০৩-১০৪

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন এবং বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্তনের জন্য চারটি গ্রন্থরত্ন রচনা করেন। যথা: ১) 'হরিভক্তিবিলাস' টীকা-'দিগদর্শিনী', ২) দশম স্কন্ধের টিপ্পনী বা বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী, ৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত, ৪) বৃহদ্ ভাগবতামৃত (টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়), তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৃন্দাবনে 'শ্রীরাধামদনমোহন' বিগ্রহসেবা প্রকাশিত করেছেন। বৈষ্ণবস্মৃতি– বৈষ্ণবের লৌকিক আচার-ব্যবহার বিষয়ক শাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সূত্রাকারে সনাতন গোস্বামীকে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট ভাগবতের (১/৭/১০) এ শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শোনার জন্য সনাতন গোস্বামী প্রার্থনা করলে মহাপ্রভু এর ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে উত্তমরূপে সংস্কার করে বৃন্দাবন যেতে আদেশ করলেন এবং নিজে নির্জন বনপথে পুরী যাত্রা করলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজপথ দিয়ে মথুরায় পৌঁছালে সুবুদ্ধি রায়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে সময় সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর উপদেশে হরিনাম সংকীর্তন রূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শুকনো কাঠ বিক্রি করে বহু কষ্টে জীবিকা নির্বাহ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করতেন। শ্রীল সনাতন

গোস্বামী শ্রীসুবুদ্ধি রায় ও সনোড়িয়া বিপ্রের সাথে ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামী ও অনুপম দ্বাদশবন পরিক্রমাশেষে গঙ্গাতীরপথে বঙ্গদেশে যাত্রা করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে আরিট গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবিষ্কারপূর্বক গোবর্ধনে হরিদেব দর্শনের পর ইচ্ছা হলো গোবর্ধনধারী গোপালদেব দর্শন করবেন। গোপাল গোবর্ধন পর্বতের উপর বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্ধনের উপর উঠে দর্শন করবেন না, কিন্তু কীভাবে তিনি গোপাল দর্শন করবেন চিন্তা করছেন। সে সময় গোপাল ম্লেচ্ছভয় উঠিয়ে গাঁঠোলি গ্রামে এলে মহাপ্রভু গোপালের দর্শন লাভ করলেন। মাঝে মাঝে শ্রীগোপালদেব গোবর্ধন হতে এভাবে গাঁঠোলি গ্রামে আসার লীলা করতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীরও সেভাবে গাঁঠোলীতে গোপাল দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল।

শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবন থেকে যাত্রা করে বঙ্গদেশে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় গৌড়ীয় ভক্তগণের সাথে একত্রে নীলাচলে যেতে পারেননি। কিছুদিন পর তিনি নীলাচলে পৌঁছে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। সে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে রূপ গোস্বামী জানালেন যে, তিনি প্রয়াগ হতে গঙ্গাপথে আসায় সনাতন গোস্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।

নীলাচল যাত্রা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর মথুরা মণ্ডল থেকে একাকী ঝাড়িখণ্ড পথে নীলাচল যাত্রা করলেন। পথে জলের দোষে তাঁর শরীরে কুণ্ডরসা নামে এক প্রকার চর্মরোগ হয়। পথে যেতে যেতে দীনভাবে তিনি চিন্তা করলেন– তিনি নীচজাতি, তাঁর শরীর ঘৃণ্য; জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার, জগন্নাথ দর্শনের এবং মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের নিকট থাকায় তাঁরও দর্শন-সৌভাগ্য হবে না, জগন্নাথের সেবকগণের সাথে স্পর্শ হলেও অপরাধ হবে। সুতরাং রথাগ্রে শ্রীমন্নহাপ্রভুর নৃত্যকালে তাঁর শরীর ত্যাগ করাই শ্রেয়। পুরীতে পৌঁছে হরিদাস ঠাকুরের নিকট এসে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিতে এলে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গেলে সনাতন গোস্বামী নিজেকে অপবিত্রজ্ঞানে দূরে সরতে লাগলেন। কিন্তু মহাপ্রভু জোর করে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে পাঁচড়া ঘা-এর রস লেগে গেল। তা দেখে সনাতন গোস্বামীর মন বিদীর্ণ হলো। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে রূপগোস্বামী ও অনুপমের সংবাদ জানিয়ে অনুপমের ইষ্টনিষ্ঠা ও রঘুনাথধাম প্রাপ্তির কথা জানালেন। একদিন অন্তর্যামী মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর হৃদয়ের ভাব বুঝতে পেরে হঠাৎ সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন–

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে। কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে ॥"

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/৫৫-৫৬

এ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করে শিক্ষা দিলেন যে, দেহত্যাগরূপ তমো ধর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। একমাত্র শুদ্ধভক্তি অনুশীলনের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, আবার তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। সবশেষে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর কত প্রিয়, তা জানানোর জন্য বললেন–

প্রভু কহে–"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন। তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে? ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর–মোর প্রধান 'সাধন'। এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥"

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/৭৬-৭৮

চাতুর্মাস্যের সময় গৌড়দেশের ও উড়িষ্যার ভক্তগণ পুরীধামে এলে সনাতন গোস্বামীর সাথে সকলের মিলন হলো। রথযাত্রায় রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করে সনাতন গোস্বামী বিস্মিত হলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্মাস্য শেষে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করলে সনাতন গোস্বামী পুরীতেই অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠ মাসে কিছুদিন যমেশ্বর টোটায় অবস্থান করেছিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে সেখানে দুপুরে আসার জন্য আহ্বান করলেন। সনাতন গোস্বামী আনন্দিত মনে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে সিংহদ্বারের পথে না গিয়ে সমুদ্রের তপ্ত-বালির উপর দিয়ে মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হলেন। দেহস্মৃতি না থাকায়, তাঁর পায়ে যে ফোস্কা পড়ল তা-ও অনুভব করলেন না। মহাপ্রভু সিংহদ্বারের পথে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সনাতন গোস্বামী বললেন–

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। বিশেষে–ঠাকুরের তাঁহা সেবকের-প্রচার ॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর। তাঁর স্পর্শ হৈলে, সর্বনাশ হবে মোর ॥"

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/১২৬-১২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যোক্তিপূর্ণ এবং মর্যাদা প্রদানরূপ বাক্য শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন–

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন। তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব–মর্যাদা-রক্ষণ। মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস। ইহলোক, পরলোক–দুই হয় নাশ ॥
মর্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন। তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন?"

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/১২৯-১৩২

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বারবার আলিঙ্গন করলে সনাতনের শরীরের কুণ্ডরসা বারবার মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগায় একদিন সনাতন জগদানন্দ পণ্ডিতকে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে দুঃখ করে উক্ত অসুবিধার কথা নিবেদন করলেন এবং এ অপরাধ থেকে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞেস করলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁকে বৃন্দাবন যাবার পরামর্শ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় হরিদাস ঠাকুরের স্থানে এসে সনাতনকে জোরপূর্বক আলিঙ্গন করলে সনাতন দৈন্যভরে মহাপ্রভুকে তাঁর পুরীতে আসা গুরুতর অপরাধের কারণ হয়েছে বলে ব্যক্ত করলেন। বারবার তাঁর কদর্যকুণ্ড ক্লেদযুক্ত শরীরের স্পর্শ মহাপ্রভুর অঙ্গে লেগেছে, তাই

তিনি বৃন্দাবন যেতে মহাপ্রভুর আদেশ প্রার্থনা করলেন এবং পণ্ডিত জগদানন্দও যে এরূপ পরামর্শ দিয়েছেন তা-ও জানালেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–

কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্বী হৈল। তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি–তার গুরু-তুল্য। তোমারে উপদেশে, না জানে আপন-মূল্য ॥
আমার উপদেষ্টা তুমি–প্রামাণিক আর্য। তোমারেহ উপদেশে বাল্কা করে ঐছে কার্য ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/১৫৮-১৬০

শ্রীজগদানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর শাসন বাক্য শ্রবণ করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী জগদানন্দের সৌভাগ্যের প্রক্ষাপণ কথা মহাপ্রভুকে বললেন–

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/১৬৩

তা শুনেও শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত জগদানন্দের কাজের অসমর্থন জানালেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্যে লিখেছেন–"যার যে মর্যাদা, সেই মর্যাদা অতিক্রমপূর্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদান-কার্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেননি, অধিকন্তু জগদানন্দের মতো বয়ঃকনিষ্ঠের এমন ব্যবহারের অনুমোদন করলেন না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের অপ্রাকৃত শরীরকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে দর্শন নিষেধ করলেন।

তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান। তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৪/১৭২-১৭৩

শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাঁদের প্রতি মহাপ্রভুর প্রশংসাবাক্য অস্বীকার করলে মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে পুনরায় বুঝিয়ে বললেন– "তোমাদের আমি আমার লাল্য বলে মনে করি এবং নিজেকে তোমাদের লালক বলে অভিমান করি। লালক কখনো লাল্যের দোষ দর্শন করে না। শিশু যখন মায়ের কোলে মল ও মূত্র পরিত্যাগ করে তখন মায়ের মনে ঘৃণার উদয় হয় না বরং তা পরিষ্কার করে মহাসুখ পান। লাল্যের মল-মূত্র চন্দনের মতো মনে হয়। তেমনই সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয় না। তারপর মহাপ্রভু বললেন, ভক্তের দেহ কখনোই প্রাকৃত নয়। তা চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ। দীক্ষার সময় ভক্ত যখন সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিজের বলে গ্রহণ করেন। তখন তিনি তাঁর সেই দেহ চিদানন্দময় করে তোলেন এবং সেই অপ্রাকৃত দেহে ভগবানের সেবা করেন। সনাতন শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ, তাঁর দেহে কোনো দুর্গন্ধ থাকতে পারে না। আমি তাঁকে আলিঙ্গন করার সময় চন্দন কর্পূরাদির সুগন্ধ পেয়েছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য সনাতনকে এখানে পাঠিয়েছিলেন।

এবার শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের দেহ থেকে কণ্ডু অন্তর্হিত হয়ে স্বর্ণের ন্যায় হলো।

বৃন্দাবনে পুনরাগমন

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে সেবছর পুরীতে অবস্থান করে পরের বছর বৃন্দাবন যেতে আদেশ করলেন। দোলযাত্রা শেষে শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনপথে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। পরে শ্রীরূপগোস্বামীও বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা নিয়ে মথুরাতে সনাতন গোস্বামীর সাথে মিলিত হলে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হলেন। জগদানন্দ পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দ্বাদশবন ভ্রমণ করলেন। গোকুলে অবস্থানকালে সনাতন গোস্বামীর চেষ্টায় জগদানন্দ পণ্ডিত সেখানে অবস্থান করলেও উভয়ে আলাদাভাবে আহার করতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন– "সনাতন তখন মাধুকরী ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুকরো খেয়ে জীবন নির্বাহ করতে অভ্যাস করেছিলেন। ভাত না খেলে নিজের প্রতিদিন চলবে না বলে জগদানন্দ পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়ে পাক করতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হতো না।" একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতনকে প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। সনাতন গোস্বামী শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের অদ্ভুত চৈতন্য নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য নিজে 'মুকুন্দ সরস্বতী' নামে একজন সন্ন্যাসীপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র মস্তকে পরিধান করে জগদানন্দের নিকট পৌঁছলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত যখন জানলেন যে, তা মহাপ্রভুর প্রদত্ত নয়, তখন ভাতের হাঁড়ি নিয়ে সনাতনকে মারতে উদ্যত হলেন এবং বললেন–

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয়–ইহা পারে সহিবারে?

–চৈ.চ. অন্ত্য ১৩/৫৬-৫৭

শ্রীসনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের গৌরপ্রেমনিষ্ঠার প্রশংসা করে বললেন– "জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয়। আপনিই প্রকৃত সাধু। আপনার মতো প্রিয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর কেউ নয়। মহাপ্রভুর প্রতি এত নিষ্ঠা আপনারই যোগ্য। আপনি না দেখালে তা শিখবো কীভাবে। যে প্রেম দর্শন করার জন্য আমি এ বস্ত্র মস্তকে বেঁধেছি, সে অপূর্ব প্রেম আমি প্রত্যক্ষ করলাম।"

এভাবে ব্রজে দুইমাস থাকার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করতে না পেরে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুরী যাত্রা করলেন। বিদায়কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। মহাপ্রভুকে দেয়ার জন্য তিনি শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে করে ব্রজের রাসস্থলীর বালু, গোবর্ধন শিলা, শুষ্ক পাকা পীলুফল ও গুঞ্জামালা দিলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত পুরীতে পৌঁছে সনাতন গোস্বামীর প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু সহ ভক্তগণ বৃন্দাবনের পীলুফল পরম আদরের সাথে আস্বাদন করে তৃপ্ত হলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে দ্বাদশ-আদিত্য টীলায় মঠ স্থাপন নিশ্চিত করে সেখানে 'শ্রীরাধামদনমোহন' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ কথিত হয় যে, সুলতানের ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণদাস কাপুর শ্রীমদনমোহন মন্দির ও ভোগশালাদি নির্মাণ এবং নিত্য রাজসেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রিতও হয়েছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ-সনাতনের সাথে অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁদের প্রতিদিন সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাতেন।

গোকুল মহাবনে থাকাকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রমণরেতিতে অন্যান্য গোপবালকগণের সাথে ক্রীড়ায়ও মদনগোপালকে দর্শন করেছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর তা সুন্দররূপে বর্ণনা করেছেন।

গোবর্ধনের কৃপা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী যখন গোবর্ধনে ছিলেন তখন অযাচিতভাবে প্রতিদিন গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা করতেন। ক্রমশ বৃদ্ধ হলে তিনি গোবর্ধন পরিক্রমা করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর পরিশ্রম দেখে একদিন গোপীনাথ গোপবালকরূপে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বাতাস করে তাঁর শ্রম দূর করলেন। সেই গোপবালক গোবর্ধনে চড়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নাঙ্কিত শিলা এনে সনাতন গোস্বামীকে দিয়ে বললেন– "আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এত পরিশ্রম করেন কেন? এই গোবর্ধন শিলা দিচ্ছি, প্রতিদিন একে পরিক্রমা করলে আপনার গিরিরাজ পরিক্রমা হবে।" তারপর তিনি অন্তর্হিত হলেন। গোপবালককে দেখতে না পেয়ে সনাতন ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রসঙ্গটি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। এই স্থানটির নাম চক্রতীর্থ। মানসী গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেব (বা চলিত ভাষায় চাক্‌লেশ্বর মহাদেব) অবস্থিত। সেখানে সামনে একটি প্রাচীন নিমগাছ আছে। এই নিমগাছের নিচে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটির। তার উত্তরে একটি মন্দিরে গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্তি আছেন। বর্তমানে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত গোবর্ধন শিলা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে অবস্থান করছেন। এখনও সেখানকার মহিমা শোনা যায়।

সনাতন গোস্বামী যখন সেখানে ভজন করতেন, তখন প্রথমদিকে মশার খুব উপদ্রব ছিল। মশার উপদ্রবে হরিনাম করা এবং গ্রন্থ লেখার অত্যন্ত বিঘ্ন হওয়ায় সনাতন গোস্বামী অন্য কোথাও যাবেন বলে স্থির করলেন। সেদিন রাতে চক্রেশ্বর মহাদেব সনাতনকে স্বপ্নে বললেন, তাঁর কোনো চিন্তা নেই, তিনি নিরুপদ্রবে ভজন করুন, মশা আর থাকবে না। কী অদ্ভুত ঘটনা! পরদিন থেকে সেখানে কোনো মশা ছিল না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী নন্দগ্রামে পাবনসরোবরের তটে কুটিরে অবস্থান করে ভজন করেছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে সনাতন গোস্বামীকে কুটির নির্মাণ করে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানেই শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনকে পরমান্ন ভোজন করাতে ইচ্ছা করলে শ্রীমতি রাধারাণী গোপবালিকার বেশে পরমান্নের সামগ্রী-ঘৃত-দুগ্ধ-চাল-চিনি সব দিয়েছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী তা রন্ধন করে ভোগ দিয়ে সনাতন গোস্বামীকে প্রসাদ দিলে সনাতন গোস্বামী তা আস্বাদন করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। শ্রীরূপগোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী জিজ্ঞেস করলেন দ্রব্যগুলো কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীরূপগোস্বামী সব বৃত্তান্ত বললে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন যে, শ্রীমতি রাধারাণীকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাই তিনি এরূপ কার্য পুনরায় করতে নিষেধ করলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পরশমণি প্রদান

শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে আরেকটি কাহিনী রয়েছে– অত্যন্ত দরিদ্র এক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দারিদ্র্য-দুঃখে কষ্ট পেয়ে শিবের নিকট ধন প্রার্থনা করলেন। শিব তাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন যে, বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর কাছে ধন আছে, তাঁর কাছে গেলে ধন পাওয়া যাবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন এবং সনাতন গোস্বামীর নিকট পৌঁছলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর পরিধেয় মলিন বসন এবং কৃশ দেহ দেখে তার অন্তরে বিশ্বাস হলো না যে, তিনি ধন দিতে পারেন। তবুও স্বপ্নাদেশের কথা সনাতন গোস্বামীকে নিবেদন করলেন। সনাতন গোস্বামী তা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন– তিনি মাধুকরী ভিক্ষা করে কোনোমতে জীবন ধারণ করেন, কোথায় ধন পাবেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুঃখিত হয়ে ফিরে গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন– শিবের স্বপ্নাদেশও ভুল হলো! সনাতন গোস্বামী ভেবে বিস্মিত হলেন। শিব তাঁর নিকট এ ব্রাহ্মণকে কেন পাঠালেন? অনেক চিন্তার পর তাঁর একটি স্পর্শমণির কথা মনে পড়ল, যা ময়লা-আবর্জনার মধ্যে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠিয়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে আনলেন এবং আবর্জনার ভেতর থেকে স্পর্শমণিটি নিতে বললেন। স্পর্শমণি পেয়ে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মনে করলেন এখন তার মতো ধনী পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর আবার চিন্তা হলো– "এত বড় একটা মূল্যবান জিনিসের কথা সনাতন গোস্বামীর মনেই ছিল না! তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আরো মহামূল্যবান ধন আছে, আমি বোধহয় বঞ্চিত হয়েছি। তিনি কী ধনে ধনী হয়ে মূল্যবান মণিকে অগ্রাহ্য করলেন?" এরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণ আবার এসে সনাতন গোস্বামীর নিকট নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করে বললেন, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই আরো অনেক মূল্যবান ধন আছে, সেজন্য তিনি স্পর্শমণিকে অগ্রাহ্য করলেন। তখন সনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণপ্রেমধনের সর্বোত্তমতা এবং পার্থিব সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা ও দুঃখপ্রদত্ব বোঝালেন। ব্রাহ্মণ সনাতন গোস্বামীকে এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন– *"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তার এক কণা মাগি নত শিরে"*। সনাতন গোস্বামী তাকে কৃপা করে কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধদান

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিপ্রলম্ভ ভাবে ব্রজমণ্ডলের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করতেন। একসময় শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে নন্দগ্রামে পাবন সরোবরের দক্ষিণ তটে জঙ্গল মধ্যে ভজনাবেশে তিনদিন অনশনে ছিলেন। এ সম্পর্কে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বলা হয়েছে– তখন কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে এসে সনাতন গোস্বামীকে দুগ্ধ দান করে যান।

গোপবালকের কথায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী দুগ্ধ পান করলেন। দুগ্ধ পান করা মাত্রই প্রেমে অধৈর্য হলেন, তিনি নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করতে লাগলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন। ঘটনাটি শ্রীল সনাতন

গোস্বামী গোপন রাখতে চেষ্টা করলেও ব্রজবাসীগণ তা জানতে পারলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী দ্বারা পাবন সরোবরের তীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর জন্য একটি ভজন কুটির নির্মাণ করেন।

শ্রীমতি রাধারানীর দর্শন দান

একদিন শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীস্বরূপ ও শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। শ্রীরূপ তাঁকে বন্দনা করে বসার জন্য আসন প্রদান করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এ সময় 'চাটু পুষ্পাঞ্জলি' নামে একটি রাধা স্তব লিখেছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্তবটি পড়লেন। প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে–

নবগোরোচনাগৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্।
মণিস্তবক বিদ্যোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফনাম্ ॥

শ্লোকটি পড়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাবলেন 'ব্যালাঙ্গনা ফনাম' –শ্রীমতী রাধারাণীর বেনী সর্পিণীর ফণার সাথে তুলনা কি যুক্তিসঙ্গত?

মধ্যাহ্নকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাধাকুণ্ডে স্নান করতে লাগলেন। এমন সময় কুণ্ডতীর থেকে কিছুদূরে বৃক্ষতলে গোপকুমারীগণকে খেলা করতে দেখলেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাঁদের পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান লম্বিত বেনীগুলোতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সর্প ভ্রম হলো। তিনি তখন ব্যগ্র হয়ে গোপকুমারীগণকে সম্বোধন করে বললেন– "হে কুমারীগণ, সাবধান হও। তোমাদের পৃষ্ঠদেশে সর্প উঠছে।" কুমারীগণ মনের আনন্দে খেলায় রত ছিলেন। তারা কেউই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কথায় কর্ণপাত করলেন না। সনাতন গোস্বামী তখন গোপকুমারদের বাধা দেওয়ার জন্য ছুটলেন। শ্রীমতী রাধারাণী কুমারীগণ সহ হাসতে হাসতে অন্তর্ধান হলেন। অবাক হয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শ্রীরূপের উপমার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি স্থির হয়ে শ্রীরূপের কাছে ফিরে গেলেন এবং শ্রীরূপকে বললেন– "তুমি যা লিখেছ তা সম্পূর্ণরূপে সঠিক"।

পুরাতন শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরের পাশেই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ১৪৮০ শকাব্দ (১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধানলীলা করেন।
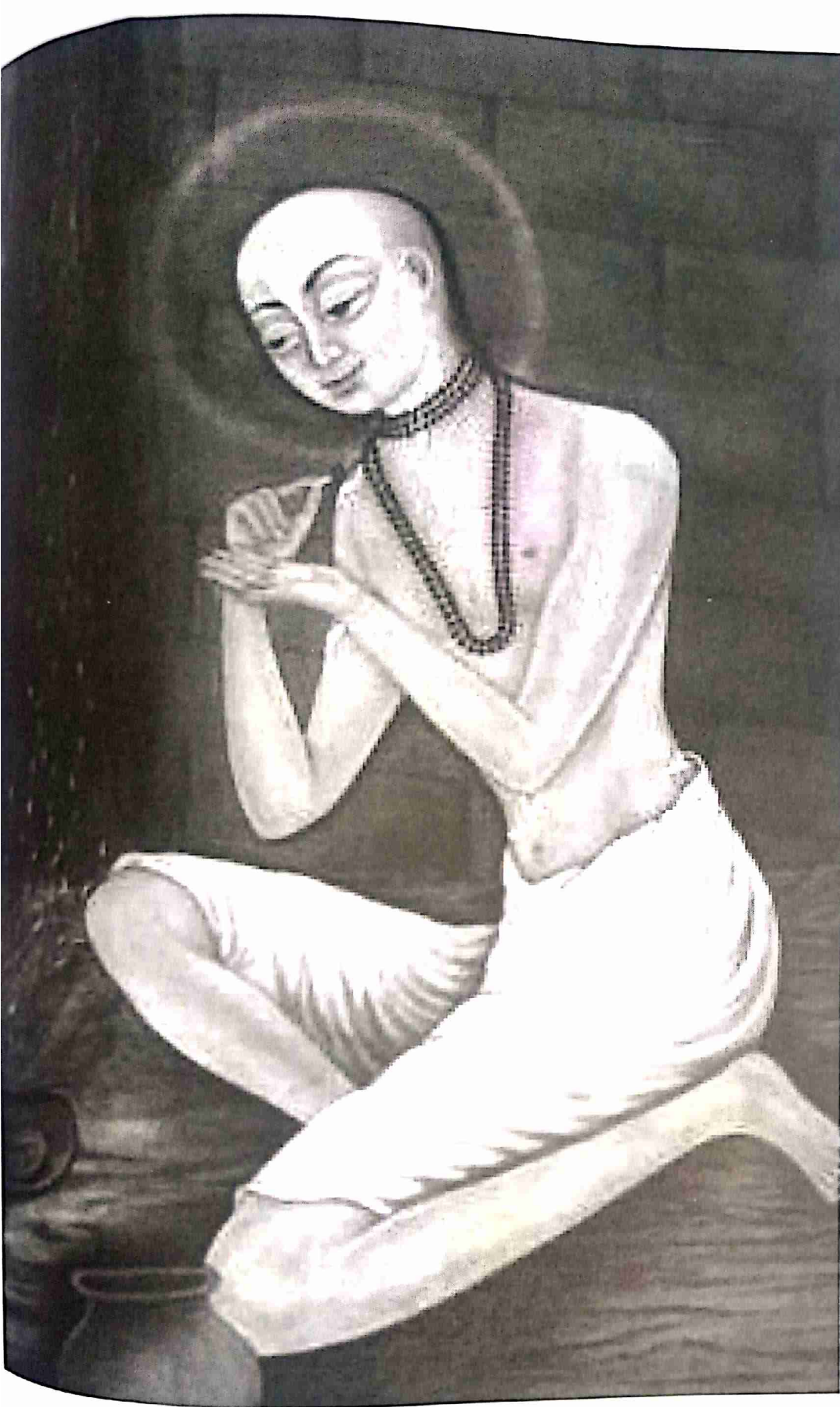
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

আবির্ভাব ও পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি রতিমঞ্জরী, শ্রীগৌরলীলায় তিনিই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় (১৮৬) বলা হয়েছে–

দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্ ॥
ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকা অনুসারে তাঁর জন্ম ১৪২৮ শকাব্দে। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম থেকে কিছুদূরে দক্ষিণদিকে প্রাচীন সরস্বতী নদীর পূর্বতীরে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আবির্ভূত হন। সপ্তগ্রাম থেকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রকটভূমি শ্রীকৃষ্ণপুরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশি এবং ত্রিশবিঘা রেলস্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। (সপ্তগ্রাম–পূর্বে সপ্তগ্রাম বলতে সাতটি গ্রামের সমষ্টি বোঝাত– সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্কনগর। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল বলে শোনা যায়।)

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা ছিলেন গোবর্ধন মজুমদার। মাতৃপরিচয় জানা যায়নি। শ্রীগোবর্ধন মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহিরণ্য মজুমদারের কোনো পুত্র ছিল না। শ্রীহিরণ্য মজুমদার ও শ্রীগোবর্ধন সপ্তগ্রামের অধিপতি ছিলেন। তখন সপ্তগ্রামের সীমা যশোরের ভৈরব নদ হতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর, শঙ্খনগরে শ্রীল রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত কালিদাসের, চাঁদপুরে শ্রীল রঘুনাথের কুলপুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্যের ও কুলগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্যের নিবাস ছিল। শ্রীযদুনন্দন আচার্য অদ্বৈতাচার্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অনুগৃহীত ছিলেন। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলরাম আচার্যের গৃহেই অবস্থান করতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলের জঙ্গলে রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাকে উদ্ধার করে বেনাপোল পরিত্যাগ করে চাঁদপুরে শ্রীবলরাম আচার্যের গৃহে অবস্থান করেছিলেন, সে সময় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বাল্যাবস্থায় হরিদাস ঠাকুরের দর্শনলাভের সুযোগ হয়েছিল। মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও কৃপাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভের কারণ হয়েছিল।

রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন। হরিদাস ঠাকুরেরে যাই করেন দর্শন ॥
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥
–চৈ.চ. অন্ত্য ৩/১৬৯

মহাপ্রভুর সাথে প্রথম মিলন

শৌক্র কায়স্থ-কুলোদ্ভূত শ্রীহিরণ্য ও শ্রীগোবর্ধন মজুমদারের বার্ষিক আয় ছিল আট লক্ষ মুদ্রা। শোনা যায় যে, তখন এক মুদ্রায় বা এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। সুতরাং, তৎকালীন এক টাকার বর্তমান মূল্য প্রায় কয়েক শত গুণ বেশি। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী উক্ত বিপুল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও বাল্যকাল থেকেই বিষয়ের প্রতি উদাসীন ও বিরক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন শান্তিপুরে এসেছিলেন, সে সময় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের প্রথম সৌভাগ্য হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করে তাঁর পাদপদ্মে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা শ্রীগোবর্ধন মজুমদার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সারাক্ষণ সেবা করতেন। পিতৃসম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্য প্রভুর রঘুনাথের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ছিল। যতদিন রঘুনাথ শান্তিপুরে ছিলেন, তিনি তাঁকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ দিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর থেকে নীলাচল যাত্রা করলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহে এসে মহাপ্রভুর বিরহে উন্মত্ত হয়ে পড়লেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দেখে তাঁর পিতা এগারোজন প্রহরীর (৫ পাইক, ৪ সেবক, ২ ব্রাহ্মণ) সাহায্যে তাঁকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখলেন। তবুও রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য গৃহ থেকে ছুটে পালাতেন এবং তাঁর পিতা প্রহরী পাঠিয়ে বারবার ধরে আনতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্বদা বিমর্ষচিত্তে অবস্থান করতেন। পুত্রের এ অবস্থা দেখে পিতা-মাতার মনে শান্তি নেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে কানাই নাটশালা থেকে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় শান্তিপুরে এসেছেন– এ সংবাদ পেয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য পিতার আদেশ প্রার্থনা করলেন। পুত্রকে ব্যাকুল দেখে পিতা চিন্তিত হয়ে অনেক লোক ও দ্রব্যসহ পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করলেন, কিন্তু শীঘ্র ফিরে আসতে বললেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী শান্তিপুরে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। মহাপ্রভুর নিকট নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন এবং কীভাবে সংসার বন্ধন হতে মুক্তি হবে তার জন্য প্রার্থনা জানালেন। সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর হৃদয়ের ভাব বুঝতে পারলেন, কিন্তু শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন–

স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

–*চৈ.চ. মধ্য ১৬/২৩৭-২৩৯*

"স্থির হয়ে ঘরে ফিরে যাও। এভাবে পাগলামি করো না। ক্রমে ক্রমে তুমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। লোকের কাছে বাহবা পাবার জন্য কপট বৈরাগ্যের অভিনয় করো না; অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করো। অন্তরে নিষ্ঠা করো, আর বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরেই কৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করবেন। আমি যখন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে আসব, তখন তুমি কোনো অছিলায় আমার কাছে এসো। আর কোন ছলে তুমি

আমার কাছে আসবে তা কৃষ্ণ তোমাকে জানিয়ে দিবেন। শ্রীকৃষ্ণ যাকে কৃপা করে তাঁকে কে বেঁধে রাখতে পারে?"

মুসলমান চৌধুরীর সাথে সমঝোতা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশক্রমে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৃহে ফিরে বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা পরিত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে বিষয়কার্যসমূহে নিয়োজিত হলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের চিহ্নসমূহ শিথিল দেখে সংসারপ্রবণ রাখার প্রয়োজনীতা অনুভব করলেন না।

সে সময় রাজা ও জমিদারের মধ্যবর্তী কোনো ব্যক্তি প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে তার এক চতুর্থাংশ রেখে বাকি খাজনা জমিদারকে দাখিল করতেন। তাকে 'চৌধুরী' বলা হতো (বর্তমানে একে নায়েব বলা হয়)। শ্রীহিরণ্য মজুমদার মাঝপথের মুসলমান চৌধুরীকে বাদ দিয়ে সপ্তগ্রাম মুলুকের কর আদায়কার্য স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করে নিলেন। হিরণ্য মজুমদার বিশ লক্ষ আদায় করে রাজাকে এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ বাদে পনের লক্ষ দাখিল করার পরিবর্তে বারো লক্ষ দেওয়ায় সেই মুসলমান চৌধুরী তার প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁদের বিরোধী হলো।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজগৃহে প্রত্যাগমন করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা স্মরণ করে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করলেন। অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব, বাইরে বিষয়ীর ন্যায় আচরণ করতে লাগলেন। যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী মথুরা হতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ফিরেছেন সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য উদ্যোগী হলেন, এমন সময় কর উত্তোলনকারী ম্লেচ্ছ চৌধুরী তার লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজঘরে হিরণ্য মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন এবং রাজবন্দী হওয়ার ভয়ে হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদার পালিয়ে গেলেন। উজীর এসে মুসলমান চৌধুরীর প্রেরণায় রঘুনাথকে বেঁধে ফেলল। রঘুনাথকে মুসলিম চৌধুরী গালাগালি দিতে ও ভয় দেখাতে লাগল এবং তার পিতা-জেঠা কোথায় জানাতে বলল। চৌধুরী ক্রুদ্ধ হয়ে যখন রঘুনাথকে প্রহার করতে যায়, তাঁর স্নিগ্ধ বদনকমল দর্শন করে আর প্রহার করতে পারে না, বাইরে তর্জন করলেও রঘুনাথকে শ্রেষ্ঠ কায়স্থকূলজাত বুদ্ধিমান জেনে ভেতরে সর্বদা সন্ত্রস্ত ছিল। কায়স্থগণ তাদের বুদ্ধিকৌশল দ্বারা কখন কী বিপদ নিয়ে আসে তার ঠিক নেই। মিষ্টিভাষী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বিপদ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করে পরম প্রীতির সাথে ম্লেচ্ছ চৌধুরীকে বলতে লাগলেন– "আমার পিতা-জেঠা তোমার দুই ভাই। ভাইয়ে-ভাইয়ে কখনো তোমরা ঝগড়া করো, আবার কখনো ভালবাসো, তোমাদের ভাব বোঝা কঠিন। আজ তোমরা ঝগড়া করছো, কাল আবার দেখবো তোমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছো। আমি যেমন আমার পিতার পুত্র, তেমনি তোমারও পুত্র। আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক। পালক হয়ে পাল্যকে তাড়ন করা উচিত নয়। তুমি সর্বশাস্ত্র বিশারদ জিন্দাপীর, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।" রঘুনাথের অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ কথা শুনে স্নেহার্দ্রচিত্তে সেই মুসলিম চৌধুরী কাঁদতে কাঁদতে বলল– "তুমি আজ হতে আমার পুত্র হলে। কোন সূত্র করে তোমাকে মুক্ত করব? তোমার জেঠার সাথে আমাকে মিলিয়ে দাও এবং আমার অংশ যাতে পাই তার ব্যবস্থা করো। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর

মধুর এবং কৌশলপূর্ণ ব্যবহারে পিতা-জেঠার সাথে ম্লেচ্ছের ঝগড়া শান্ত করে সকলকেই বশীভূত করলেন।

রঘুনাথের পলায়ন প্রচেষ্টা

এদিকে রঘুনাথের পিতা রঘুনাথকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য এক পরমা সুন্দরী কন্যার সাথে রঘুনাথের বিবাহ সম্পাদন করলেন। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য আবারও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি বারবার গৃহ থেকে পালিয়ে যান, আর তাঁর পিতা গিয়ে তাঁকে ধরে আনেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জননী দেবী পুত্রের আবারও মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখে রঘুনাথকে বেঁধে রাখার জন্য রঘুনাথের পিতাকে বললেন। শ্রীগোবর্ধন দাস তার উত্তরে বললেন–

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম। এসব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন।
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে? জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে। চৈতন্যচন্দ্রের 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/৩৯-৪১

চিড়া-দধি মহোৎসব

শ্রীরঘুনাথ দাস কী করে সংসার থেকে মুক্ত হবেন চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় সংবাদ এলো শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে শুভ বিজয় করেছেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হলে সংসার মুক্তি সম্ভব বিচার করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটিতে গেলেন। গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করে রঘুনাথ দূর থেকে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হয়ে জোরপূর্বক রঘুনাথকে আকর্ষণ করে তাঁর মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের প্রতি সদয় হয়ে বললেন– "তুই ঠিক চোরের মতো, আমার কাছে না এসে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াস। আজ আমি তোর নাগাল পেয়েছি, তাই আমি তোকে দণ্ড দিব। আজ তোকে আমার নিজজনদের চিড়া-দধি খাওয়াতে হবে।" এভাবে রঘুনাথের মনোভাব বুঝে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর পার্ষদ বৈষ্ণবগণের সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

'নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ দূরে দূরে। আজি লাগ্ পাইয়াছি, দণ্ডিমু, তোমারে॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে। শুনি আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/৫০-৫১

এ কথা শুনে রঘুনাথ দাস অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য সব কিনে আনার জন্য তাঁর লোকদের গ্রামে পাঠালেন। চিড়া, দধি, দুধ, সন্দেশ, চিনি, কলা, আদি সমস্ত দ্রব্য আনিয়ে সেগুলো তিনি চারদিকে রাখলেন। মহোৎসব হচ্ছে শুনে সকলেই সেখানে আসতে লাগল। এভাবে ক্রমে লোক বাড়তে থাকলে পাশের গ্রাম থেকে আরো সামগ্রী আসতে লাগল। নিত্যানন্দ প্রভু পিণ্ডার উপর বড় আসনে উপবেশন করলেন।

তারপর সবাইকে চিড়া-দধি পরিবেশন করা হলো। তখন নিত্যনন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে সেখানে আহ্বান করলেন। তিনি মহাপ্রভুকে নিয়ে সকলের চিড়া-দধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর পরস্পর পরস্পরকে চিড়া খাইয়ে দিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে সবাই দর্শন করতে পারেনি। যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তারাই কেবল তাঁকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপানির্দেশক্রমে পানিহাটিতে যে মহোৎসব করেছিলেন তা আজও 'পানিহাটি চিড়াদধি মহোৎসব' নামে খ্যাত। উক্ত মহোৎসবে স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁরই অভিন্ন প্রকাশমূর্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর পার্ষদগণসহ গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন জ্ঞানে ভোজনলীলা করেছেন। এমন সেবার সুযোগ লাভ করা কম সৌভাগ্যে হয় না।

গৃহ থেকে পলায়ন

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী পরদিন রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে অত্যন্ত কাতরভাবে নিবেদন করলেন যে, কী করে শীঘ্রই সংসারবন্ধন হতে মুক্তি এবং শ্রীচৈতন্য পাদপদ্ম লাভ হবে। কৃপার সমুদ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করে বললেন–

তুমি যে করাইলা এই পুলিন-ভোজন। তোমায় কৃপা করি গৌর কৈলা আগমন ॥
কৃপা করি কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন। নৃত্য দেখি রাত্রে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে। 'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন। অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/১৩৯-১৪৩

রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের সাথে পরামর্শ করে বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য দক্ষিণার দ্বারা পূজা করলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করে শ্রীরঘুনাথ কৃতার্থ হলেন। তিনি গৃহে ফিরে এসে আর গৃহের ভেতর প্রবেশ করলেন না, বাইরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করে রইলেন। প্রহরীরা সর্বদা জাগ্রত হয়ে রঘুনাথকে পাহারা দিতে লাগল। গৌরদেশের ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাচ্ছেন শুনেও শ্রীরঘুনাথ ধরা পড়ার ভয়ে যেতে পারলেন না। একদিন শেষ রাতে শ্রীযদুনন্দন আচার্য রঘুনাথের নিকট এসে বললেন যে, তাঁর শিষ্য সেবকটি ঠাকুরের সেবা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের বুঝিয়ে সেবায় নিয়োজিত করতে হবে, কারণ অন্য কোনো পূজারী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছে না। রঘুনাথ গুরুদেবের সঙ্গে চললেন, শেষরাতে প্রহরীরা সকলেই নিদ্রায় মগ্ন ছিল। অর্ধেক রাস্তা চলার পর রঘুনাথ গুরুদেবকে বললেন, তিনি নিজে বুঝিয়ে সেবককে পাঠিয়ে দিবেন তার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নেই। তারপর গুরুদেবকে ঘরে ফিরে যেতে নিবেদন করলেন। সেবক রক্ষক কেউ না থাকায় পালাবার সুবর্ণ সুযোগ বুঝে শ্রীল রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচরণ চিন্তা করতে করতে ধরা পড়বার ভয়ে সদর উপপথে পূর্বদিকে চললেন, এমনকি গ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে বনের পথে চলতে লাগলেন।

নীলাচল যাত্রা

তিনি একদিনে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করলেন। সন্ধ্যায় এক গোপের গোশালায় অবস্থান করলেন। তাঁকে উপবাসী দেখে গোপ তাঁর সেবার জন্য দুধ এনে দিল। পরদিন প্রাতে সেবক ও রক্ষকের নিকট গোবর্ধন মজুমদার রঘুনাথের পালিয়ে যাওয়ার বার্তা শুনে শিবানন্দ সেনের নামে চিঠি দিয়ে দশজন সেবককে পাঠালেন পুরী থেকে রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনার জন্য। পত্রবাহকগণ পুরীতে শিবানন্দের নিকট কোনো সংবাদ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলো। মহাপ্রভুর প্রেমে আত্মহারা হয়ে শ্রীরঘুনাথ অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলতে চলতে বারোদিনে পুরীতে এসে পৌঁছলেন; পথে তিন দিন মাত্র ভোজন করলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদরসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রীরঘুনাথ এসে দূর থেকে প্রণাম করলেন। শ্রী মুকুন্দ দত্ত রঘুনাথ প্রণাম করছে বলে মহাপ্রভুকে জানালেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে কাছে আসতে বললে রঘুনাথ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হলেন। মহাপ্রভু কৃপার্দ্রচিত্তে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন– "*কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সেবা হতে। তোমারে কাড়িল বিষয় গর্ত হৈতে ॥*" শ্রীরঘুনাথ তার উত্তরে মনে মনে বললেন– "*কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা এই আমি মানি ॥*" শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী রঘুনাথের পিতা ও জেঠাকে কায়স্থ ও বয়সে ছোট জেনে 'ভায়া' বলে ডাকতেন। রঘুনাথের পিতা-জেঠাও নীলাম্বর চক্রবর্তীকে ব্রাহ্মণ ও বয়সে বড় জেনে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন। এজন্য মহাপ্রভু রঘুনাথের পিতা-জেঠা মাতামহের ভাই এই বিচারে রহস্যচ্ছলে বললেন–

তোমার বাপ-জেঠা-বিষয়-বিষ্ঠা গর্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। 'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়' ॥
তথাপি বিষয়ের–স্বভাব করে মহা-অন্ধ। সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা। কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/১৯৭-২০০

শ্রীল প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন– "বিষয়ীদের ইন্দ্রিয়সুখ বাসনা এতই প্রবল যে, তারা তাদের এ জঘন্য ভোগ বাসনা ত্যাগ করতে পারে না; ঠিক যেমন বিষ্ঠার গর্তের কীট বিষ্ঠার আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, কেউ যখন জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়, তার অবস্থা ঠিক বিষ্ঠার কীটের মতো।"

রঘুনাথের বৈরাগ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে ক্ষীণ ও দুর্বল দেখে তাঁকে পুত্র ও ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করে স্বরূপ দামোদরকে তাঁর সকল প্রকার মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করলেন। বৈদ্য রঘুনাথ, ভট্ট রঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ তিন রঘুনাথের মধ্যে দাস রঘুনাথ 'স্বরূপের রঘু' নামে খ্যাত হলেন। ভক্তবৎসল শ্রীমন্মমহাপ্রভু রঘুনাথকে আদর-যত্ন করার জন্য সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ করলেন। রঘুনাথকে সমুদ্র স্নানের পর শ্রীজগন্নাথ দর্শন শেষে প্রসাদ ভোজনের

জন্য আদেশ করলেন। গোবিন্দ রঘুনাথকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদ দিলে রঘুনাথ আনন্দিত হলেন। রঘুনাথ পাঁচদিন স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকে মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। ষষ্ঠদিন থেকে এভাবে প্রসাদ গ্রহণ পরিত্যাগ করে রাতে শ্রীজগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি সেবা দেখে সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন। রাতে জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথের সেবা সম্পন্ন করে গৃহে ফেরার সময় সিংহদ্বারে অন্ন ভিক্ষার্থী কোনো বৈষ্ণব দেখলে তাঁকে প্রসাদ দিতেন। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ এভাবেই ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিশেষ করে মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে বৈরাগ্যের প্রাধান্য দেখা যায়।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্ ॥

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে যখন জানালেন যে, রঘুনাথ প্রসাদ সেবা না করে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছেন, তখন মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্যে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,

ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম আচরিল ॥
বৈরাগ্য করিবে সদা নাম-সংকীর্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/২২২-২২৭

"সে ভালো কাজ করেছে, বৈরাগীর ধর্ম পালন করেছে। বৈরাগী সর্বদা নাম-সংকীর্তন করবে এবং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবে। বৈরাগী হয়ে যে পরের উপর নির্ভর করে, তার কার্যসিদ্ধি হয় না এবং সে জিহ্বার রসের বশবর্তী হয়। বৈরাগীর কর্তব্য সর্বদা নাম সংকীর্তন করা, শাক, পাতা, ফল, মূল যা পাওয়া যায় তা-ই দিয়ে উদর ভরণ করা।"

মহাপ্রভুর কাছে উপদেশ প্রার্থনা

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীগোবিন্দের মাধ্যমে নিজ বক্তব্য মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করতেন। একদিন রঘুনাথ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উপদেশ শোনার জন্য স্বরূপ দামোদরের কাছে নিবেদন করলেন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে তা জানালে মহাপ্রভু রঘুনাথকে বললেন, যতটা তিনি জানেন তার চেয়ে অধিক জানেন স্বরূপ দামোদর, তাই তিনি সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বললেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উপদেশ শ্রবণ করার প্রতি শ্রীরঘুনাথের অত্যন্ত আগ্রহ দেখে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা হয় তা থেকে তিনি যেন এই উপদেশ গ্রহণ করেন–

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/২৩৬-২৩

রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীতে এলে শ্রীরঘুনাথ দাসের সাথে সকলের মিলন হয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কৃপা লাভ করে রঘুনাথ ধন্য হন। শিবানন্দ সেন রঘুনাথকে জানালেন যে, তাঁর পিতা তাঁর অন্বেষণের জন্য পুরীতে লোক পাঠিয়েছিলেন। চাতুর্মাস্য

শেষে ভক্তগণ গৌড়দেশে ফিরে এলে শিবানন্দ সেন রঘুনাথের পিতা গোবর্ধন মজুমদারকে রঘুনাথের সকল বৃত্তান্ত এবং তীব্র বৈরাগ্যের সাথে ভজনের কথা জানালেন। রঘুনাথের পিতামাতা তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে একজন ব্রাহ্মণ, দুইজন ভৃত্য ও চারশ মুদ্রা শিবানন্দ সেনের মাধ্যমে পুরীতে পাঠালেন। শিবানন্দ সেন নীলাচলে পৌঁছে রঘুনাথকে জানালেন যে, তাঁর সেবার জন্য তার পিতা ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও মুদ্রা পাঠিয়েছেন তা জানালেন। রঘুনাথ তা গ্রহণ করলেন না। সেই ভৃত্য এবং ব্রাহ্মণ সমস্ত দ্রব্য নিয়ে সেখানেই রইলেন। তখন রঘুনাথ মাসে দুদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে অনেক যত্ন সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করাতেন। নিমন্ত্রণ করতে যে আট আনা লাগত, তিনি কেবল তা-ই ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যের কাছে গ্রহণ করতেন। এভাবে দুবছর ধরে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করার পর তিনি নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করে দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, রঘুনাথ কেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করছেন না। স্বরূপ দামোদর বললেন, রঘুনাথ এমন মনে মনে বিচার করেছে যে, তাঁর পিতা বিষয়ী, তাঁর দ্রব্যের দ্বারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে নিমন্ত্রণকারী মূর্খতাবশতঃ দুঃখ পাবে, শুধু এই ভেবে মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন, অন্তঃকরণে আনন্দ অনুভব করেননি। মহাপ্রভু তা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন–

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ। দাতা, ভোক্তা– দুঁহার মলিন হয় মন ॥
ইঁহার সংকোচে আমি এতদিন নিল। ভাল হৈল– জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/২৭৮-২৮০

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, "অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত সহজিয়ারা বিষয়ী। তাদের নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করলে অন্তর কলুষিত হয় এবং তাঁর ফলে নিষ্ঠাবান ভক্তরাও তাদের মতো স্বভাব লাভ করে। সঙ্গ ছয় প্রকার– দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন ও ভোজনে প্রবর্তন, গূঢ় কথা বর্ণন ও জিজ্ঞেস। 'অবৈষ্ণব' ও প্রাকৃত সঙ্গে বিন্দুমাত্র সঙ্গ করা উচিত নয়। তাদের সঙ্গ করলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে পরিণত হয় এবং ভক্তের হৃদয়ে বাসনার উদয় হলে সে কলুষিত হয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত বিষয়ী যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে পারে না।"

বিষয়ীর রাজস নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন– "নিমন্ত্রণ তিন প্রকার–সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ– সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবান ব্যক্তির অন্ন– রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন– তামস।

ভজন ও বৈরাগ্য

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যেও তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি সিংহদ্বারে ভিক্ষা ছেড়ে ছত্রে মেগে খেতে লাগলেন। গোবিন্দের নিকট এ কথা শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। স্বরূপ দামোদর বললেন, সিংহদ্বারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করে দুপুর বেলা ছত্রে গিয়ে মেগে খাচ্ছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে মেগে খাওয়ার প্রশংসা

করে বললেন যে, *'সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার'* এমন বললেন। বেশ্যা যেমন পুরুষের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করে, বৈরাগীর পক্ষে সেভাবে ভিক্ষার জন্য প্রতীক্ষা দ্বারা তাঁর নিরপেক্ষতার হানি হয়। ছত্রে ভিক্ষাতে সেই অসুবিধা নেই, যথাসময়ে গেলে জীবিকা নির্বাহের উপযোগী ভিক্ষা পাওয়া যায়। এতে সর্বদা কৃষ্ণ কীর্তনের সুবিধা পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনের শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গুঞ্জামালা ও গোবর্ধন-শিলা দিয়েছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুঞ্জামালাকে সাক্ষাৎ রাধারাণী এবং গোবর্ধন-শিলাকে কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে সমাদর করতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্ধন শিলাকে হৃদয়ে, নেত্রে, মস্তকে ধারণ করে পরমানন্দ লাভ করলেন। তিনি তিন বছর উক্ত শিলা ও গুঞ্জা মালার সেবা করে পরে প্রসন্ন হয়ে রঘুনাথকে সমর্পণ করলেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত গুঞ্জামালা ও গোবর্ধন শিলা প্রাপ্ত হয়ে সাক্ষাৎ গান্ধর্বগিরিধারীজ্ঞানে জল-তুলসী দ্বারা পরম প্রীতিভরে পূজা বিধান করে প্রেমানন্দে নিমগ্ন হলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীগোবর্ধন শিলা শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দ মন্দিরে সেবিত হতে থাকেন এবং তা আজও বর্তমান। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা।

প্রতিদিন ২২ ঘণ্টার অধিক সময় তিনি 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করে অতিবাহিত করতেন; দিনের মধ্যে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় তিনি আহার এবং নিদ্রায় অতিবাহিত করতেন এবং কোনো দিন তাও হতো না। তাঁর বৈরাগ্য ছিল অদ্ভুত– তিনি আজন্ম তাঁর জিহ্বাকে রস আস্বাদন করতে দেননি। তিনি কেবল প্রাণ ধারণের জন্যই আহার করতেন এবং আহার করার পর তিনি আক্ষেপ করতেন। যে সমস্ত পূজারি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ বিক্রি করতেন, প্রসাদ দুই তিনদিনের বাসি হয়ে পঁচতে শুরু করলে সেই পঁচা প্রসাদান্ন তারা সিংহদ্বারের গাভীদের দিতেন। কিন্তু পঁচাগন্ধে তৈলঙ্গী গাভীরাও তা খেত না। রাতে সেই পঁচা অন্নগুলো ঘরে এনে জল দিয়ে ধুয়ে তার ভেতরে অসিদ্ধ চাউলের কঠিন অংশ 'দড়ভাতমাজি' লবণ দিয়ে গ্রহণ করতেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর রঘুনাথকে একদিন এমন করতে দেখে একে অমৃতসমজ্ঞানে পরমানন্দে মেগে খেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গোবিন্দের কাছ থেকে তা শুনে রঘুনাথের নিকট গিয়ে এর একগ্রাস গ্রহণ করলেন, দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করতে গেলে স্বরূপ দামোদর বাধা দিলেন।

খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ কেনে? এত বলি একগ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা। 'তব যোগ্য নহে' বলি কাড়ি নিলা ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৬/৩২২-৩২৩

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর স্বরচিত স্তবাবলী– চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ স্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা এমনভাবে বর্ণন করেছেন–

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপায়া।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় ইদয়ন্মাং মদয়তি ॥

অর্থাৎ "আমি মহাকুজন হলেও কৃপাপূর্বক যিনি আমাকে পতিত দেখে সম্পৎ ও দারা

(পাঠান্তরে বিষয়কূপ) হতে উদ্ধার করে শ্রীস্বরূপে অর্পণ করে আনন্দ লাভ করেছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্ধন শিলা দান করেছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে মত্ত করছেন।”

বৃন্দাবন বাস

শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্যে থেকে পুরুষোত্তম ধামে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গসেবা করেছিলেন। ষোল বছর পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদর অপ্রকট হলে তিনি বিরহকাতর হয়ে গোবর্ধন পর্বত হতে পতিত হয়ে দেহত্যাগ করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। বৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে অনেক প্রবোধ দিয়ে দেহত্যাগ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করে তৃতীয় ভাইরূপে তাঁদের কাছে রাখলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলাকথা নিরন্তর শ্রবণ করে শ্রীরূপ-সনাতন পরমানন্দ লাভ করতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণের বিরহে অন্নজল ত্যাগ করলেন। তিনি কেবল অল্পমাত্রায় মাঠা সেবন করতেন। প্রত্যহ সহস্র দণ্ডবৎ, লক্ষ হরিনাম, রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা, মহাপ্রভুর চরিতকথন, ত্রিসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান, এভাবে নিরন্তন রাধাকৃষ্ণের ভজনে তিনি সাড়ে সাত প্রহর অতিবাহিত করতেন; কোনোদিন চার দণ্ড নিদ্রা, কোনোদিন তা-ও হতো না।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দীর্ঘদিন প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু বৃন্দাবন থেকে গ্রন্থাদি নিয়ে বঙ্গদেশে আসার পূর্বেই দাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করেছিলেন। শ্রীল দাস গোস্বামীর তীব্র বৈরাগ্য ও অদ্ভুত প্রেমাবিষ্ট অবস্থা দেখে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু বিস্মিত হয়েছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনটি গ্রন্থ– স্তবাবলী, দানকেলিচিন্তামণি ও মুক্তাচরিত রচনা করেন।

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কার

রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধাকুণ্ডে অবস্থান করে তীব্র ভজন করেছিলেন। তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবীর কৃপা লাভ করেছিলেন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু আরিটগ্রামে ধান্যক্ষেত্রে স্নানলীলা দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ করেছিলেন, তখন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সংস্কার ও পাকাঘাট ছিল না। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করলেন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সংস্কার হলে ভালো হতো। আবার পরক্ষণেই নিজেকে আকাঙ্ক্ষার জন্য ধিক্কার দিলেন। এদিকে কোনো এক ধনী শেঠ বদ্রীনারায়ণকে বহু অর্থ ভেটের জন্য বদ্রীনারায়ণে গিয়েছিলেন। বদ্রীনারায়ণ শেঠকে মথুরায় আরিট গ্রামে শ্রীদাস গোস্বামীর ইচ্ছানুসারে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সংস্কারের জন্য অর্থ দিতে স্বপ্নাদেশ করলেন। শেঠজি আদেশ পেয়ে আরিট গ্রামে এসে দাস গোস্বামীকে সব কথা নিবেদন করলেন। দাস গোস্বামীর ইচ্ছানুসারে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার যথারীতি সংস্কার হয়। শ্যামকুণ্ডতীরে পঞ্চপাণ্ডব

পঞ্চবৃক্ষরূপে অবস্থান করছেন। কুণ্ডটি সমকোণী করার জন্য বৃক্ষগুলোকে কাটার সঙ্কল্প হলে যুধিষ্ঠির মহারাজ স্বপ্নে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পঞ্চপাণ্ডবের সেখানে বৃক্ষরূপে অবস্থানের কথা জানালেন। তখন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃক্ষ কাঁটতে নিষেধ করলেন। সেজন্য শ্যামকুণ্ড সমকোণী অর্থাৎ চৌরস হয়নি।

রাধাকুণ্ডের তীরে বিরহদশা

একবার শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরূপগোস্বামী রচিত 'ললিতমাধব' নাটক পাঠ করে বিরহসাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। রাধাকুণ্ডে শ্রীরাধারাণীর নিত্যসান্নিধ্যে থেকেও ক্ষণকালের বিরহও সহ্য করতে পারতেন না, অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়তেন। তাছাড়া বিপ্রলম্ভ রসযুক্ত ললিতমাধব গ্রন্থপাঠে তাঁর বিরহজ্বালা এত বৃদ্ধি পেলো যে, প্রাণ রক্ষা করাই কঠিন হলো। শ্রীরূপগোস্বামী দাস গোস্বামীর এমন অবস্থা দেখে হাস্যরসাত্মক নিত্যসম্ভোগবহুল 'দানকেলী কৌমুদী' গ্রন্থ তাঁর নিকট পাঠিয়ে ললিতমাধব গ্রন্থ ফিরিয়ে আনলেন। দানকেলী কৌমুদী পাঠ করে রঘুনাথের বিরহজ্বালা দূরীভুত হলো।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রথমদিকে রাধাকুণ্ডের তীরে ভজন করতেন। তিনি মানসগঙ্গার তীরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটিরেও কখনো কখনো যেতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী একদিন মানসগঙ্গায় স্নান করে চতুর্দিকে জঙ্গলপূর্ণ একটি বৃক্ষতলে বসে প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভজন করছিলেন। সে সময় একটি বাঘ এসে জলপান করে চলে গেল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাস গোস্বামীর এমন নির্বিকার অবস্থা দেখে কুটিরে অবস্থান করে ভজন করতে বললেন। তারপর থেকে তিনি কুটিরে বসে ভজন করতেন।

'দাস' নামে একজন ব্রজবাসীর প্রতি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিদিন এক দোনা মাত্র মাঠা পান করতেন। এতে সেই ব্রজবাসীর খুব দুঃখ হতো। তিনি ভাবতেন– এক দোনা মাঠায় কী করে জীবন রক্ষা হবে। একদিন তিনি সখীস্থলীতে গিয়ে বড় বড় পলাশপাতা দেখতে পেলেন। এই পলাশপাতা দিয়ে বড় দোনা তৈরি করে রঘুনাথের সেবায় বেশি করে মাঠা দিবেন এমন চিন্তা করে এক দোনা মাঠা নিয়ে রঘুনাথকে দিলেন। শ্রীল রঘুনাথ এত বড় দোনা দেখে বিস্মিত হলেন। কোথায় পাওয়া গেছে জিজ্ঞেস করলে ব্রজবাসী সখীস্থলীর কথা বললেন। সখীস্থলীর নাম শুনেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দোনা দূরে নিক্ষেপ করলেন। সখীস্থলী চন্দ্রাবলীর স্থান, রাধারাণীর প্রতিপক্ষ। চন্দ্রাবলীর গণ, অর্থাৎ প্রধানা শৈব্যা সর্বদাই চেষ্টা করেন রাধারাণীর কুঞ্জ থেকে কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিয়ে যাবার জন্য। এতে রাধারাণীর দুঃখে রাধারাণীর গণেরও দুঃখ হয়। রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাধারাণীর গণের অনুগত হওয়ায় সর্বদা প্রেমময় ভূমিকায় রাধারাণীর ও তাঁর গণের সুখচেষ্টায় নিমগ্ন থাকেন। সখীস্থলীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের যে ক্রোধের উদ্রেক হলো তা প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থার ভাব, যা কামাতুর মাৎসর্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ বুঝতে অসমর্থ। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–

কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাস প্রতি। সে চন্দ্রাবলীর স্থান– না যাইবা তথি ॥
ইহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া। জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধ-ক্রিয়া ॥
এ-সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়। ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয় ॥

–ভক্তিরত্নাকর ৫/৫৭২-৫৭৪

শ্রীভক্তিরত্নাকর-এ এমন আরো একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণিত আছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী একদিন অসুস্থ হলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য শ্রীবল্লভপুরের শ্রীবিট্‌ঠলনাথ নামে এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে দুজন চিকিৎসক আনালেন। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন– দুধভাত গ্রহণ করার ফলে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়েছে। শ্রীবিট্‌ঠলনাথ চিকিৎসকের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন– তা কী করে সম্ভব! তিনি কখনো মাঠা ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। তখন রঘুনাথ সন্দেহ নিরসন করে বললেন যে, তিনি মানসে দুধভাত ভোজন করেছিলেন।

অন্তর্ধান

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অপ্রকট হয়েছিলেন। রাধাকুণ্ড তটে রঘুনাথ দাস গোস্বামী অন্তর্ধানলীলা করেন। সেখানে তাঁর সমাধিমন্দির বিরাজিত।
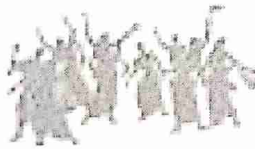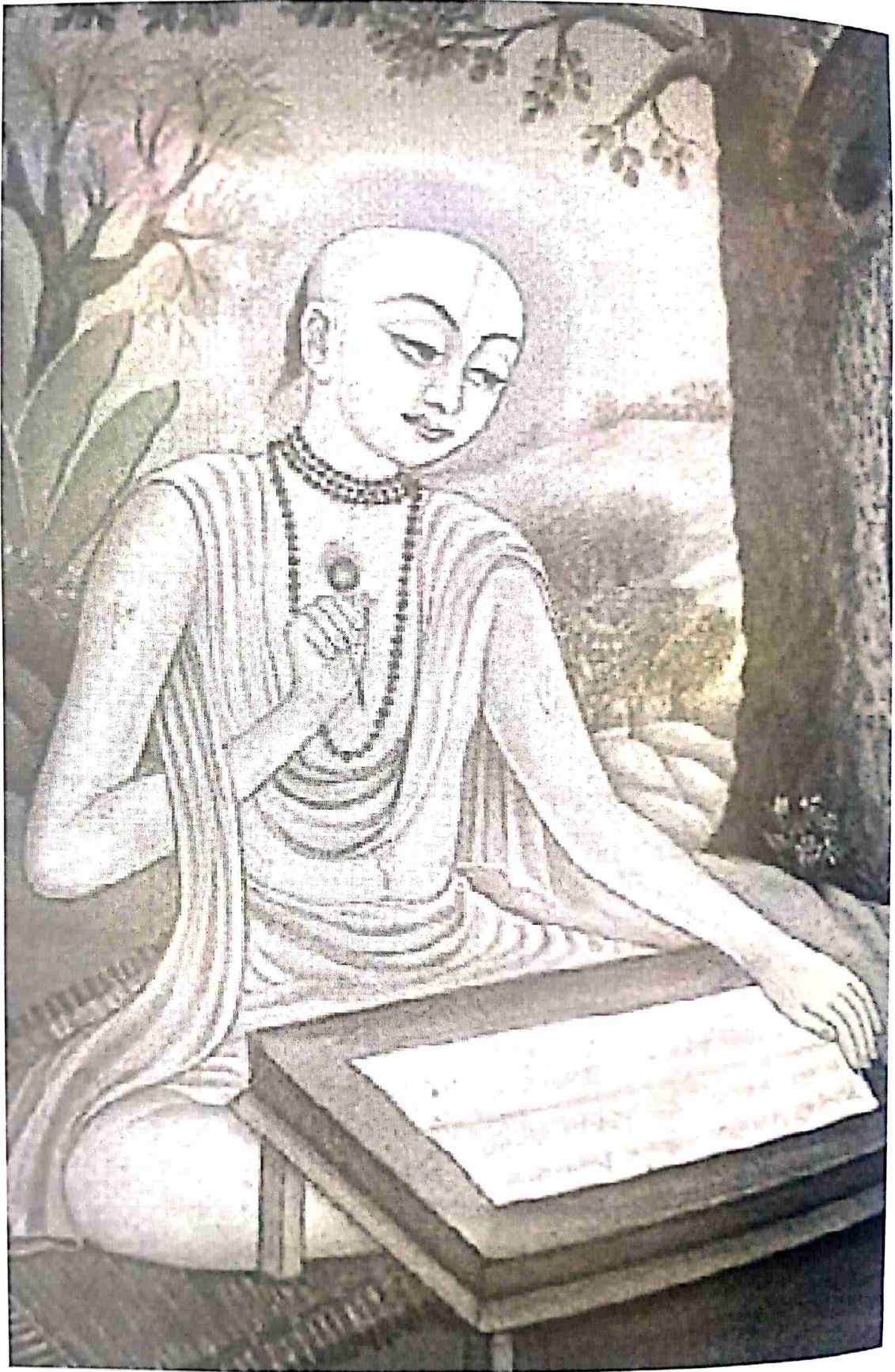
শ্রীল জীব গোস্বামী

শ্রীল জীব গোস্বামী

আবির্ভাব ও পরিচয়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের সাহিত্য-সম্রাট শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় লিখেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি বিলাসমঞ্জরী, গৌরলীলায় উপশাখারূপে তিনিই শ্রীল জীব গোস্বামীরূপে লীলা করেছেন। তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণী পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে রামকেলি গ্রামের মালদহে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীবল্লভ (অনুপম)– এ তিন ভাইয়ের মধ্যে শ্রীঅনুপমের একমাত্র পুত্র হলেন শ্রীল জীব গোস্বামী। 'লঘুবৈষ্ণবতোষণী' গ্রন্থে তিনি নিজেই তাঁর বংশ পরিচয় উল্লেখ করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের জীবনীতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। রূপ-সনাতনের মতো অনুপম মল্লিকও হোসেন শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখেছেন– শ্রীজীব গোস্বামীর পিতার নাম শ্রীবল্লভ (মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম অনুপম)। *'অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম–'শ্রীবল্লভ'। শ্রীরূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই,–পরম-বৈষ্ণব।'*

মহাপ্রভুর দর্শন লাভ ও গৃহ ত্যাগ

অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গৌড়ে রূপ, সনাতন ও অনুপমের সাথেই থাকতেন। তাঁদের তিনজনের মহৈশ্বর্যময় সংসারে শ্রীজীব একমাত্র পুত্র। বালকের দিব্য গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে তাঁদের ঐশ্বর্যময় গৃহ আলোকে উদ্ভাসিত হতো। গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুভাগমন হলে শ্রীজীব গোস্বামীর স্বীয় ইষ্টদেব দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়। তখন মহাপ্রভু শ্রীজীবগোস্বামীকে তাঁর শ্রীচরণ রজ দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা ধারার আচার্যরূপে অভিষিক্ত করেন। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি মহাপ্রভুর অপূর্ব ভুবনমোহন রূপ তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। তাঁর গমন, ভোজন, শয়ন, জাগরণে সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে মহাপ্রভুর স্মৃতি জাগরিত হতো।

শ্রীরূপ ও অনুপম প্রয়াগে মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পর কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করার পর গৌড়দেশ হয়ে নীলাচলে যাত্রা করার পরিকল্পনা করলেন। গৌড়দেশে আসার পর অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হয়। তারপর রূপ গোস্বামী কিছুদিন গৃহে অবস্থান করার পর নীলাচল গমন করেন।

পিতা অনুপমের অন্তর্ধানে শ্রীজীব গোস্বামী অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠলেন। সংসার তাঁর কাছে অত্যন্ত বিষময় হয়ে উঠল। ভাবতে লাগলেন বিষময় সংসার ত্যাগ করে কবে তিনি একান্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করতে পারবেন। তাঁর বৈরাগ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি মহাপ্রভুর বিরহে ক্রন্দন করতে করতে নিদ্রার আবেশ হলে স্বপ্নে সপার্ষদ মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন।

বাল্যকালে তিনি কৃষ্ণ বলরামের বিভিন্ন লীলা অনুসরণে খেলা করতেন। কৃষ্ণ-বলরাম একদিন স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে শ্রীজীবকে দর্শন দান করলেন। তারপর তিনি আবার উভয়কে গৌর-নিত্যানন্দ রূপে দর্শন করলেন। দর্শনের পর প্রণাম করতে গেলে গৌর-নিত্যানন্দ অদৃশ্য হলেন। গৌর-নিত্যানন্দকে দর্শন করতে না পেরে জীব গোস্বামী অস্থির হয়ে পড়লেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে নবদ্বীপ ধাম দর্শন

তারপর রাত্রিশেষে নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি গৃহত্যাগ করে মায়াপুর-নবদ্বীপে যাত্রা করেন। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ থেকে এসে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণসহ প্রেমানন্দে অবস্থান করছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু হেসে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন– "আমার মনে হয় আজ শ্রীরূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব আগমন করবে।" তখনই শ্রীজীবের আগমন সংবাদ এক বৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানালেন। শ্রীজীব গোস্বামী তখন শ্রীবাসের গৃহের দ্বারে অবস্থান করছিলেন।

শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা। শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোক দ্বারে আনাইলা ॥
শ্রীজীব অধৈর্য হৈলা প্রভুর দর্শনে। নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥
করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায়। লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ পায় ॥

তারপর নিত্যানন্দ প্রভু বাৎসল্যে বিহ্বল হয়ে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা শ্রীজীবকে স্থির করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তদের দ্বারা অনুগ্রহ করিয়ে কয়েকদিন শ্রীজীবকে তাঁর কাছে রাখলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবের কাছে নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি তাঁকে জগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভক্তগণ বসে মহাপ্রভুর গুণগাথা কীর্তন করছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী দেখলেন বৃদ্ধা শচীমাতা গৌরসুন্দরের চিন্তায় অশ্রুমুদিত অবস্থায় বারান্দায় বসে আছে। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে শচীমাতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে শচীমাতা তাঁদের ভোজন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীজীব গোস্বামীর নবদ্বীপের নয়টি ধাম পরিক্রমা হলো। পরিক্রমা শেষে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীবকে বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

নিত্যানন্দের কাছে শ্রীজীবের প্রশ্ন

তখন শ্রীজীব গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর সংশয় ছেদনের জন্য জিজ্ঞেস করলেন– "প্রভু এই নবদ্বীপ ধামই তো বৃন্দাবন। তবে আবার এত যত্ন করে যাওয়ার কী প্রয়োজন? নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে বললেন– "মহাপ্রভুর প্রকটলীলা যতদিন থাকে ভগবৎ বহির্মুখ-জন তা জানতে পারে না। নবদ্বীপ-বৃন্দাবন একই তত্ত্ব, কিছুমাত্র ভেদ নেই। বৃন্দাবন ধাম রসের আধার এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা সর্বরসসার হলেও তাতে সবার অধিকার লাভ হয় না। কিন্তু বৃন্দাবন অভিন্ন এ নবদ্বীপ ধামে জীবের সে অধিকার লাভ হয়। তাই ব্রজে গিয়েও সকলে সে রস পায় না বরং অপরাধের কারণে রস বিরসে পরিণত হয়।

নিজের চেষ্টায় ব্রজের রস লাভ করা যায় না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কৃপা হলেই কেবল ব্রজের রস উদিত হবে। রাধাকৃষ্ণই একস্বরূপে শ্রীনবদ্বীপ ধামে গৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এ রসের অধিকার জীবকে প্রদান করেন। নবদ্বীপ ধামে অপরাধ স্থান পায় না। এখানে নামাশ্রয় করলে অপরাধ ক্ষয় হয় এবং যুগল রসের পীঠ বৃন্দাবন প্রাপ্তির অধিকার লাভ হয়।

এই গোপনীয় তত্ত্ব যাকে তাকে যেখানে সেখানে প্রকাশ করবে না। ব্রজরস লাভ করার জন্য নবদ্বীপ ধাম আশ্রয় করা কর্তব্য। তুমি ব্রজরসের অধিকারী, অতএব ব্রজে গমন করো।”

তারপর শ্রীজীব গোস্বামী আরেকটি প্রশ্ন করলেন– “এ নবদ্বীপে বহু লোক বাস করে কিন্তু তারা কেন কৃষ্ণভক্তি পায় না। ধামে বাস করার পরও কেন অপরাধ হয়?

নিত্যানন্দ প্রভু উত্তরে বললেন– “এ ধাম চিন্ময়, ধামে কখনো জড় বস্তু প্রবেশ করতে পারে না। ধামের উপর জড়মায়া জাল পেতে চিরকাল তাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে যাদের সম্বন্ধ নেই তারা চিরকাল এ জালের উপরই থাকবে।

মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপ পুরে। প্রৌঢ়মায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে ॥
যদি কোনো ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়। তবে কৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধ আসে তায় ॥

মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে জীব ধামে থাকা সত্ত্বেও ধাম উপলব্ধি করতে পারে না। তবে যদি কোনো জীব সাধুসঙ্গ পায়, তবে তার কৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধ স্থাপন হয়, তখন সে ধামের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে।” এভাবে শ্রীজীবের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, “শ্রীরূপ সনাতন তোমাকে এ তত্ত্ব আরো গভীরভাবে ব্যক্ত করবেন। মহাপ্রভু তোমাকে ব্রজে বাস করার অধিকার দিয়েছে, তুমি শীঘ্র ব্রজে গমন করো।”

বৃন্দাবন যাত্রা

তারপর শ্রীল জীব গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে তিনি শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্য) কাছে মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যে বেদান্ত বর্ণনা করেছিলেন তা শ্রবণ করলেন। কাশীতে কিছুদিন অধ্যয়নের পর শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর চরণ দর্শন করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে নিজের কাছে রেখে ভাগবত অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি শ্রীজীব একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নিবিষ্ট হতেন। তারপর তিনি শ্রীশ্রী রাধাদামোদরের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তিনি নিয়মিত শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সেবা করতেন; তাদের স্নানের জল আনতেন, মাথায় তেল মর্দন করে দিতেন।

বল্লভ ভট্ট বিজয়

একদিন গ্রীষ্মকালে শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে নির্জনে গ্রন্থ লেখার সময় ঘর্মাক্ত কলেবর হলে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ব্যজন করছিলেন। তখন বল্লভ ভট্ট সেখানে এসে রূপ গোস্বামীর সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁকে বললেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সংশোধন করে দেবেন। তারপর বল্লভ ভট্ট যমুনায় স্নান করতে গেলেন। বল্লভ ভট্টের এমন গর্বিত বচন শুনে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী সহ্য করতে না পেরে জল আনার ছলে তিনিও যমুনায় গেলেন এবং বল্লভ ভট্টকে শ্রীরূপ গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ লেখায় কোথায় ভুল আছে জিজ্ঞেস করলেন। বল্লভ ভট্ট সে বিষয়ে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করলে শ্রীজীব গোস্বামী শাস্ত্রবিচার করে তাঁর প্রতিটি বাক্য খণ্ডন করলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীজীব গোস্বামীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখে আশ্চর্য হলেন এবং সমস্ত কথা রূপগোস্বামীকে এসে বললেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সেজন্য শ্রীজীব গোস্বামীকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন।

একসময় সম্রাট আকবরের অধীনস্থ গঙ্গাতীরবর্তী ও রাজপুতনাবাসী সমস্ত রাজাগণের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এক বিতর্ক ওঠে। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য সম্রাট আকবর শ্রীল জীব গোস্বামীপাদকে আহ্বান করেন। শ্রীজীব গোস্বামী জানান যে, তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও রাত্রি যাপন করবেন না। রাজাগণ ঘোড়ার ডাক বসিয়ে আগ্রা হতে একদিনের মধ্যেই বৃন্দাবন যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন শ্রীজীব গোস্বামীপাদ সিদ্ধান্ত দেন, শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুর চরণ থেকে এসেছে অর্থাৎ গঙ্গা বিষ্ণুর চরণামৃত এবং বিষ্ণুশক্তি বটে। কিন্তু যমুনাদেবী কৃষ্ণপ্রেয়সী। সুতরাং রস তারতম্যে শ্রীযমুনাদেবী গঙ্গাদেবী হতে শ্রেষ্ঠা। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের এ বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হন।

সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকে কিছু উপঢৌকন গ্রহণ করার জন্য নিবেদন করলে শ্রীজীব গোস্বামী তা না নিয়ে কেবল বারানসি হতে গ্রন্থ লেখার জন্য কাগজ চাইলেন। তিনিই প্রথম আগ্রা হতে তুরট কাগজ এনে গ্রন্থ লেখার কার্য আরম্ভ করেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপচন্দ্র বিজয়

রূপচন্দ্র নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বহুদেশ ভ্রমণ করে ব্রজে শ্রীল রূপ-সনাতনের কাছে জয়পত্র লাভের জন্য গর্বভরে বিচার করতে আসেন। কৃষ্ণভজনে নিমগ্ন শ্রীল রূপ-সনাতন পাদদ্বয় বিনা তর্কে পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখে দেন। রূপচন্দ্র শ্রীল রূপ-সনাতনের নিন্দা করতে করতে শ্রীজীবের কাছে গেলে শ্রীজীব গোস্বামী তাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার মনস্থ করেন। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে গৌড়ীয় দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রমাণের দ্বারা পরাজিত করেন।

এ ঘটনা শুনে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ অন্তরে সন্তুষ্ট হলেও বাইরে রেগে গিয়ে শ্রীজীবকে কঠোর বাক্য প্রয়োগের দ্বারা উপেক্ষা করলেন। "তুমি ভজনের জন্য বৃন্দাবনে এসেছ, কিন্তু এখানে এসে তুমি প্রতিষ্ঠার বশ হয়ে গিয়েছ। রূপ গোস্বামীর ভর্ৎসনা শুনে শ্রীজীব যমুনার তীরে মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন করে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। গুরুদেব কর্তৃক বর্জিত হয়ে কাউকে মুখ দেখাবেন না বলে নির্জন বনে প্রবেশ করে অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন।

বনে বসে তিনি 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থ লিখলেন। তারপর একবার সনাতন গোস্বামী সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় শ্রীজীবের সাথে দেখা হলো। জীব সনাতন গোস্বামীর চরণে পড়লে সনাতন গোস্বামী তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রূপ গোস্বামীপাদকে বললেন, "তোমার তো জীবে দয়া হলো না"। সনাতন গোস্বামীর কথা বুঝতে পেরে রূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে আবার ফিরিয়ে আনলেন।

শ্রীল রূপ-সনাতনাদি গোস্বামীগণের অপ্রকটের পর গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যপদে অধিষ্ঠিত থেকে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ গৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির মহিমা সকলের মাঝে কীর্তন করেন।

কিছুদন পর তিনি গৌড়দেশ থেকে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যোগ্য উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীনিবাসকে 'আচার্য', নরোত্তম দাসকে 'ঠাকুর মহাশয়' এবং দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'শ্যামানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর তিনি তাঁর নিজের রচিত ও গোস্বামীদের অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারের জন্য গৌড়দেশে গমন করেন। তখন বীরহাম্বীর নামে এক রাজা এ সকল গ্রন্থ অপহরণ করলে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ সেই রাজাকে ভক্তে পরিণত করেন।

গ্রন্থাবলী

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবগোস্বামীর লিখিত ২৫টি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে- (১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চনদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদাবলী, (৬) রসামৃত শেষ, (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব, (৮) শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচক চম্পু, (১০) গোপালতাপনী টীকা, (১১) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (১২) রসামৃতটীকা, (১৩) উজ্জ্বলটীকা, (১৪) যোগসার স্তবকের টীকা, (১৫) অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্য, (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, (১৭) শ্রীরাধিকা কর-পদস্থিত চিহ্ন, (১৮) গোপালচম্পু–পূর্ব ও উত্তর বিভাগ, (১৯) ক্রমসন্দর্ভ, (২০) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২১) ভগবৎ সন্দর্ভ, (২২) পরমাত্মাসন্দর্ভ, (২৩) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (২৪) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৫) প্রীতিসন্দর্ভ।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ভাদ্র-শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে আবির্ভূত হন এবং পৌষী শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে তিরোধান লীলা করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ 'শ্রীরাধাদামোদর জিউ' বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে সেবিত হচ্ছেন। শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পাশে শ্রীজীব গোস্বামীর সমাধিস্থান এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে (ললিতাকুণ্ডের নিকটে) ভজন কুটির বিদ্যমান।
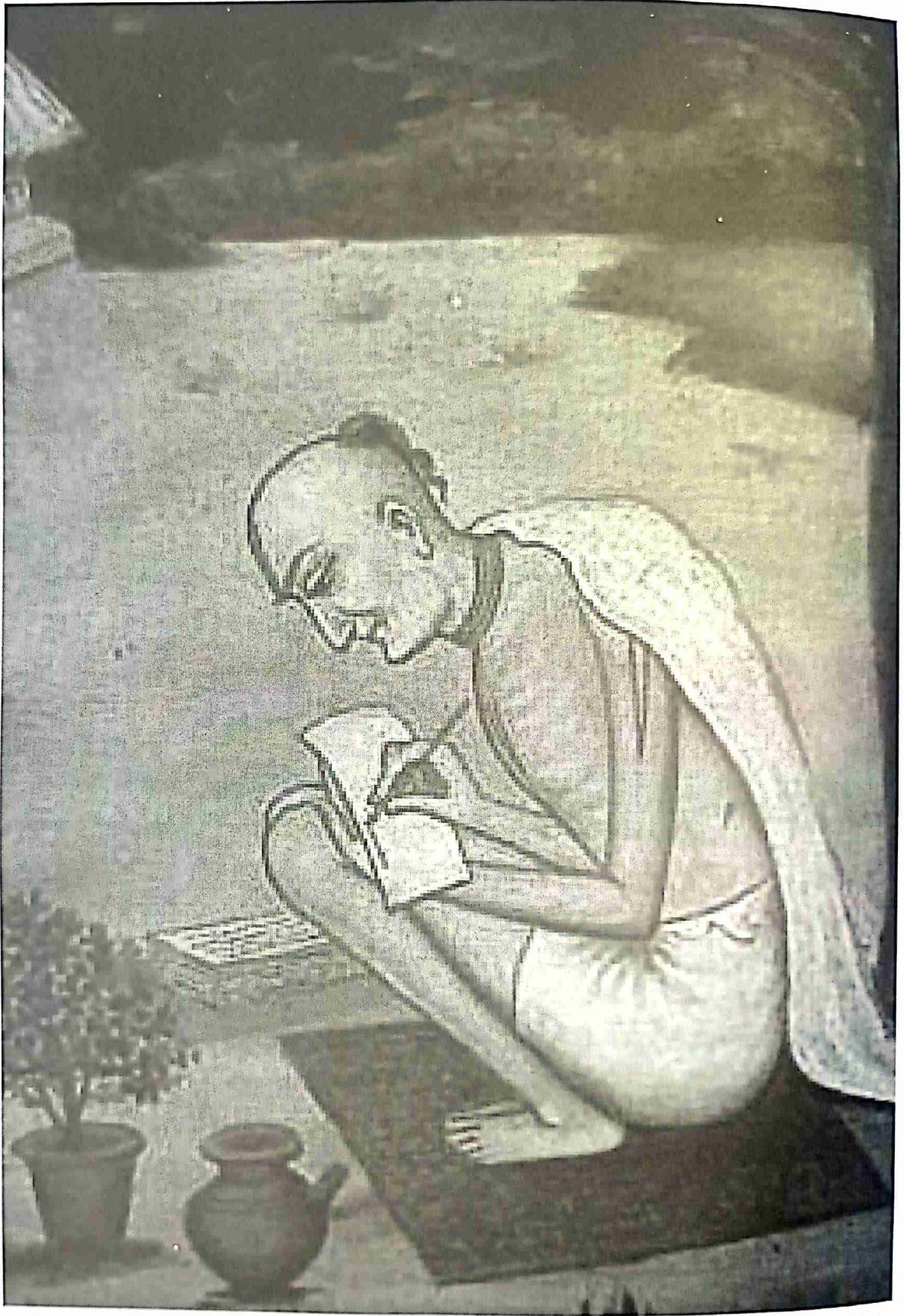
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

আবির্ভাব ও পরিচয়

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাবকাল, তাঁর পিতামাতার নাম এবং তিনি কোন কুলে এসেছেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। শ্রীআশুতোষদেব রচিত বাংলা অভিধানে এবং শ্রীহরিদাস সঙ্কলিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পিতার নাম 'ভগীরথ' এবং মাতার নাম 'সুনন্দা' উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় লিখেছেন– "শ্রীচরিতামৃত রচয়িতা পিতামাতা প্রদত্ত কী নামে পরিচিত ছিলেন, তা আমরা জানি না। তাঁর পিতা বা জননীর যেসকল নবোদ্ভাবিত নাম অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা প্রকৃত কি না, সে বিষয়ে দৃঢ়তা নেই। পারমার্থিক জীবনে তিনি 'কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত ছিলেন। এ গ্রন্থের আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে তিনি যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করেছেন, তার দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, তিনি ঝামট্‌পুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঝামট্‌পুর গ্রামটি নৈহাটী গ্রামের নিকটবর্তী। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার উত্তরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে নোলেপুর গ্রামে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে একটি গ্রাম আছে, সেখান থেকে দুই ক্রোশ পশ্চিমে এবং বর্তমান সালার নামক রেলস্টেশনের কাছেই ঝামট্‌পুর। তাঁর পূর্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেখানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা আজও বিরাজমান। তাঁর পূর্বাশ্রমের কোনো আত্মীয়-স্বজনের অধঃস্তন কেউ সম্প্রতি সেখানে থেকে তাঁর আর কোনো পরিচয় দেননি। স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে তিনি ঝামট্‌পুর পরিত্যাগ করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে রাধা-দামোদর দেবালয়ে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণদাসের সমাধি প্রদর্শিত হয়।"

নৈহাটী-নিকটে 'ঝামট্‌পুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥

–চৈ.চ. আদি ৫/১৮১

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা প্রমাণরূপে উল্লেখ করে লিখেছেন– "এ সকল তথ্য হতে ও অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাপার হতে অনুমিত হয় যে, তাঁর প্রকটকাল ১৫৪২ হতে ১৫৩৮ শকাব্দ পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ১৪৩২ শকাব্দের পরে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবকাল। এই মহাগ্রন্থ তাঁর রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কোন বর্ণে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে বিষয়েও মতভেদ থাকায় সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে লিখেছেন, "কৃষ্ণদাসের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁকে বিভিন্ন মত পোষণকারীগণ উচ্চবর্ণত্রয়ের কোনো এক কুলে উদ্ভূত বলে স্ব-স্ব বিচার প্রদর্শন

করেন। সাহিত্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি কলাপুষ্ট কাব্য শাস্ত্রাধীতিগণ লোকবিচারে তাঁদের পারদর্শিতার ফলস্বরূপ কবিরাজ-সংজ্ঞায় খ্যাতি লাভ করতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে কবিরাজ সংজ্ঞা প্রদত্ত হওয়ায়, কৃষ্ণদাসকে কেউ কেউ বৈদ্য বলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ কৃতিত্ব এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়– এ তিন বিষয়ে অসামান্য অধিকার ও প্রতিভার দরুন তাঁকে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বলে জ্ঞান করাও অসমীচীন নয়। পূর্বাশ্রমে বাসকালে শ্রীদাস গোস্বামীর বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতি মর্যাদাবাক্য হতে এবং বৈষয়িক কূটবুদ্ধির নিজশ্রেণী-সম্পর্কিত-জ্ঞানে আদরে শৈথিল্যবিচারে তাঁকে কায়স্থকুল-ভাস্কর প্রতিভাবিত কুলচন্দ্র বলে ধারণা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।” শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের উপরিউক্ত পর্যালোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কবিরাজ গোস্বামী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য– এ তিনটির কোনো একটি কুলে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। বৈষ্ণব যেকোনো কুলে আবির্ভূত হতে পারেন, তবুও তিনি সর্বোত্তম, তা-ই সকল শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে।

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিও সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কহে ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥

–চৈ.ভা. মধ্য ১০/১০০, ১০২

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রম নির্ণয় সম্বন্ধে একমত নেই। কেউ বলেন, তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে বৃন্দাবন গিয়েছেন, নতুবা সংসার থেকে গিয়ে থাকলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবার প্রসঙ্গ কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে থাকত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– “শ্রীবৃন্দাবন গমনের পরবর্তীকালে তিনি গৃহকথায় উদাসীন হয়ে হরিকথায় ব্যাপৃত ছিলেন, তা তৃতীয় বা চতুর্থ আশ্রমোচিত হরিভজনের জীবন। আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পারমহংস অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস তাঁর পারমার্থিক আত্মীয়সমাজে কবিরাজ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ।”

নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক স্বপ্নাদেশ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হতে জানা যায়, তাঁর আরো একজন ভাই ছিলেন। ভাইয়ের নাম সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে কবিরাজ গোস্বামীর ভাইয়ের নাম শ্রীশ্যামদাস কবিরাজ উল্লেখ করা হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার ৫ম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনে তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীমীনকেতন রামদাসের শ্রীপাটও ঝামটপুরে ছিল। শ্রীমীনকেতন রামদাস নিমন্ত্রিত হয়ে কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে দিনরাত সংকীর্তনে যোগদানের জন্য এসেছিলেন। মহাভাগবত শ্রীমীনকেতন রামদাসের নিত্যানন্দের নাম নিয়ে মহা প্রেমোন্মত্ত অবস্থা। সেই প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় কাউকে বংশীমারা, কাউকে চাপড় দেয়া প্রভৃতি দর্শন করে সংকীর্তনে যোগদানকারী বৈষ্ণবগণ আশ্চর্য হলেন। সকলেই মীনকেতন রামদাসের চরণ বন্দনা করলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে শ্রীবিগ্রহ অর্চনে নিয়োজিত পূজারী শ্রীগুণার্ণব মিশ্র মীনকেতন রামদাসের

প্রতি তেমন সমাদরসূচক ব্যবহার করলেন না। ফলশ্রুতিতে গুণার্ণব মিশ্রের নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হলো। এতে মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন- *"এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ। বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদগম ॥"* গুণার্ণব মিশ্র মীনকেতন রামদাস কর্তৃক শাসিত হয়ে সন্তুষ্ট হলেন। উৎসব শেষে পূজারী বিপ্র চলে গেলে কবিরাজ গোস্বামীর ভাইয়ের সাথে মীনকেতন রামদাসের ঐ বিষয় নিয়ে বাদ-বিবাদ হলো। কবিরাজ গোস্বামীর ভাইয়ের চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি যেমন সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তেমন ছিল না। সেজন্য মীনকেতন রামদাস মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বংশী ভেঙ্গে চলে গেলেন। তাতে কবিরাজ গোস্বামীর ভাইয়ের সর্বনাশ (ভক্তিহীনতা) ও অধঃপতন হলো। কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দ-পার্ষদ রামদাসের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর ভাইকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

দুই ভাই এক তনু–সমান-প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। 'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' তোমার প্রমাণ ॥
কিংবা, দোঁহা না মানিয়া হও ত পাষণ্ড। একে মানি আরে না মানি– এইমত ভণ্ড ॥

–চৈ.চ. আদি ৫/১৭৫-১৭৭

ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের প্রতি সামান্য অনুরক্তিকেও বহুমানন করে ভক্ত-পক্ষপাতী ব্যক্তিকে সর্বাভীষ্ট প্রদান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, তিনি নিত্যানন্দপার্ষদ মীনকেতন রামদাসের পক্ষ অবলম্বন করে নিজ ভাইকে ভর্ৎসনা করেছিলেন; সেই সামান্য গুণকে অবলম্বন করে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং তাঁকে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আদেশ করলেন।

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করিহ ভয়। বৃন্দাবনে যাহ– তাহা সর্ব লভ্য হয় ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতছানি দিয়া। অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লইয়া ॥

–চৈ.চ. আদি ৫/১৯৫-১৯৬

পক্ষান্তরে ভক্ত অবমাননাকারী ব্যক্তি বহু বাহ্যগুণে গুণান্বিত হলেও ভগবানের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। তার দৃষ্টান্ত জমিদার রামচন্দ্র খান। হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও অপ্রসন্ন হয়েছিলেন, তাতে তার সর্বনাশতো হলোই, এমনকি তার স্থান পর্যন্ত উজাড় হলো। এজন্য অত্যন্ত মূঢ় বিবেকহীন ব্যক্তিগণই ভগবৎপ্রিয় সাধুর প্রতি অন্যায় আচরণে সাহসী হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবোচিত অত্যন্ত দৈন্যপূর্ণ উক্তিসমূহের দ্বারা শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার মহিমা জগতে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে। এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার। উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার। অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥

–চৈ.চ. আদি ৫/২০৫-২০৯

বৈষ্ণব মহিমা কীর্তন

বিষ্ণু বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত তাঁদের মহিমা কীর্তন করা যায় না, তা জানাবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথমে গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গৌরভক্তগণের জয়গান এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে শ্রীরূপ-রঘুনাথের পাদপদ্ম সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবের অমর্যাদা এবং তাঁদের প্রতি যেন কোনো অপরাধ না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন–

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার। বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি। দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন। সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন। যথাকথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার। তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার ॥

–চৈ.চ. মধ্য ৪/৫-৯

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস–বৃন্দাবনদাস ॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহ তারিলা সংসার ॥

–চৈ.চ. আদি ৮/৩৪, ৪০

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেছেন, তা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপে লিখেছেন এবং যে সকল লীলা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সংক্ষেপে সূত্ররূপে নির্দেশ করেছেন, তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

চৈতন্যলীলার ব্যাস, দাস বৃন্দাবন। মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥

–চৈ.চ. আদি ১৩/৪৮-৪৯

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে সূত্রাকারে পরে বিস্তৃতভাবে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে সূত্রধরে কোনো কোনো লীলা বর্ণনা করেননি। শ্রীনিত্যানন্দলীলা বর্ণনে আবেশ হওয়ায় চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এজন্য বৃন্দাবনবাসী গৌরগত প্রাণ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সেই শেষলীলা শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদকে তা বর্ণনা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদনগোপালের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করতে যান। প্রভুর চরণে আজ্ঞা প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে সর্ববৈষ্ণবের সামনেই প্রভুর কণ্ঠ হতে মালা খসে পড়ল। বৈষ্ণবগণ তখনই হরিধ্বনি করে উঠলেন। প্রভুর শ্রীচরণসেবক শ্রীগোসাইদাস পূজারী সেই মালা এনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদের গলায় পরিয়ে দিলেন। তিনি আজ্ঞামালা পেয়ে পরমানন্দে গ্রন্থলেখা আরম্ভ করলেন। তাই তিনি দৈন্যসহকারে লিখেছেন–

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন'।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥
সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥

–চৈ.চ. আদি ৮/৭৮-৭৯

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী– শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা যা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রক্ষিত হয়েছিল, তা অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখেছেন। "স্বরূপ দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রেখেছিলেন অর্থাৎ তাঁকে কণ্ঠস্থ করে কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা তা জগতে প্রচার করেছিলেন। সুতরাং, শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক পুস্তকাকারে লিখিত হয়নি। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্য।"–শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

স্বরূপ-গোসাই কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথদাস-মুখে যে সব শুনিল ॥
সেইসব লীলা কহি, সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্যকৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হইয়া ॥

–চৈ.চ. অন্ত্য ৩/২৬৯-২৭০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলামহিমা কবিরাজ গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকটিত হয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে রচয়িতার লেখনী হতে জানা যায়।

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি– এ বড় বিস্ময় ॥

–চৈ.চ. মধ্য ২/৮৯-৯০

কবিরাজ উপাধি লাভ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এক সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্বোত্তমতা বর্ণনাকালে তাঁর উপদেশবাণীতে বলেছিলেন–"পৃথিবীর যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুটি বিদ্যমান থাকলেই মনুষ্যগণ সর্বাভীষ্ট বস্তু-প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হবে না। যদি এমন হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেরও বিলুপ্তি ঘটল, তাহলে একমাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থাকলেই মানুষের কোনো লোকসান হবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যা অনভিব্যক্ত, তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অভিব্যক্ত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমতত্ত্ব। তাঁরই অভিন্ন শব্দমূর্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গাঢ় রাধার তত্ত্ব ও মহিমা প্রকটিত হয়েছে। সুতরাং, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্বোত্তমতা বিষয়ে আর সন্দেহ কী? এজন্য চরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামীরও সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হচ্ছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা– এই তিনটি অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত

হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর গীতিতে লিখেছেন–

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যিঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর গোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাতে না হৈল মোর চিত ॥

গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ লিখে শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হলেন। বৈষ্ণবজগতে তিনি রূপানুগবররূপে পূজিত।

রাধারাণী কর্তৃক কবিরাজ গোস্বামীর পরিচয় কথন

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাতে জানা যায় যে, কবিরাজ গোস্বামী রাধারাণীর নিজজন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত, সুতরাং তাঁর বাক্যমাত্রই পরম প্রমাণ। কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা পঞ্চবিংশতি বলার পরিবর্তে কেন সাড়ে চব্বিশ অক্ষর বললেন, তা বুঝতে না পেরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাধাকুণ্ডের তীরে দেহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলে মাঝরাতে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন– স্বয়ং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তাঁর নিকট এসে বলছেন– 'হে বিশ্বনাথ, হে হরিবল্লভ, তুমি ওঠো, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা লিখেছেন, তা সত্য। তিনি আমার নর্ম সহচরী। আমার অনুগ্রহে আমার অন্তরের কথা তিনি সবই জানেন। তাঁর বাক্যে সন্দেহ করো না।

অন্তর্ধান

শ্রীনিবাসাচার্যের সাথে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরাঘব ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাক্ষাৎকারের কথা ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে–

শ্রীরাঘব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি।
শ্রীনিবাসে কৈল সবে কৃপার অবধি ॥

–ভক্তিরত্নাকর ৪/৩৯২

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে ঝামট্‌পুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি ছোট পাদপীঠ মন্দির আছে। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে শ্রীগৌরনিত্যানন্দবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। একটি কাঠের পাদুকা কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত বলে প্রদর্শিত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটির ও সমাধি রাধাকুণ্ডে বিরাজিত আছে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর আশ্বিন শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিত্যালীলায় প্রবেশ করেন।
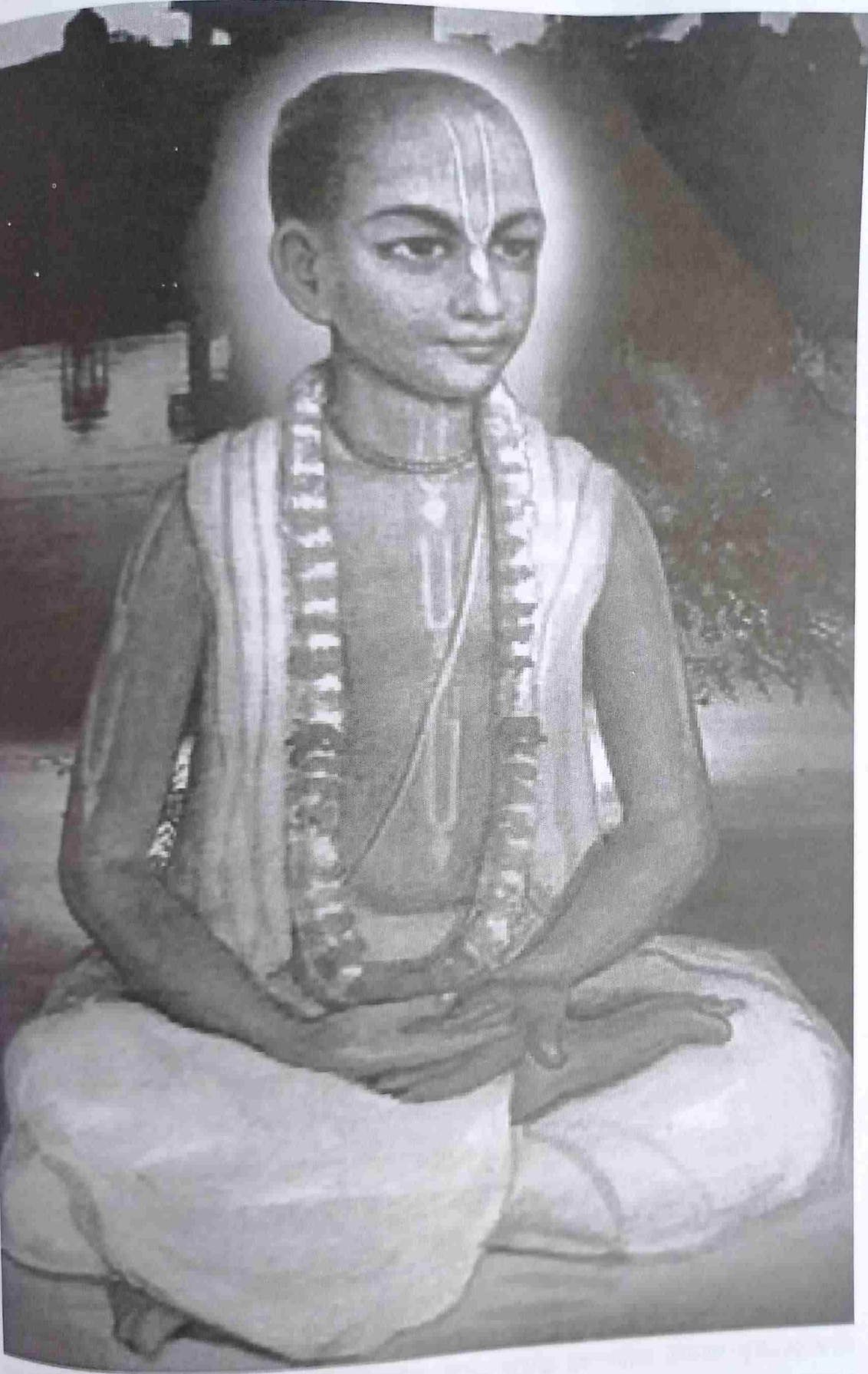
শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত চম্পকমঞ্জরী। জগজ্জীবের নিত্যকল্যাণ বিধানের জন্য তিনি নরোত্তম দাস ঠাকুররূপে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর পরগণায় (গড়েরহাট বা গরাণহাট পরগণায়) রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে খেতুরীধামে পঞ্চদশ শকাব্দের মধ্যভাগে মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম ॥

–*ভক্তিরত্নাকর* ১/২৮১

তাঁর পিতা ছিলেন গোপালপুর পরগণার অধিপতি রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা শ্রীনারায়ণী দেবী। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্রের নাম শ্রীসন্তোষ দত্ত। কৃষ্ণপার্ষদ বৈষ্ণব যেকোনো কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারেন– তা জানানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে নরোত্তম ঠাকুরের কায়স্থকুলে আবির্ভাবলীলা।

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্বতীর্থদর্শী।
পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তমদাসঃ ॥

–*ভক্তিরত্নাকর* ১/২৭৯

গৃহত্যাগ

শৈশবকাল থেকেই নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্রে মহাপুরুষের চিহ্নসকল প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও ভক্তিভাব দেখে সকলে আশ্চর্যান্বিত হতেন। তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গুণমহিমা চিন্তনে সর্বদা মগ্ন থাকতেন। রাজৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে। করয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া। প্রিয় নরোত্তমে স্থির করিল প্রবোধিয়া ॥"

–*ভক্তিরত্নাকর* ১/২৮৫-২৮৬।

নরোত্তম দাস ঠাকুর চিন্তা করছিলেন কীভাবে সংসার ছাড়া যায়। একসময় পিতা পিতৃব্য সকলেই রাজকার্যে অন্যত্র গেলে, সেই অবসরে মাকে বুঝিয়ে, রক্ষককে ভুলিয়ে কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন।

মহাপ্রভুর প্রেম প্রাপ্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাই নাটশালা গ্রামে এসে আনন্দে কীর্তন ও নৃত্য করতে করতে হঠাৎ 'নরোত্তম' নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। মহাপ্রভুর ভাবাবেশ দেখে নিত্যানন্দ প্রভু এর কারণ জানতে ইচ্ছা করলে মহাপ্রভু বললেন– "দেখ শ্রীপাদ, তোমার মহিমা তুমি নিজে

জানো না। নীলাচলে যাবার সময় তুমি প্রেমাবেশে দিনের পর দিন কেঁদেছিলে, আর তা আমি বেঁধে রেখেছি। নরোত্তমকে দেয়ার জন্য পদ্মাবতী তীরে সেই প্রেম রাখব।" তারপর মহাপ্রভু কুতুবপুরে এসে পদ্মাবতীতে স্নান করে তাঁর তটে নৃত্য কীর্তন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু পদ্মাবতীকে সম্বোধন করে বললেন– "এই প্রেম নাও, গোপনে রেখে দিবে, নরোত্তম এলে তাঁকে দিবে।" তখন পদ্মাবতী বললেন– "কেমন করে বুঝব নরোত্তম এসেছে?" তার উত্তরে মহাপ্রভু বললেন– *"যাঁর পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা ॥"* যে স্থানে মহাপ্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেম রাখলেন সে স্থানই পরবর্তীকালে 'প্রেমতলী' বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে। নরোত্তম ঠাকুরকে ১২ বছর বয়সে স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভু দর্শন প্রদান করে পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত প্রেম নেবার জন্য নরোত্তমকে আদেশ করলেন। নরোত্তম ঠাকুর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে একদিন একাকী পদ্মানদীতে গিয়ে স্নান করলে তাঁর চরণস্পর্শে পদ্মাবতী উছলে উঠলেন। পদ্মাবতী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য স্মরণ করে নরোত্তমকে প্রেম সমর্পণ করলেন। প্রেম পাওয়ামাত্র নরোত্তমের ভাব, বর্ণ সব পরিবর্তিত হয়ে গেল। নরোত্তমের প্রেমবিকার দেখে পিতামাতা তাঁকে শান্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। নরোত্তম শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গৃহের বন্ধন ছেদন করে বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হলেন। কারো মতে নরোত্তম ঠাকুর পিতার মৃত্যুর পর জেঠা শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন।

নরোত্তম রাজপুত্র হলেও ভগবানের বিরহে কাতর হয়ে সকল দেহসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে অহর্নিশি ক্রন্দন করতে করতে খালি পায় চলতে লাগলেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই; শেষে একটি গাছের নিচে এসে অচেতন হয়ে পড়লেন। একজন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ এক ভাণ্ড দুধ এনে স্নেহপূর্ণ ভাষায় বললেন– "ওহে নরোত্তম, এই দুধটুকু খাও, মন ভালো হবে, তারপর আনন্দে পথ চলো।" এ কথা বলে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হলে নরোত্তম শ্রান্তি-ক্লান্তিবশত নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। তখন নরোত্তম ঠাকুর শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর দর্শন লাভ করলেন। শ্রীরূপ-সনাতন পরম স্নেহে নরোত্তমের বুকে হাত দিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর আনাদুধ ভোজন করালেন। নরোত্তমের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হলো।

লোকনাথ গোস্বামীর কৃপা লাভ

নরোত্তম দাস ঠাকুর কীভাবে বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর কৃপালাভ করেছিলেন তা-ও প্রেমবিলাসে বর্ণিত হয়েছে। নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব মাঘী পূর্ণিমায়, সংসার ত্যাগ কার্তিক পূর্ণিমায় এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ শ্রাবণ-পূর্ণিমায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য বা পার্ষদরূপে পরিগণিত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী তীব্র বৈরাগ্যের সাথে শ্রীব্রজমণ্ডলে ভজন করেছিলেন। তিনি ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। কাউকে শিষ্য করবেন না এমন সঙ্কল্প ছিল তাঁর। নরোত্তম দাস ঠাকুরের সঙ্কল্প তিনি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হবেনই।

নরোত্তম দাস ঠাকুর রাজপুত্র হয়েও লোকনাথ গোস্বামীর কৃপালাভের জন্য বৃন্দাবনে তাঁর বাহ্য কৃত্যের স্থানটি প্রতিদিন মাঝরাতে গিয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন এবং হাত ধোয়ার জন্য ভালো মাটি ও জল রেখে দিতেন। প্রেমবিলাসে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে –

যে স্থানে গোসাই জীউ যান বহির্দেশ। সেই স্থানে যাই করেন সংস্কার-বিশেষ ॥
মৃত্তিকার শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। নিত্য নিত্য এইমত করেন সেবনে ॥
ঝাটাগাছি পুতি রাখে মাটির ভিতরে। বাহির করি সেবা করে আনন্দ অন্তরে ॥
আপনাকে ধন্য মানে, শরীর সফল। প্রভুর চরণ-প্রাপ্ত্যে এই মোর বল ॥
কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাটা বুকে দিয়া। পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া ॥

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রতিদিন বাহ্যকৃত্য স্থানটি নির্মল ও দুর্গন্ধমুক্ত দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। কে এমন কাজ করছে তা জানার জন্য শৌচস্থানের কাছে গোপনে অবস্থান করে হরিনাম করতে লাগলেন। মাঝরাতে একজনকে প্রবেশ করে উক্ত কার্য করতে দেখে তিনি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তখন নরোত্তম দাস ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর চরণে পতিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলেন। রাজপুত্র নরোত্তম দাস ঠাকুরের দৈন্য ও আর্তি দেখে স্নেহার্দ্রচিত্ত হয়ে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম দাস ঠাকুরকে দীক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরই তাঁর একমাত্র শিষ্য। গুরুসেবা কীভাবে করতে হয় তা ঠাকুর নরোত্তম নিজে আচরণ করে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন।

হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া। গুরুসেবা যথোচিত কৈল হর্ষ হৈয়া ॥
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিল। নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল ॥

–ভক্তিরত্নাকর ১/৩৪৫-৩৪৬

কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর। কার্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর ॥
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা। লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা ॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥

–ভক্তিরত্নাকর ১/২৯২-২৯৪

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটের পর উৎকল-গৌড়-মাথুরামণ্ডলের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যপদে অধিষ্ঠিত এবং বৃন্দাবনে 'বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার' শ্রেষ্ঠ পাত্ররাজ ছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের আশ্রয়ে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণদাস শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য', 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করে যাবতীয় গোস্বামী শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রথমে বঙ্গদেশে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীরহাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ অপহরণের সংবাদ এবং পরে শ্রীনিবাসের দ্বারা এর উদ্ধারের সংবাদ শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র সেনকে ও তাঁর অনুজ গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেছিলেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী একনিষ্ঠ বিরক্ত বৈষ্ণবের ভজনাদর্শ কেমন হওয়া উচিত তা শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণবহির্মুখ জনগণের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য এবং

নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে রাজসুলভ সামাজিক রীতিনীতির ব্যবহারে রুচি দেখে তাঁকে তাঁর পূর্বাশ্রম খেতুরীতে যাবার জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুও গ্রন্থ অপহরণ হলে লোকনাথ গোস্বামীর অভিপ্রায় জেনে নরোত্তম দাস ঠাকুরকে খেতুরীতে এবং উত্তরবঙ্গে প্রচারে যেতে বলেছিলেন। শ্রীল নরোত্তমের প্রতি শ্রীনিবাস আচার্য বললেন- *"খেতুরী গ্রামেতে শীঘ্র করে গমন। প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন ॥"* -ভক্তিরত্নাকর ৭/১১৯। 'ঝি'কে মেরে 'বৌ'কে শিক্ষা দেয়ার ন্যায় লোকনাথ গোস্বামী নিজ জনের মাধ্যমে জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রীল গুরুদেবের বিরহে ব্যাকুল হলেও শ্রীল গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে খেতুরীতে এসে শুদ্ধ প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করে উত্তরবঙ্গবাসী নরনারীগণের উদ্ধার সাধন করলেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর রচিত 'প্রার্থনা' গীতিতে হৃদয়ের দৈন্য ও আক্ষেপ প্রকাশ করে লিখেছেন-

অনেক দুঃখের পরে, ল'য়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি', এ জনারে কেশে ধরি',
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আদেশে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর খেতুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত- এই ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খেতুরীতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম ঠাকুর যে মহা মহোৎসব করেছিলেন বৈষ্ণবসমাজে তা আজও প্রসিদ্ধ আছে।

নরোত্তম যে-সময়ে গৌড়দেশ আইল। প্রভু লোকনাথ সে-সময়ে আজ্ঞা কৈল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-সেবন। শ্রীবৈষ্ণব-সেবা শ্রীপ্রভুর সংকীর্তন ॥
যৈছে আজ্ঞা কৈলা, তৈছে হইলা তৎপর। কৈল ছয় সেবা শ্রীবিগ্রহ মনোহর ॥
অতি সে তাৎপর্য সদা নিমগ্ন সেবায়। শুনিতে সে সব নাম পরাণ জুড়ায় ॥
গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন। রাধারমণ, হে রাধে, রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥
-ভক্তিরত্নাকর ১/৪২২-৪২৬

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীতে মহোৎসবের পূর্বে শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা করে বিভিন্ন স্থান দর্শন এবং গৌরপার্ষদগণের কৃপালাভ করেছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট, খড়দহে শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দশক্তি বসুধা-জাহ্নবাদেবী, খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, নৃসিংহপুরে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু, শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাট, একচক্রাধামে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবস্থল এবং নীলাচলে গোপীনাথ আচার্যের স্থান, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, গদাধর পণ্ডিতের স্থান, জগন্নাথ মন্দির, গুণ্ডিচা মন্দির, জগন্নাথবল্লভ উদ্যান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন।

খেতুরীতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে সে সময়ের গৌরপার্ষদগণ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নৃসিংহপুর হতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, খড়দহ হতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য, রঘুপতি বৈদ্য, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্যদাস, জ্ঞানদাস, মহীধর, শ্রীশঙ্কর, কমলাকর পিপ্পলাই, গৌরাঙ্গ দাস, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর; শ্রীখণ্ড হতে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরসহ ভক্তগণ; নবদ্বীপ হতে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি ভক্তগণ; শান্তিপুর হতে অদ্বৈতাচার্যের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীগোপাল মিশ্র প্রভৃতি; অম্বিকা কালনা হতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ খেতুরী উৎসবে যোগদান করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর উপস্থিতিতে ও পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর গণসহ খেতুরীতে নরোত্তম ঠাকুরের সংকীর্তন মহোৎসবে প্রকটিত হয়েছিলেন।

কহিতে কি সংকীর্তন সুখের ঘটায়। গণসহ অধৈর্য হইলা গোরারায়॥
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে। সংকীর্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে॥

—ভক্তিরত্নাকর ১০/৫৭১-৫৭২

কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ। কিবা ভক্তমণ্ডলী-মধ্যেতে গৌরচন্দ্র॥
প্রকাশিলা প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা। কিবা এ বিলাস! ইহা বুঝে কুন জনা॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ। দুঁহু অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ॥

—ভক্তিরত্নাকর ১০/৬০৫-৬০৭

খেতুরী মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ সর্বত্র বিস্তৃত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হলেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর (ঘনশ্যাম) বিরচিত 'নরোত্তম বিলাসে' নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা পাঠ করে নরোত্তম দাস ঠাকুরের অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

গোপালপুর গ্রামে শ্রীবিপ্রদাস ব্রাহ্মণের গৃহে ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সাপ ছিল। তার ভয়ে কেউ সেখানে যেতো না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই গৃহে শুভবিজয় করলে সাপ অন্তর্ধান হয় এবং সেই গোলা থেকে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ প্রকটিত হয়ে নরোত্তম দাস ঠাকুরের কোলে উঠেন।

গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্বনয়ন গোচর॥

—ভক্তিরত্নাকর ১০/২০২

এ ঘটনা দেখে সকলে আশ্চর্যান্বিত হলেন। বর্তমানে সে বিগ্রহ গম্ভীরাতে আছেন।

এক স্মার্ত-ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নরোত্তম দাস ঠাকুরকে শূদ্রবুদ্ধি করে নিন্দা করায় গলিত কুষ্ঠব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। পরে ভগবতীদেবীর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নরোত্তম দাস ঠাকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করলে কুষ্ঠব্যাধি হতে মুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ শ্রীশিবানন্দ আচার্যের দুই পুত্র হরিরাম আচার্য ও রামকৃষ্ণ আচার্য পিতার আদেশে ছাগ-মহিষ দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিবেন বলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব দিব্যমূর্তি দর্শন করে তারা আকৃষ্ট হলেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর রাজস ও তামস পূজা ও হিংসার পরিণাম অশুভ বুঝিয়ে তা পরিত্যাগ করে নিষ্কামভাবে ভগবদ্‌ভজনের উপদেশ প্রদান করলেন। তারা ছাগ-মহিষ ছেড়ে দিয়ে পদ্মাবতীতে স্নান করে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় ব্রতী হলেন। তাতে তাঁদের পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে মিথিলার স্মার্ত পণ্ডিত মুরারিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য নিয়ে এলেন। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুরের দুই শিষ্য হরিনাম ও রামকৃষ্ণ গুরুকৃপাবলে স্মার্ত পণ্ডিতের সমস্ত বিচার শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন করে দিলেন। শিবানন্দ আচার্য পরাভূত হয়ে দেবীর নিকট রাতে নিজ দুঃখ নিবেদন করলে দেবী তাঁকে স্বপ্নে শাসন করে বৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করলেন।

ক্রমশ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীজগন্নাথ আচার্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য হতে থাকলে স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষাপরবশ হয়ে রাজা নরসিংহের কাছে এই বলে নালিশ করলেন– "নরোত্তম শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করছে, সে যাদুদ্বারা সকলকে মোহিত করছে, তাকে উক্ত কার্য হতে নিবৃত্ত করা উচিত।" রাজা নরসিংহের সাথে পরামর্শ করে স্থির হলো দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণের দ্বারা নরোত্তম ঠাকুরকে পরাভূত করা হবে। রাজা স্বয়ং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে নিয়ে খেতুরী ধামের দিকে যাত্রা করবেন– এমন দুষ্ট অভিপ্রায়ের কথা জেনে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন রাজা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ সহ কুমারপুর বাজারে একদিন বিশ্রাম করে খেতুরী যাবেন। তা শুনে দুজনে কুমারপুর বাজারে কুমারের ও পান সুপারির দুটি দোকান খুলে বসলেন। স্মার্ত পণ্ডিতের ছাত্রগণ কুমারের ও পানসুপারির দোকানে এলে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী তাঁদের সাথে সংস্কৃতে কথা বলতে লাগলেন। দোকানদারের এমন পাণ্ডিত্য দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারা তর্ক আরম্ভ করলে নরোত্তম ঠাকুরের দুই শিষ্য তাদের সমস্ত স্মার্ত বিচার খণ্ডন করে দিলেন। এ অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে রাজা পণ্ডিতসহ সেখানে এসে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হলে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী তাদের সমস্ত বিচার খণ্ডন করে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন। রাজা ও পণ্ডিত সামান্য দোকানদারের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। রাজা যখন জানতে পারলেন ঐ দুই দোকানদার নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য, তখন রাজা পণ্ডিতকে বললেন, "যাঁর সামান্য শিষ্যের নিকটই আপনারা পরাস্ত হলেন, তাঁদের গুরুর নিকট গিয়ে কী হবে?" পরে অবশ্য রাজা নরসিংহ ও শ্রীরূপনারায়ণ দেবীর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নরোত্তম দাস ঠাকুরের নিকট তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে লিখিত আছে– রাজধানী খেতুরী থেকে একক্রোশ দূরে 'ভজনটুলিতে' ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রম ছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনের দ্বারাই প্রচার করেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় 'গরাণহাটি' নামে কীর্তনের অপূর্ব সুর প্রবর্তন করেছিলেন।

তাঁর রচিত 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ। ভক্তগণের এক এক অবস্থায় হৃদয়ের এক এক প্রকার ভাবানুরূপ কীর্তন তাতে বিদ্যমান— যা ভক্তের হৃদয় স্পর্শ করে। নরোত্তম দাস ঠাকুরের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ভক্তগণের এত প্রিয় যে, তা কত সংরক্ষণ মুদ্রিত হয়েছে তা আজও অবিদিত। সুদূর মণিপুর রাজ্যে আজও নরোত্তম ঠাকুরের অদ্ভুত প্রভাব লক্ষিত হয়। সেখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার এ মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে হয়েছে, তা সর্বজনস্বীকৃত। নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী কীর্তন মণিপুরের ঘরে ঘরে কীর্তিত হয়েছে।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের চিরসঙ্গী অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। প্রথমে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের, পরে শ্রীনিবাস আচার্যের অপ্রকট সংবাদে নরোত্তম ঠাকুর বিরহসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যেভাবে গান করেছিলেন তা শ্রবণে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গৌরনিজজন রূপানুগবর ছিলেন, তা-ও তাঁর রূপগোস্বামীর পাদপদ্মে অনন্য নিষ্ঠাসূচক কীর্তন হতে অবগত হওয়া যায়।

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কার্তিকী কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।
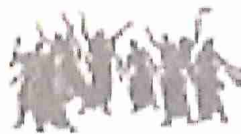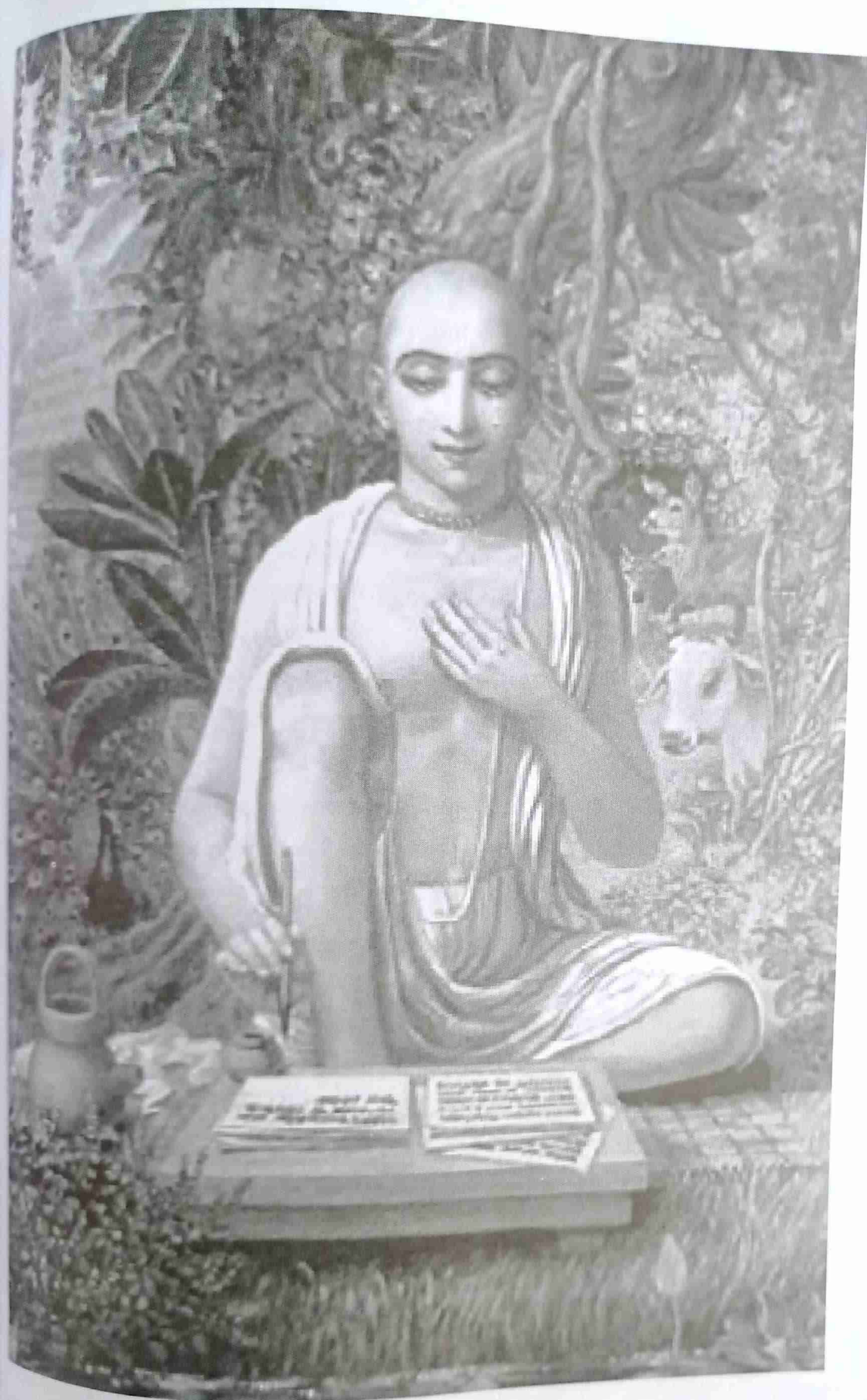
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

বিশ্বস্য নাথরূপোহসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥

ভক্তিপথ প্রদর্শন করেছিলেন বলে তিনি বিশ্বের নাথ বা 'বিশ্বনাথ' স্বরূপে এবং ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে 'চক্রবর্তী' আখ্যায় বিভূষিত হয়েছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আনুমানিক ১৫৬০ শকাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৬ শকাব্দে) নদীয়া জেলার দেবগ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্তী, কিন্তু মাতৃপরিচয় জানা যায়নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাইয়ের নাম শ্রীরামভদ্র চক্রবর্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী এবং পরম গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর দত্তক পুত্র (মতান্তরে শিষ্য) ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তার সারার্থদর্শিনীটীকায় স্বীয় গুরু-পরম্পরার কথা এমনভাবে লিখেছেন–

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুং নৌমি॥

এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, "শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম– শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম– শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর গুরু– শ্রীগঙ্গাচরণ। 'নাথ'-শব্দে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু; এটাই তাঁর নিজ গুরু পরম্পরা।"

তিনি বাল্যকালে দেবগ্রামে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে মুর্শিদাবাদে সৈয়দাবাদ গ্রামে গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে চক্রবর্তী ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনে তিনি দার পরিগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ করলেও সংসারের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। কথিত হয় যে, তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে শ্রীমদ্ভাগবতরসামৃত পান করিয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে ভগবদ্ভজনের নির্দেশ দিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গোস্বামীগণের আদর্শ অনুসরণ করে শ্রীব্রজধামে অবস্থান করে ভজন করেছিলেন। শ্রীগুরুদেবের প্রতি আনুগত্য হেতু তাঁর অপরিসীম কৃপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে সকল গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ এবং ভাগবত ও গীতার টীকাসমূহের ভাষা অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল ও ভক্তিরসপূর্ণ।

তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ব্রজবাসী গোস্বামীগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়েছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীবিশ্বনাথ

চক্রবর্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির লেখক অল্পই আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হতে বহিষ্কৃত শ্রীরূপকবিরাজ অতিবাড়ী নামে এক অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে প্রচার করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তিমাত্রই আচার্য হওয়ার অধিকারী, গৃহস্থগণ নয়। তিনি বিধিমার্গকে সম্পূর্ণ অনাদর করে ও শ্রবণ কীর্তনে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই এমন বলে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচার করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে সারার্থদর্শিনীটীকাতে এর প্রতিবাদ করে জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ বিধান করেছেন। রূপকবিরাজের অভিমত– আচার্যবংশে জন্মগ্রহণ করলেও গৃহস্থ কখনো 'গোস্বামী' শব্দ-বাচ্য নহে। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর এরও প্রতিবাদ করে শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রমাণ করেছেন– আচার্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থসন্তানও আচার্য বা গোস্বামী হতে পারেন। কিন্তু ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্যকুলে জন্মানো নিজ নিজ সন্তানগণের নামের শেষে 'গোস্বামী' শব্দের সংযোজন সাত্বতশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ হরিবল্লভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি বেশ ধারণ করে হরিবল্লভ নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, দার্শনিক বিচারের প্রগাঢ় দক্ষতা, ভক্তিরসশাস্ত্রে পারদর্শিতা, কবিত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনন্যসাধারণ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ যখন অতিবৃদ্ধ অচল অবস্থায় বৃন্দাবনধামে অবস্থান করছিলেন, সে সময় জয়পুরে গল্‌তা গ্রামের শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের আচার্যগণ জয়পুরের মহারাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় পরিত্যাগ করে রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলে প্রতিপাদন করেছিলেন। তাঁরা জয়পুরের মহারাজকে পুনরায় রামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্যের নিকট দীক্ষিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমন প্রস্তাবে জয়পুরের মহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বৃন্দাবনে অবস্থানকারী তৎকালীন প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট উক্ত সংবাদ প্রেরণ করে তাঁকে জয়পুরে শুভাগমনের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের বার্ধক্যের কারণে নিজে যেতে না পারায় তিনি তাঁর ছাত্র শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরে গিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অধ্যয়নের ছাত্র ছিলেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব ও বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য জয়পুরে গল্‌তার গাদীতে বিচারসভায় উপস্থিত হলেন। চার বৈষ্ণব সাত্বতসম্প্রদায়ে বেদান্তের ভাষ্য আছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বেদান্তের ভাষ্য নেই– এই কারণ দেখিয়ে রামানুজীয় আচার্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মর্যাদা স্বীকার করতে না চাইলে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বেদান্তের ভাষ্য লেখার জন্য সাতদিন (মতান্তরে তিনমাস) সময় চাইলেন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের কৃপায় বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করলেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায় যে, তিনি যেখানে ভাগবত লিখতেন সেখানে পুঁথিতে জল পড়লেও জলের দ্বারা পুথি ভিজতো না, পাতাগুলো অটুট থাকতো। তাঁর স্থাপিত বিগ্রহ 'শ্রীগোকুলানন্দজীউ' বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে বিরাজিত আছেন। আনুমানিক ১৬৩০ শকাব্দে মাঘী গৌরপঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে কৃষ্ণাপঞ্চমী) তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রকট হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যে সকল গ্রন্থ লিখেছেন, তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা), ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা), ৭। শ্রীগোপালতাপনীটীকা, ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত (ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (খ) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (গ) পরমগুরোরষ্টকম্, (ঘ) পরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (ঙ) পরমপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (চ) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (জ) শ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (ঝ) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (ঞ) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (ট) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (ড) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (ঢ) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (ণ) স্বয়ং ভগবদষ্টকম্, (ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (থ) জগন্মোহনাষ্টকম্, (দ) অনুরাগবল্লী, (ধ) শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (ফ) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (ভ) শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্, (ম) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (র) সুরতকথামৃতম্ (আর্যশতকম্), (ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্, ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যম্, ১০। শ্রীভাগবতামৃতকণা, ১১। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ, ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ, ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য), ১৫। মাধুর্যকাদম্বিনী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা, ১৯। শ্রীললিতমাধবনাটকটীকা, ২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা), ২১। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

আবির্ভাব

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাবকাল ও স্থান সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তাঁর পূত জীবনচরিত সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে অনুমিত হয় যে, তিনি খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবস্থানের নাম জানা না গেলেও উড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলার রেমুণার নিকটবর্তী কোনো গ্রামে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী-রচিত 'স্তবমালা'-এর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'স্তবমালাবিভূষণ' টীকার রচনায় যে সন প্রদত্ত হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের (পলাশী যুদ্ধের) পরেও প্রকট ছিলেন।

বিদ্যাবিলাস

তাঁর বিদ্যাবিলাস-লীলা সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি চিল্কাহ্রদের তীরে পণ্ডিতগণের নিবাসস্থলে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সেবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তারপর কিছুদিন বেদ অধ্যয়নের পর তিনি বেদান্তের বিভিন্ন আচার্যগণ-কৃত ভাষ্য অনুশীলনের জন্য মহীশুরে গিয়েছিলেন। তখন তিনি মধ্বাচার্যের শুদ্ধদ্বৈতমতকে যুক্তিসঙ্গত বিচার করে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্য হলেন এবং তত্ত্ববাদীদের মঠে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এসে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাথে শাস্ত্রযুদ্ধ করে তাঁদের পরাস্ত করলে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

পরে অবশ্য তিনি কান্যকুব্জদেশীয় পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকট শ্রীজীব গোস্বামীকৃত ষট্‌সন্দর্ভ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বোত্তমতা উপলব্ধি করে তাঁর (শ্রীরাধাদামোদরের) শিষ্য হয়েছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্যপরম্পরায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু, তাঁর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, তাঁর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী এবং তাঁর শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ। আর শ্রীনয়নান্দের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছেন। শোনা যায় যে, শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু বিরক্ত বৈষ্ণবের বেশও গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে 'একান্তী গোবিন্দদাস' নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ

তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম হতে জয়পুরে আসেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব ও বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য জয়পুরে গল্‌তার গাদীতে বিচারসভায় উপস্থিত হলেন। চার বৈষ্ণব সাত্বতসম্প্রদায়ে বেদান্তের ভাষ্য আছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বেদান্তের ভাষ্য নেই– এই কারণ দেখিয়ে রামানুজীয় আচার্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মর্যাদা স্বীকার করতে না চাইলে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বেদান্তের ভাষ্য

লেখার জন্য সাতদিন (মতান্তরে তিনমাস) সময় চাইলেন। রামানুজীয় আচার্যগণ প্রার্থনা অনুযায়ী সময় দিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীল গুরুদেবের ও শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপা প্রার্থনা করে বেদান্তের ভাষ্য লেখার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের আশীর্বাদমালা বলদেব বিদ্যাভূষণের মস্তকে অর্পিত হলো। গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের কৃপা হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তের পাঁচশত সূত্রের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিরসপূর্ণ ভাষ্য লেখা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করলেন। গল্‌তা গাদীর সভাতে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমুখে বেদান্তের প্রেমপর ভাষ্য শ্রবণ করে সকলেই আশ্চর্য হলেন। শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচিত হওয়ায় তা 'গোবিন্দভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য লিখিত হওয়ার পরই শ্রীবলদেব 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

সেখানে শ্রীল রূপ গোস্বামী-সেবিত শ্রীগোবিন্দজীউর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এবং বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করে শ্রীসম্প্রদায়ের গল্‌তাগাদীতে অন্য সম্প্রদায়ের বিচার নিরাসপূর্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মর্যাদা সংরক্ষণ করেছিলেন। তখন থেকে তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হয়ে 'শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ' নামে খ্যাত হলেন। এই প্রসঙ্গটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের পূত সংক্ষিপ্ত চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে।

কথিত হয় যে, তিনি গল্‌তাগাদীতে 'বিজয়গোপাল' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন দুজন– শ্রীউদ্ধবদাস ও শ্রীনন্দনমিশ্র।

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য– গোবিন্দভাষ্য, (২) সিদ্ধান্তরত্ন, (৩) বেদান্তস্যমন্তক, (৪) প্রমেয়রত্নাবলী, (৫) সিদ্ধান্তদর্পণ, (৬) সাহিত্যকৌমুদী, (৭) কাব্যকৌস্তুভ, (৮) ব্যাকরণকৌমুদী (দুষ্প্রাপ্য), (৯) পদকৌস্তুভ, (১০) বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা), (১১) গোপালতাপনী-ভাষ্য, (১২) ঈশাদি-দশোপনিষদ্-ভাষ্য, (১৩) শ্রীগীতাভূষণ-ভাষ্য, (১৪) শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), (১৫) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতটিপ্পনী–'সারঙ্গরঙ্গদা', (১৬) তত্ত্বসন্দর্ভটীকা, (১৭) শ্রীল রূপ গোস্বামীর স্তবমালার– 'স্তবমালা-বিভূষণ'-ভাষ্য, (১৮) নাটকচন্দ্রিকাটীকা (দুষ্প্রাপ্য), (১৯) ছন্দঃকৌস্তুভ-ভাষ্য, (২০) শ্রীশ্যামানন্দশতকটীকা, (২১) চন্দ্রালোকটীকা (দুষ্প্রাপ্য), (২২) সাহিত্যকৌমুদীটীকা–কৃষ্ণানন্দিনী, (২৩) শ্রীগোবিন্দভাষ্যটীকা–সূক্ষ্মা, (২৪) সিদ্ধান্তরত্নটীকা– 'সূক্ষ্মা'। কথিত হয় যে, এগুলো ছাড়াও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন যা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ লিখিত 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী' হতে পৃথক। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ লিখিত 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী' গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈত প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বলদেবকৃত 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী'-তে রয়েছে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

শ্রীব্রাহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শুদ্ধ ভাগবত পরম্পরায় অথবা সদ্‌গুরু-পরম্পরায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু নিত্য স্মরণীয়। যথা–

বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তার প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
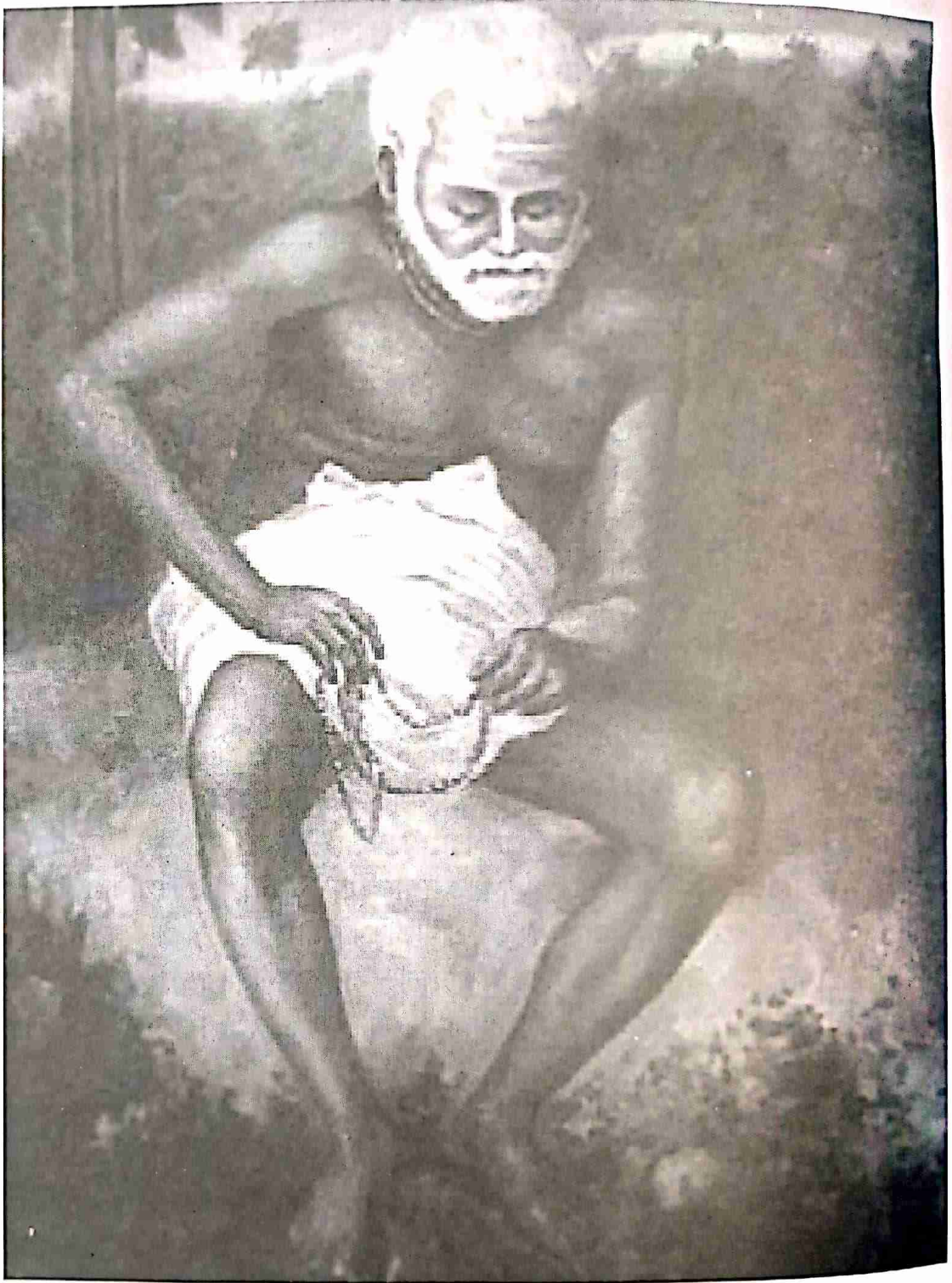
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

“বৈষ্ণবসমাজে সিদ্ধমহাজনরূপে পূজিত বৈষ্ণবপ্রিয় বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজকে প্রণাম করি, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবস্থলী তাঁর দিব্যদর্শনে নির্দেশ করেছেন।” শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর গুরু-পরম্পরা গীতিতে লিখেছেন–

বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা-সেব্যসেবাপরা,
তাঁর দয়িতদাস নাম ॥

কেবল কুলগুরুপরম্পরায় শ্রোত্রিয়ত্ব প্রদর্শিত হলেই সদ্গুরু হওয়া যায় না, ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রয়োজন। শুদ্ধ ভক্ত বা শুদ্ধ ভাগবতই প্রকৃত সদগুরু। সংস্কৃত ভাষায় যে গুরু-পরম্পরা কীর্তিত হয় তাতে লিখিত আছে যে–

বৈষ্ণবসার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধামস্তু নির্দেষ্টা সজনপ্রিয়ঃ ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি অন্ধকারযুগের কথা শোনা যায়– (১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে, (২) ষড়গোস্বামীর অপ্রকটের পর, (৩) শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর অপ্রকটের পর, (৪) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর। কিন্তু অন্ধকার যুগের দ্বারা শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-ধারা বা শ্রীরূপানুগধারায় আচার্যপরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। কেবল আচার্যপরম্পরায় কখনো ভজনানন্দী, কখনো বা গোষ্ঠানন্দী আচার্যের আবির্ভাবের কারণে প্রচারের অপ্রবলতা ও প্রবলতা দৃশ্যমান হয়েছে। গুরুপরম্পরা বা ভাগবত-পরম্পরায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের পরে উদ্ধব দাস, তাঁর অনুগত শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি (সূর্যকুণ্ডে 'সিদ্ধবাবাজি' নামে প্রসিদ্ধ)। শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজি মহারাজের পারমহংস্যবেশ-শিষ্য হলেন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন– “ভাষ্যকারের (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের) অনুগত শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পারমহংস্য পথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্মের প্রচার করেছেন। তা-ই শ্রীগৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।” শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের এ বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ কেবল বিবিক্তানন্দী পরমহংসের আদর্শ প্রদর্শন করেননি, তাঁরা প্রচারকরূপে আচার্যের লীলাও প্রকাশ করেছেন।

বর্ধমান জেলার প্রান্তবর্তী পুরুণিয়াবাসী শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামী শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বধামগত ঈশানচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর। ত্রিপুরা মহারাজের রাজপ্রাসাদে শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য 'শ্রীরাসবিহারীজীউ' আজও সেবিত হচ্ছেন।

আবির্ভাব

বাবাজি মহারাজ বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার) কোনো এক গ্রামে প্রায় দু'শ চৌদ্দ বছর পূর্বে এক সম্ভ্রান্ত বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারো কারো মতে তিনি পাবনা জেলার অন্তর্গত তড়াস গ্রামে বারেন্দ্র কায়স্থকুলকে ধন্য করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতৃমাতৃকুলের পরিচয় অপরিজ্ঞাত। শ্রীল বাবাজি মহারাজের পারমহংস্যবেশ গ্রহণ করে শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে তীব্র ভজনাদর্শ প্রদর্শনকালে তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে পূজিত হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ দেড়শতাধিক বছরব্যাপী তাঁর প্রকটলীলা চলে। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে রূপানুগ-ভজন-পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন প্রেমসেবা করেছিলেন।

সাধারণের প্রতি করুণা

শোনা যায় যে, তিনি যখন বৃন্দাবনে অন্যান্য ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে ভজন করছিলেন, সে সময় কাটোয়া হতে একজন প্রসিদ্ধ ভৃতক পাঠক বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য কনক ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। তিনি উত্তমরূপে ভাগবত পাঠ করলেও ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ তাঁর পাঠ শুনতে আগ্রহী না হওয়ায় তিনি তার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, অবান্তর উদ্দেশ্য নিয়ে ভাগবত পাঠকে প্রকৃত ভাগবতপাঠ বলে না। এর দ্বারা নিজের এবং অপরের কারোরই কল্যাণ সাধিত হয় না, বরং অকল্যাণই হয়। তাঁকে ভাগবত-ব্যবসায়বৃত্তি পরিত্যাগের জন্য উপদেশ করলেন। মহাভাগবত বাবাজি মহারাজের কৃপার ফলে উক্ত ভৃতক বৈষ্ণবের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটল। জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ ও বৈষ্ণবগণের কৃপায় তাঁর জাতি-বর্ণ-পাণ্ডিত্যাদির অভিমান সবই দূরীভূত হলো। তিনি বৃন্দাবনের আ-শ্ব-গোখর-চণ্ডাল সকলকেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি পরম বৈষ্ণবে পরিণত হলেন।

বাবাজি মহারাজ কঠোর ভজনানন্দী বৈষ্ণব হলেও অনধিকারী অনর্থযুক্ত শিষ্যগণকে কপট নামভজনের অছিলায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখতার প্রশ্রয় দেননি। তিনি অনধিকারী সেসব ভেকধারী শিষ্যগণের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাঁর ভজনকুটীর পার্শ্ববর্তী শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার নিমিত্তে সংরক্ষিত শাক-সবজি-বাগানের সেবাকার্যে তাঁদের নিয়োজিত করেছিলেন। ইন্দ্রিয়সমূহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ না হলে কৃষ্ণনামের স্ফূর্তি হয় না, কৃষ্ণনাম করার যোগ্যতাই আসে না। সেগুলো যখন দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিতে নিয়োজিত হয়, তখন তাতেই আসক্তি হতে বাধ্য। সেজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বদা ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিয়োজিত রাখতে হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার আমলাজোড়া নামক স্থানে বাবাজি মহারাজের সঙ্গে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বিতীয়বার মিলিত হন। আমলাজোড়ায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিবাসর-তিথিতে বাবাজি মহারাজের সঙ্গে দিনরাত গৌর-কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করেছিলেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গৌরনাম ও গৌরধাম প্রচারে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। আমলাজোড়ায় শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সাথে সারারাত জাগরণ করে, হরি-সংকীর্তনমুখে একাদশীব্রত পালন-প্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী পত্রিকায় লিখেছেন– "গতরাতে একাদশী জাগরণের পর সকাল ৮ ঘটিকার সময় গ্রামের সমস্ত ভক্ত মহাসমারোহের সাথে কীর্তনে বের হলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজি মহাশয়কে অগ্রবর্তী করে সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছলেন। সেখানে কীর্তনের সময় বাবাজি মহাশয়ের যেসকল ভাবের উদয় হয়েছিল, তা বর্ণনা করা যায় না। শত বর্ষের উর্ধ্ববয়সে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই কী নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে' ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করে অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি লুণ্ঠনসময়ে সেখানে যে এক আশ্চর্য দৃশ্যের উদয় হয়েছিল, তা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজি মহাশয়ের ভাবদর্শনে এবং কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হয়ে সকলেই প্রায় অশ্রুপুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদগদ হয়ে বহুক্ষণ নৃত্য করেছিলেন।" শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়– ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ শ্রীগোদ্রুমে সংকীর্তন উৎসবে এবং শ্রীমায়াপুর দর্শন উৎসবে বহু বৈষ্ণবসহ যোগ দিয়েছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে মাঘমাসে বাবাজি মহারাজ তাঁর পরিকরসহ কুলিয়া-নবদ্বীপ হতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে শুভাগমন করেছিলেন। ২৭ মাঘ বুধবার সেখানে অপূর্ব হরিসংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর অবির্ভাব স্থান নির্ণয়

শ্রীবিহারীদাস বাবাজি নামে এক বলিষ্ঠ ব্রজবাসী শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সেবক ছিলেন। তিনি বাবাজি মহারাজকে একটি চুপড়ীতে উঠিয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেতেন। বাবাজি মহারাজ অতি বৃদ্ধ হলেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি অটুট ছিল। তিনি কেবল ভ্রূ নিচে নামিয়ে চোখ আবৃত করে রাখতেন, ভ্রূ উঠালেই দেখতে পেতেন। শোনা যায় যে, বিহারীদাস বাবাজি যখন বাবাজি মহারাজকে চুপড়ীতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী যোগপীঠে নিয়ে এলেন, তখন বাবাজি মহারাজ 'জয় শচীনন্দন গৌরহরি' বলে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। বৃদ্ধ বাবাজিকে ঐ প্রকার উদ্দণ্ড নৃত্য করতে দেখে সকলে বিস্মিত হলেন। বাবাজি মহারাজ দিব্যদর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং পরে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাস-অঙ্গন নির্দেশ করলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে, ২০ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বাবাজি মহারাজ কুলিয়ার নবদ্বীপ হতে সংকীর্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শুভাগমন করে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান জগন্নাথ মিশ্রের আলয় নির্দেশ করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর সজ্জনতোষণীতে লিখেছেন– "২০ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার বেলা

১১টার সময় পশ্চিমপার-নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনটি নৌকায় পার হলেন। ভক্তবর মহেন্দ্রবাবু তাঁদের পার করে আনলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজি মহাশয়কে পাল্কীতে করে নেয়া হলো। শ্রীমায়াপুরে যাত্রীসংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না। মায়াপুরের নিকটবর্তী হয়ে দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর দ্বারিকবাবু মহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সংকীর্তনের দল নিয়ে নানাবিধ পতাকা উড্ডীয়মান করে মহা আনন্দে বাবাজি মহাশয়ের প্রতীক্ষা করছেন। সমস্ত ভক্ত যখন জন্মটিলার উপর উঠে নৃত্য করতে লাগলেন, তখন এক আশ্চর্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হয়েছিল। বোধ হয় এরূপ শোভা আর চারশ বছর হয়নি। সকল বৈষ্ণব বসে শেষে স্থির করলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে ও শ্রীবাসাঙ্গন-ভূমিতে একটি সেবা স্থাপন হউক। শ্রীযুত জগন্নাথদাস বাবাজি মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীদেবী দুইপাশে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোরমূর্তি অন্যঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাসাঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।" –(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা, 'আবির্ভাবোৎসব' প্রবন্ধ)

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে একটি কদম্ববৃক্ষ ছিল। শ্রীল বাবাজি মহারাজ সেখানে এসে নৃত্য করতেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ সেই কদম্ববৃক্ষের নিচে ভজনানন্দে ও হরিকীর্তনানন্দে নিমগ্ন থাকতেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ অনেক সময় কুলিয়া নবদ্বীপে ভজনকুটীতে অবস্থান করতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই ভজনকুটীর অলিন্দ নির্মাণ করেছিলেন। সেই ভজন কুটীর প্রাঙ্গণে বাবাজি মহারাজের সমাধি। বাবাজি মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতায় রামবাগানস্থ ভক্তি-ভবনে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সে সময় তিনি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি অনেক স্নেহ প্রদর্শন করতেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা শুনে বাবাজি মহারাজ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্জিকা প্রকাশের জন্য নির্দেশ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মঠ হতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক 'নবদ্বীপ'-পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ প্রকটকালে শেষাবস্থায় অনেকটা খর্বাকৃতি রূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যখন সংকীর্তনে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন, তখন তাঁকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিত ভূজ ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু, চার হাত পরিমাণ দীর্ঘ পুরুষ বলে মনে হতো। তিনি একেকটি লাফ দিয়ে ৫-৬ হাত উপরে উঠে যেতেন। কীর্তনানন্দে তাঁর অদ্ভুত ভাবের প্রাকট্য লক্ষিত হতো।

চিৎজগতে গমন

জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজ ১৩০১ বঙ্গাব্দে ১৪ ফাল্গুন, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে সকাল ১০টায় অপ্রকট হন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– "বিগতবর্ষে ১৩০১ বঙ্গাব্দ ১৪ ফাল্গুন সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজি মহাশয় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটীরে শ্রীধাম লাভ করেছেন। সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করে চিৎজগতে প্রবেশ করলেন। আমরা জড় চোখ দিয়ে তাঁর আনন্দজনক নৃত্য-কীর্তন আর দেখতে পাবো না। তিনি চিৎজগতে অবস্থিত থেকে আমাদের প্রতি কৃপাবিধান করুন।"– সজনতোষণী ২য় বর্ষ ২য় পৃষ্ঠা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

ঠাকুরের অপ্রাকৃত স্বরূপ তাঁর কৃপাভিষিক্ত নিজ জনের হৃদয়ে প্রকটিত। তিনি শ্রীমতি রাধারাণীর প্রধানসঙ্গী শ্রীললিতাদেবীর প্রেষ্ঠা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর রচিত গীতিতে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ঈঙ্গিত করেছেন–

যুগলসেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে, নিযুক্ত করো আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যাকিঙ্করী, বিনোদ ধরিছে পায়।

–কল্যাণ-কল্পতরু

তিনি তাঁর রচিত 'গীতমালা' গীতিগ্রন্থে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীললিতা-সখীর কুঞ্জে-শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ভজনাদর্শ প্রদর্শন করে শ্রীরূপ-মঞ্জরীর অনুগত 'কমল-মঞ্জরী'-রূপে নিজের সিদ্ধ পরিচয় প্রদান করেছেন। সিদ্ধি-লালসা (৮)

বরণে তড়িৎ, বাস তারাবলী,
কমল-মঞ্জরী নাম।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত,
স্বানন্দ-সুখদ ধাম ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায় রামানন্দ, ষড় গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ আচার্যগণের অন্তর্ধানের পর গৌড়ীয়-গগনে অন্ধকার যুগ নেমে এলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্মের তাৎপর্য বুঝতে অসমর্থ হয়ে বহু অপসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শ্রীতোতারাম দাস বাবাজি মহাশয় তেরোটি অপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন–

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাই ॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে, এই তেরর সঙ্গ নাহি করি ॥

বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অপসম্প্রদায়ের গর্হিত আচরণ দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে অশিক্ষিতের, নীচজাতির ও চরিত্রহীনের ধর্ম মনে করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হলেন। ঔদার্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের দুরবস্থায় দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তাদের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য তাঁর নিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে জগতে প্রেরণ করলেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ লিখে শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতসমূহ নিরসন করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অসমোর্দ্ধত্ব সংস্থাপন করলে শিক্ষিত সমাজ ও জগৎবাসী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মানব-জাতির সর্বোত্তম পারমার্থিক কল্যাণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান অতুলনীয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'জৈবধর্ম' গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাতে' ঠাকুরের

পরিচয় এভাবে দিয়েছেন–

"শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। কাল-প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ এ জড়জগৎ হতে নিত্যলীলায় প্রবেশের পর গৌড়গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটায় গৌরবিহিত কীর্তনকিরণ বঞ্চিত হয়ে আবৃত হয়। গৌড়গগনের সূর্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তারকারাজি একে একে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্ব-স্ব জ্যোতির্বিম্ব প্রদর্শনে বিরত হলে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হওয়ার আর অন্য উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্ষাধিক তিনশত বছর পর নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর-গ্রামে এই শ্রীগৌর-নিজজনের আবির্ভাবকাল গৌড়ীয় গগনতল উদ্ভাসিত করেছিল।"

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ। সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

"কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই। কৃপালু দয়ানিধি গৌরহরি বদ্ধজীবকে নববিধভাবে কৃপা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়েরও সেরূপ দয়া-বিতরণের কার্য দেখা যায়।"

যেরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবপুস্বরূপে সর্বোত্তম নরলীলাখেলা, তদ্রূপ কৃষ্ণপার্ষদ ভক্তগণও পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হয়ে নরলীলার অনুরূপ আচরণ করে থাকেন। তাঁদের মানুষের ন্যায় দেখা গেলেও তাঁরা মায়িক জগতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট নয়, সর্বদাই অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রতিবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তগণের গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থান বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের মতো নয়। তা তাঁদের মানুষের সঙ্গে আদান-প্রদানের সৌকর্যার্থে মানুষের ন্যায় আনুকরণিক লীলামাত্র। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে নিষ্কপটভাবে প্রপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁদের কৃপায় তাঁদের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

ঠাকুরের বংশ-পরিচয় ও আবির্ভাব

আদিশূর কর্তৃক আহূত হয়ে শ্রীপুরুষোত্তম বঙ্গদেশে শুভাগমন করেছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমের বংশে সপ্তম ও অষ্টম অধস্তনরূপে শ্রীবিনায়ক এবং তাঁর পুত্র শ্রীনারায়ণ রাজমন্ত্রী হয়েছিলেন। এ বংশে পঞ্চদশ পর্যায়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর গৃহে সপার্ষদে শুভপদার্পণ করে তাঁকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁরই বংশে পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা শ্রীগোবিন্দশরণ দত্ত, যিনি গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেছিলেন। কালীঘাট, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর– এই তিন গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরের উদ্ভব হয়। গোবিন্দ-শরণের পৌত্র শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র শ্রীমদনমোহন দত্ত।

তিনি কলকাতার হেদুয়া পুষ্করিণী জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করেছিলেন, গয়ার প্রেতশিলাতীর্থে ও চন্দ্রনাথের পাহাড়ে বিপুল অর্থ-ব্যয়ে সিঁড়ি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পৌত্র শ্রীরাজবল্লভ দত্ত। শ্রীরাজবল্লভের পুত্র পরমধার্মিক শ্রীআনন্দ চন্দ্র দত্ত। নদীয়া জেলার উলা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মুস্তৌফীর কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীদেবীর সঙ্গে শ্রীআনন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র দত্ত ও শ্রীজগন্মোহিনীদেবীকে পিতামাতারূপে অঙ্গীকার করে ৩৫২ গৌরাব্দ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৮ ভাদ্র, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২ সেপ্টেম্বর রবিবার শুক্লা-ত্রয়োদশী ও শুভবাসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উলাগ্রামে (বীরনগরে) তাঁর মাতামহের আলয়ে আবির্ভূত হলেন। পিতামাতা তাঁর নাম রাখলেন– শ্রীকেদারনাথ।

ঠাকুরের অলৌকিক প্রতিভা

শিশুকালে মাত্র দুবছর বয়সে ঠাকুরের জিহ্বায় কবিত্বের স্ফূর্তি হয়। পরবর্তীতে তাঁর রচিত বিভিন্ন অপ্রাকৃত গীতসমূহের দ্বারা এ কবিত্বের বিকাশ হয়। সেগুলো কোনো প্রকার জাগতিক পাণ্ডিত্য, বিদ্যা বা মনোগতভাব হতে উদ্ভূত নয়। ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে অপ্রাকৃত ভাবসমূহ আপনা থেকেই প্রকটিত হয়ে থাকে। বৈকুণ্ঠ পুরুষের শ্রীমুখপদ্ম নিঃসৃত শব্দ ভগবান থেকে অভিন্ন, তাঁর সঙ্গে জাগতিক কোনো শব্দের তুলনা হয় না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ ভগবদ্ভক্তির অমৃতময় রসে পূর্ণ। মাত্র ছয় বছর বয়সে ঠাকুর রামায়ণ ও মহাভারতের যাবতীয় তথ্য ও ইতিহাস আয়ত্ত করেছিলেন। এটা কি সাধারণ কোনো ছয় বছরের শিশুর পক্ষে সম্ভব? রামায়ণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঐ সকল ভক্তিশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বোধগম্য হয় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হৃদয়ে শাস্ত্রসমূহ স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছিল। তাই তথাকথিত পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত শাস্ত্রার্থের সাথে ঠাকুরের শাস্ত্রব্যাখ্যার পার্থক্য রয়েছে।

তিনি নয় বছর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ঠাকুর তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন– দশ বছর বয়সে তাঁর চিত্তে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তিনি তত্ত্বজ্ঞানে সর্বদা উদ্ভাসিত থাকলেও মনুষ্য জন্মের বৈশিষ্ট্য-খ্যাপনের জন্য উক্ত লীলার প্রাকট্য সাধন করেন। মানুষ কী নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং কী কী চিন্তা করে, তা জানার জন্য তিনি তাদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করলেন। তিনি অত্যন্ত মৃদু ও মিষ্টভাষী ছিলেন; প্রীতিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করতেন। মধুরবাক্যের দ্বারা যাদের বিচার তিনি খণ্ডন করতেন, তারা দুঃখিত না হয়ে সুখ লাভ করতেন। এরূপ শক্তি কোনো সাধারণ বালকের থাকা সম্ভব নয়। ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনচরিতে এমন কতগুলো ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়– "যার বাড়িতে যে উৎসব হয়, আমি দেখতে যাই। ব্রহ্মচারীর বাড়িতে অনেক পূজা হয়। সেই বাড়ির বাইরে একটি ভালো মন্দির। ভিতরদিকে বাগান ও হোমের স্থান। তান্ত্রিকমন্ত্রে ব্রহ্মচারীর উপাসনা। মড়ার মাথার খুলি গুপ্ত ছোট ছোট ঘরে থাকতো। কেউ কেউ বলতো যে, দুগ্ধ-গঙ্গাজল দিলে মড়ার মাথা হাসে। আমি মড়ার মাথা

নামিয়ে জল দিয়ে দেখেছিলাম, কিন্তু কোনো হাসি দেখতে পাইনি। যেখানে সর্বজ্ঞদের বাড়ি, সেখানে গিয়ে গান শুনতাম। জগদ্ধাত্রীর চাল চিত্র করতে এক বৃদ্ধ ছুতোর নিযুক্ত থাকতো। আমি তার নিকট বসে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতাম। সে সকল বিষয়ের উত্তর দিত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বল দেখি, এ প্রতিমার মধ্যে দেবতা কখন আসবেন?' সে উত্তর করল, আমি যেদিন এর চক্ষু দান করব, সেদিন দেবতা এসে প্রতিমায় অধিষ্ঠিত হবেন।' আমি আগ্রহ সহকারে সেদিন দেখতে এলাম; কিন্তু দেবতার কোনো অধিষ্ঠান দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, গোলোক পাল প্রথমে খড়ে, তারপর মাটিতে এই প্রতিমা গড়েছে। আবার তোমরা প্রথমে খড়ি, পরে রংচিত্র করলে। দেবতাতো বস্তুত কখনোই এলেন না?' তখন সেই বৃদ্ধ সূত্রধর বলল– 'ব্রাহ্মণেরা ঘট বসিয়ে মন্ত্র পড়লে ঠাকুর আবির্ভূত হবেন' (কিন্তু) আমি তখনও তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। সেই বৃদ্ধ সূত্রধরকে বিজ্ঞ জেনে তখন তার বাড়িতে গিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে তখন বলল– 'এই প্রতিমা পূজায় আমার কিছু বিশ্বাস নেই। আমার বোধহয়, ব্রাহ্মণেরা জুয়াচুরি করে এ ব্যবস্থা দ্বারা টাকা অর্জন করে।' বৃদ্ধ বার্ধকীর সেই কথায় আমার বিশেষ প্রীতি হলো। আমি তাকে পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞেস করলাম; সে বলল– 'যে যাই বলুক, আমি এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাউকেই বিশ্বাস করি না। দেব-দেবী কল্পিত, আমি প্রতিদিন সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করি।' বৃদ্ধের এ কথায় আমার শ্রদ্ধা হলো।

আমি জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলাম। গোলাম খাঁ পেয়াদা তোষাখানার দ্বারে পাহারা দেয়। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল– 'ঈশ্বরের নাম খোদা, তিনি এক ছিলেন, আর কেউ ছিল না। খোদা নিজের শরীরের ময়লা তুলে রুটির মতো করে একার্ণবের জলে ফেললেন। রুটির উপরার্ধ আকাশ ও নিম্নার্ধ পৃথিবী হলো। এভাবে জগৎ সৃষ্টি হলো। আদম-হাওয়া সৃষ্টি করে মানুষ সৃষ্টি করলেন, আমরা সকলেই আদম-হাওয়ার বংশ।' আমি এ গল্পটি শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলাম– 'তুমি রামকে কী বল?' সে বলল– 'রাম রহিম এক, তিনিই খোদা'। আমি তখনই ভূতের মন্ত্রের সন্ধান পেলাম। ভূতের কথায় গোলাম খাঁ বলল– 'সকল ভূতই শয়তানের আওলাত, তারা রহিমের নামে ভয় করে।' তত্ত্বজ্ঞানে আমার চিত্ত প্রসন্ন হলো।

পরশুরাম মুস্তৌফী তখন আইন পড়েন। প্রথমে তিনি একটু একটু ঈশ্বর মানতেন। শেষে ঈশ্বরকে জবাব দিয়েছিলেন। যখন ঈশ্বর মানতেন, তখন রঘুমামা ও নশুমামা তাঁর চেলা ছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাস ছেড়ে দিলে রামমোহন রায়কে 'গুরু মহাশয়' বলতে লাগলেন– 'আমার মহা মুস্কিল; আমি একে ছেলেমানুষ, অনেক কথা জানি না, তাতে মতভেদ দেখে সুখ হলো না।' পরশুরাম মামা বললেন– 'বাবা, সকলেই প্রকৃতি থেকে হয়েছে। 'ঈশ্বর' বলে প্রকৃতি হতে পৃথক কেউই নেই'। এসব কথা শুনে আমি কোনো কোনো টোলের ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আরো গোলমেলে কথা বলতে লাগলেন। অস্থিরসিদ্ধান্ত হলেও আমি 'রাম'– নাম ছাড়ি না।"

ঠাকুর এসব কথাবার্তা বলে অযথা তর্ক-বিতর্কের পথ পরিত্যাগ করে অপরিপক্ক অবস্থায় গোলমেলে সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবেশ না করে শ্রদ্ধার সঙ্গে হরিনাম করার উপদেশ

প্রদান করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গ্রন্থে ডোর দিয়ে ছাত্রদের হরিনাম করিয়েছিলেন। হরিনামের দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং প্রকটিত হবে। জড় মন-বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না, 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতি পুরাতন স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। এক সময় তিনি কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে বলেছিলেন– 'ঈশ্বরকে যখন আমরা দেখিনি, তখন তাঁর আলোচনা না করাই ভালো।' ঠাকুর ছাত্র হলেও সত্যকথা বলতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন– 'পণ্ডিত মহাশয়, আপনি আপনার 'বোধোদয়' গ্রন্থে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' লিখেছেন কেন? ঈশ্বরকে না দেখে তাঁর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ভালো হয়েছে? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর সকল ক্ষমতাই আছে। যাঁর সকল ক্ষমতাই আছে, তাঁর কি নিজের আকারটি রক্ষা করার ক্ষমতা নেই? পরমেশ্বর আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁর নিত্যদাস। তাঁর প্রতি আমাদের হৃদয়ের যে সহজ চির-অনুরাগ, তাকেই বেদ 'ভক্তি', 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'পরাবিদ্যা' বলেছেন। সে বিদ্যাই আসল বিদ্যা, যা লাভ করলে কোনো জ্ঞানেরই অভাব থাকে না।'

যাঁরা সর্বদা বাস্তব বস্তু ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত, তত্ত্ব-বিরোধযুক্ত কথা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে সমর্থ হন। গ্রন্থ অধ্যয়নজনিত বিদ্যা এবং স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর আবির্ভাবজনিত জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক।

বিবাহ-লীলা

এগারো বছর বয়সে ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হয়। তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শ্রীকেদারনাথের জননী বারো বছর বয়স্ক বালককে রানাঘাটনিবাসী পাঁচ বছরের এক বালিকার সঙ্গে বিবাহ সম্পাদন করলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন– 'ঠিক যেন পুতুলখেলা। শ্বশুরবাড়িতে একা থাকতে পারব না বলে আমার ঝি সঙ্গে গিয়েছিল।'

অধ্যয়ন-লীলা

ঠাকুর ছয় বছর বয়সে বিদ্যাবাচস্পতির টোলে গিয়ে সংস্কৃত পাঠ শ্রবণ করতেন। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী মহাশয় ঠাকুরকে সাত বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল ক্যাপ্টেন ডি-এল রিচার্ডসন এবং দেশীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীরামতনু লাহিড়ী। পরে উলাতে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হলে ঠাকুর তাতে ৮ বছর বয়সে ভর্তি হলেন। কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নকালে ঠাকুরের সহপাঠী হয়েছিলেন কুচবিহারের বালক রাজা। উলাতে মাতামহের স্বধাম প্রাপ্তি হলে ঠাকুর তাঁর মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে হেদুয়া ও বিডনস্ট্রীটের মোড়ের বাড়িতে অবস্থান করতে লাগলেন। কলকাতায় হিন্দু চেরিটেবল ইনস্টিটিউশনে বিদ্যাশিক্ষা পুনরায় আরম্ভ করলেন। চার বছর সেখানে শিক্ষালাভের পর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্কুলে ভর্তি হলেন। সে বছরই কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হলে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

তখন ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীতারকনাথ পালিত ও শ্রীনবগোপাল মিত্র। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ঠাকুরের প্রতিভা দেখে প্রিন্সিপাল ক্লিন্ট সাহেব, পাদ্রী ডাল সাহেব, জর্জ টম্‌সন এবং শ্রীকেশব চন্দ্র সেন আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ঠাকুরের ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'পোরিয়েড' কাব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমাদৃত হলো। ঠাকুরের রচিত ইংরেজি কবিতাসমূহ 'লাইব্রেরী গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বৃটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে ঠাকুরের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন।

ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম, খ্রিস্টীয় ধর্ম, বাইবেল-কোরানাদি সমস্ত ধর্মগ্রন্থই আলোচনা ও অধ্যয়ন করেছিলেন। খ্রিস্টধর্মে নিত্য সবিশেষ ভগবানের বিচার থাকায় তিনি ব্রাহ্মধর্মী অপেক্ষা তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহরূপ সঙ্কটকালে তিনি প্রচারে বের হয়ে নানাদেশ পর্যটন করেছিলেন।

পিতামহ রাজবল্লভের ভবিষ্যদ্বাণী

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর গৌড়দেশ হতে নীলাচল যাত্রা করেন। পথে যাজপুরের নিকটবর্তী ছুটিগ্রামে (ছুটি গোবিন্দপুরে) পিতামহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বাকসিদ্ধপুরুষ পিতামহ শ্রীরাজবল্লভ দত্ত 'ঠাকুর বড় বৈষ্ণব হবেন'– এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্রহ্মতালু ভিন্ন হয়ে প্রাণ বিযুক্ত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তারপর কটক হতে পদব্রজে যাত্রা করে চন্দনযাত্রাকালে পুরীতে জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পৌঁছেন। কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করে তিনি কটক, ভদ্রক, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

'শ্রীভক্তিবিনোদ' নাম প্রাপ্তি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর কটক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা এবং ভদ্রক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার পদ স্বীকার করেছিলেন। সে সময় ঠাকুরের রচিত উড়িষ্যার মঠসমূহের তথ্যপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। স্যার উইলিয়াম হান্টার একটি পুস্তকে ঠাকুরের সেই পুস্তকের বহু কথা উল্লেখিত হয়েছে। ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যগীতা' নামে একটি গ্রন্থ লিখে তাতে নিজেকে 'সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার' রূপে পরিচয় প্রদান করেছেন। ৪০০ গৌরাব্দে শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামী সংঘ কর্তৃক ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ' নামে ভূষিত হন। তখন থেকেই শ্রীকেদারনাথ 'শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঠাকুরের প্রচার-ভ্রমণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষকতার কাজও করেছিলেন। মেদিনীপুরের সাহিত্যসভায় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অতি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শ্রীরাজনারায়ণ বসু চমৎকৃত হয়েছিলেন। মেদিনীপুরে থাকাকালে ঠাকুরের প্রথমা পত্নী অন্তর্ধান হলে যকপুরে তিনি ভগবতী দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। ঠাকুর প্রচার-ভ্রমণে মেদিনীপুর

হতে বর্ধমানেও এসেছিলেন। বর্ধমান থাকাকালে তিনি আরেকটি পুস্তক লিখেন। স্থানীয় ব্যক্তিদের অনুরোধে তিনি পরস্পর বিবাদমান ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রিষ্টধর্ম মতের সন্ধিস্থাপনে চেষ্টা করেন। ঠাকুর দুটো বক্তৃতা দ্বারা তাঁদের বিচারের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। বর্ধমানে ঠাকুর 'ভ্রাতৃসমাজ' স্থাপন করেন। ভ্রাতৃসমাজে আত্মা সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় ঠাকুরের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনে হিলি সাহেব পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বর্ধমান হতে ঠাকুর চুয়াডাঙ্গা, রানাঘাট ভ্রমণান্তে বিহারে ছাপারায় এবং আরো পশ্চিমদেশে কাশী, মির্জাপুর, প্রয়াগ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছেছিলেন। ছাপরায় থাকাকালে উর্দু ও পার্সীভাষা শিক্ষা করে ঠাকুর তাতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। ছাপরায় বিশেষ সভাতে 'গৌতম-স্পীচ' নামে একটি ভাষণও প্রদান করেন। ছাপরা হতে পূর্ণিমা হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করে দিনাজপুরে এসেছিলেন। দিনাজপুরে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং 'ভাগবত-স্পীচ' নামে আরেকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৬৮ সালে জুন মাসে ঠাকুর মালদহে শ্রীরূপ-সনাতনের স্থান ও রাজমহল প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। তারপর কলকাতা ফিরে ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহের জন্য অনেক অন্বেষণ করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় নিয়ে ঠাকুর পুনরায় পুরুষোত্তমধাম পৌঁছলেন। তখন সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সুষ্ঠু সেবা পরিচালনার জন্য তিনি উক্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। তিনি একাদিক্রমে পাঁচ বছরের অধিককাল পুরীতে অবস্থান করেছিলেন।

প্রতারণার জন্য বিষকিষণকে দণ্ডপ্রদান

ঠাকুরের চরিত্রে 'মৃদূনি কুসুমাদপি বজ্রাদপি কঠোরাণি' স্বভাব প্রকটিত। তিনি স্বভাবত অত্যন্ত মৃদুস্বভাববিশিষ্ট হলেও কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। উড়িষ্যার একটি ঘটনা এ সম্পর্কে উল্লিখিত হলো– ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের 'বিষকিসণ' নামে এক খণ্ডাইত বংশীয় ব্যক্তি যোগবলে কিছু শক্তি সঞ্চয় করে নিজেকে 'মহাবিষ্ণুর অবতার' বলে প্রচার করছিল। বিষকিষণ ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি একটি বনের প্রান্তদেশে দলবল নিয়ে অবস্থান করতো। সে ঘোষণা করল যে, সে ১৪ চৈত্র চতুর্ভুজ মূর্তি প্রকট করে পৃথিবীকে ম্লেচ্ছদের হাত থেকে উদ্ধার করবে ও ধর্ম সংস্থাপন করবে। তার প্রচারিত ঘোষণা–

বনেরে অছি বিষকিষণ, গুপ্তরে আছি ন জানই আন।
১৩ মীনরে আরম্ভিব রণ, চতুর্ভুজ হোই নাশিব ম্লেচ্ছগণ ॥

সে যোগবলে অনেক ব্যক্তির কঠিন ব্যাধি নিরাময় করে এবং বহু অসাধ্য সাধন রূপ বিভূতি দেখিয়ে অনেক লোকের মৃত্যু হরণ করল। পরে পূর্ণিমা তিথির নিশাকালে সে রাসলীলা করবে বলে পল্লীর রমণীদের কাছে সংবাদ পাঠাল। ভৃঙ্গার কুলের চৌধুরী মহিলাদের উপর দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হলে তাদের পুরুষ অভিভাবকগণ কমিশনার রেভন্স সাহেবের নিকট একযোগে পেশ করলেন। কমিশনার সাহেব উক্ত বিষয়ের বিচার-ভার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপর ন্যস্ত করলেন। ঠাকুর এক রাতে বনে গিয়ে বিষকিষণের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে ঐরূপ অনুচিত কার্য থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। বিষকিষণ নিজেকে জীবন্ত মহাবিষ্ণু এবং শ্রী জগন্নাথদেবকে অচেতন কাঠ এরূপ জানিয়ে নানাপ্রকার তোষামোদ বাক্যে ঠাকুরের

সন্তোষ বর্ধনের চেষ্টা করল। বিষকিষণ কিছুতেই তার লোকপ্রতারণা কার্য হতে নিবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা না করায় ঠাকুর তাকে গ্রেফতার করে পুরীতে নিয়ে এলেন। সেই যোগীর প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ঠাকুর উড়িষ্যার বিভিন্ন পল্লী, বৌদ্ধবিহার ভূমি খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানসমূহে গিয়েছিলেন। অনুসন্ধানের দ্বারা বিষকিষণের কপট আচরণ প্রমাণিত হলে ঠাকুর তাকে দণ্ডবিধানের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। সেই যোগী বিষকিষণ বিচারকালে ঠাকুরকে অনেক প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে এবং ঠাকুরের দৈহিক এবং পারিবারিক ব্যাধি সংঘটন করায়। কিন্তু ঠাকুর অত্যন্ত কঠোর বিচার অবলম্বন করে ঐসকল দৌরাত্ম্য অগ্রাহ্য করে বিষকিষণের দেড় বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। বিষকিষণ ২১ দিন পর্যন্ত জলবিন্দু গ্রহণ না করে দেহত্যাগ করে। যাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মার অবতার এবং খুরদায় আরেকজন নিজেকে বলদেবের অবতার বলে ঘোষণা করেছিল। বিষকিষণের ন্যায় তাদেরও শাস্তি হয়।

নীলাচলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর পুরীতে অবস্থানকালে (১৮৬৯–১৮৭৪) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি রচিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল জীবগোস্বামী রচিত ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীল বিদ্যাভূষণ রচিত বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ, শ্রীল রূপগোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিশেষভাবে আলোচনা, অধ্যয়ন এবং সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঁচ প্রকার মুখ্য ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে 'ভাগবত শ্রবণের' কথা নির্দেশ করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শাস্ত্র আলোচনার বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপনের জন্য শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে 'ভগবত-সংসৎ' নামে এক বৈষ্ণবসভা সংস্থাপন করেন। ঠাকুরের মুখপদ্মনিঃসৃত ভাগবত ব্যাখ্যা; শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপরমানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ ও মহান্ত শ্রীনারায়ণ শ্রবণ করতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ভাগবত শ্রবণের আদর্শ প্রদর্শন করেছিলেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত আলোচনা ও শ্রবণ করতেন। হাতি-আখড়ার কাস্থাধারী শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস বাবাজি ঠাকুরের সভায় বিরোধিতা করে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সেই ব্যাধি থেকে মুক্ত হন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে মায়াবাদী-শাসক-ব্রাহ্মণগণের মুক্তিমণ্ডপে না বসে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের কাছে অবস্থান করে ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করতেন। মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করতে আসতেন। ঠাকুর সে স্থানটিকে 'ভক্তিপ্রাঙ্গণ' বা 'ভক্তিমণ্ডপ' নাম দিয়েছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশেষভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ আলোচনা করেছিলেন। পুরীতে সিদ্ধবৈষ্ণব শ্রীস্বরূপদাস বাবাজি মহারাজের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন। পুরীতে অবস্থানকালে তিনি 'দত্তকৌস্তুভ' নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অনেক শ্লোকও সে সময় রচনা করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব

পুরীর আঢ্য পরিবার গ্র্যান্ড রোডের দক্ষিণপাশে মঠের জমি ইজারা নিয়ে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। সেই গৃহে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবস্থান করতেন। স্থানটি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটস্থ নারায়ণ-ছাতা সংলগ্ন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দে, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ২৫ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে বিকেল সাড়ে তিনটার পর ঠাকুরের হরিকীর্তন মুখরিত বাসভবনে শ্রীভগবতীদেবীর কোলে এক জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি শিশুর আবির্ভাব হয়। শিশুর আবির্ভাবের পর গায়ে স্বাভাবিক উপবীত দেখতে পেয়ে সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে ঠাকুর শিশুর নামকরণ করলেন শ্রীবিমলাপ্রসাদ। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের দ্বারা তাঁর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হয়েছিল। এ মহাপুরুষই পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুররূপে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর আবির্ভাবের দশ মাস পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভগবতী দেবী ও শিশু বিমলাপ্রসাদসহ পুরুষোত্তধাম থেকে পাল্কীর-ভাকে স্থলপথে বঙ্গদেশের রানাঘাটে এসে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অবস্থিতি এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থায় তাঁর নিয়োগ শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাক্রমেই সংঘটিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অবলম্বন করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবের পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মাধ্যমে পুরুষোত্তম ধাম থেকে পাশ্চাত্যদেশসহ সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি রচিত পদ্মপুরাণোক্ত 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমতাৎ' বাক্যেও যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসমোর্ধ্ব অবদান

সনাতন ধর্মাবলম্বী সমস্ত সম্প্রদায়ের মূল গুরু শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি নিজে আচরণ করে নিত্য শান্তির পথ নির্দেশ করেছেন। মহামুনি শ্রীবেদব্যাস বেদান্ত, ১৮ পুরাণ, মহাভারত, মহাভারতের গীতা লিখেও শান্তি লাভ করতে পারেননি, সর্বশেষে বদরিকাশ্রমে শ্রীনারদ মুনির উপদেশে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে– দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত লিখে পরাশান্তি লাভ করলেন। সেই সর্বোত্তম ভাগবতধর্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের অন্তর্ধানের পর শুদ্ধভক্তি-পথ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে রুদ্ধ হলো। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবতীর্ণ হয়ে বহু গ্রন্থ লিখে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে প্রচার করে সেসমস্ত শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করেন এবং এর মাধ্যমে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানরূপ যে করুণা তিনি প্রদর্শন করেছেন তা অসমোর্ধ্ব। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি প্রচার হয় না। ভগবানের পার্ষদ ব্যতীত এমন অদ্ভুত শক্তির প্রাকট্য সম্ভব নয়। তিনি বাহ্যে গার্হস্থ্য-লীলাতে সরকারের শাসন বিভাগের দায়িত্বশীল কার্যে নিযুক্ত থেকেও কী করে বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ

লিখলেন এবং প্রচার করলেন, তা-ও বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর লেখনীর প্রতিটি শব্দই শাস্ত্র, যা চিত্তে ভগবৎ ভাবনার উদয় করে। জাগতিক অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও এমন লেখা সম্ভব নয়। তিনি গ্রন্থ লিখে স্থায়ীভাবে সর্বজীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যা পরবর্তীকালে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের এক শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

পুনরায় প্রচার-ভ্রমণ লীলা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের পর পুরী থেকে গৌড়দেশে ফিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির সিদ্ধান্তবাণী প্রচারলীলা এবং তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেছেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে গৌরপার্ষদ অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন করে বাংলাদেশে যশোর জেলায়, নড়াইল হয়ে কলকাতা, প্রয়াগ তারপর বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ব্রজমণ্ডলের তীর্থযাত্রীগণের উপর কঞ্ঝড় নামক দস্যু সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য বিনষ্ট হয়। তারপর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ভক্তিভবন নির্মাণ করেন। ভবনের ভিত্তি খননকালে সেখানে কূর্মদেবের মূর্তি প্রকাশিত হন এবং সরস্বতী ঠাকুরকে কূর্মদেবের অর্চনশিক্ষা প্রদান করেন। তারপর বারাসাত মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর পদ গ্রহণ করেন। কুলিনগ্রামে নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনাম সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ এবং সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহমন্ত্র প্রদান করেন। তারপর তিনি বিশ্ববৈষ্ণবসভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করেন।

একদিন সন্ধ্যার পর শহর নবদ্বীপে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহের ছাদে উঠে ধামের সৌন্দর্য দর্শনকালে রাত ১০টায় অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তর দিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দর্শন করলেন। ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থিত বিমলাপ্রসাদও তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। পরদিন প্রাতে উক্ত স্থানটি বল্লাদিঘী বলে জানা গেল, সেখানকার স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, এটি মহাপ্রভুর জন্মস্থান। পরে পুরাতন নথিপত্র ও ম্যাপাদি দেখে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সুনিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, স্থানটি মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি।

তারপর তিনি বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের ভজন কুটির দর্শন করেন। কলকাতার শিশির ঘোষ মহাশয় ঠাকুরকে জ্যেষ্ঠ ও গুরুবুদ্ধি করতেন এবং ভক্তিভবনে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শিশিরবাবু সপ্তম গোস্বামী বলতেন। ঠাকুরের প্রেরণায় শিশিরবাবু তুলসীমালায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন। মি. মলরো সাহেব, মি.বেভোওয়ালেশ ও মি. বাটলার প্রভৃতি ইংরেজগণ ঠাকুরের ভাষণ শুনতেন। আমলাজোড়া গ্রামে বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ

হয় এবং হরিবাসর তিথিতে সেখানে সমস্ত রাত্রি জাগরণ ও হরিনাম সংকীর্তন করেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবন হতে কানপুর এলাহাবাদ হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ভক্তিভবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের আনুগত্যে তিনি শ্রীগোদ্রুমে হরিকীর্তন মহোৎসব করেন। এ সময়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দেশ করেন। এ সময় আচার্যাভিমানকারী কোনো গোস্বামী সন্তান শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদে শূদ্রবুদ্ধি করলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে সবাইকে হুঁশিয়ারি প্রদান করে জানালেন,

বৈষ্ণবচরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি।

তারপরই ঠাকুর ভক্তিভবনের সম্মুখে গুরুপরম্পরা লিখে টানিয়ে দিয়েছিলেন।
কৃষ্ণনগরে এক সভায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে নিত্যসেবা প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভা সংস্থাপন করেন। ঠাকুরের অনুমোদনে মায়াপুরে সংগৃহীত ভূমিতে তৃণ-আচ্ছাদন-নির্মিত গৃহে শ্রীশ্রী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব বিপুল সংকীর্তন সহযোগে সম্পন্ন হয়।

সরকারি কাজ হতে অবসর গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণনগর হতে তিনি গোদ্রুম সুরভিকুঞ্জে মাসব্যাপী শাস্ত্রালোচনা করেন। ১৮৯৮ সালে শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে নিয়ে কাশী ও প্রয়াগ দর্শন করে আসেন। ১৮৯৯ সালে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে গৃহ নির্মিত হলে ঠাকুর সেখানে এসে ভজনাদর্শ প্রদর্শন করেন। সে সময় ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ সেখানে আসতেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ সেখানেই হয়।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটে ভক্তিকুটীর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ভক্তিকুটীতে ঠাকুরের নিকট শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। ঠাকুর নবদ্বীপে ফিরে এলে কুলিয়ায় শ্রীবংশীদাস বাবাজি মহারাজের দর্শন লাভ হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুর কলকাতায় এসে পুনরায় গোদ্রুম স্বরূপগঞ্জে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে অবস্থান করে ভজন করতে থাকেন। তারপর তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীরাধামাধবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রমধর্ম পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এ সময় সৎক্রিয়াসার দীপিকার বিধান অনুসারে শ্রী জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ, শ্রী সীতানাথ মহাপাত্র, শ্রী বসন্ত কুমার ঘোষ, শ্রীমন্মথনাথ রায় উপনয়ন সংস্কারসহ ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হলেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে গোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে 'স্বনিয়মদ্বাদশমকম্' গ্রন্থ রচনাকালে

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সকলেই বিরহব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থ লীলার মধ্যেও তিনি গৌরবাণী প্রচারে অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করলেন, চলার সামর্থ্য না থাকলেও ঘোড়ায় চড়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত এবং আচরিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

মেদিনীপুর বালিঘাইতে বিচারসভায় সরস্বতী ঠাকুরকে প্রেরণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অন্তর্ধানের তিন বছর পূর্বে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদসমূহ খণ্ডন করে 'জীবের বাস্তব কল্যাণ বিধান কে করবে?' –এ চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর অযোগ্য ভৃত্যরূপে উক্ত কার্য সম্পাদন করবেন বলে সঙ্কল্প প্রকাশ করলে ঠাকুর তা শ্রবণ করে তাঁর হৃদয়ের পরম উল্লাসভাব প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর হতে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেদিনীপুর বালিঘাই উদ্ধবপুরে গোপীবল্লভপুরের শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামীর সভাপতিত্বে যে বিচার সভা আয়োজিত হয়েছিল, তাতে যোগদানের জন্য ঠাকুর শ্রীসরস্বতী গোস্বামীকে শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। সেই বিচারসভায় বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘেরার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম এবং বহু স্বনামধন্য পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব'-এর তারতম্যমূলক অপূর্ব গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করে পণ্ডিতবর্গকে নির্বাক ও মুগ্ধ করেছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীল মধুসুদন গোস্বামী মহাশয় কলকাতায় ভক্তিভবনে ঠাকুরের কাছে পরম উৎসাহের সাথে ঘোষণা করলেন যে, শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোভিলাষ-সেবা সম্পাদনে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রক্ষা বিধানে অবশ্যই সমর্থ হবেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঠাকুরকৃত অমৃত-প্রবাহভাষ্যের অনুসরণে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী রচিত কিয়দংশের অনুভাষ্য শ্রবণ করে ঠাকুর অপ্রাকৃত আনন্দলাভ করেছিলেন। ঠাকুর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অপ্রকটের পূর্বে কিছুদিনের জন্য কলকাতা ভক্তিভবন হতে গোদ্রুমে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরের পরমহংসবেশ গ্রহণ

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গূঢ়প্রেমরস আস্বাদনে সর্বক্ষণ নিবিষ্ট থাকার জন্য ঠাকুর শ্রীভাগবত পরমহংসবেশ গ্রহণ করেছিলেন।

ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন, ১৩২১ সনের ৯ আষাঢ় শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলকাতায় ভক্তিভবনে গৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকটতিথিবাসরে শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবিষ্ট হলেন। ঠাকুরের অপ্রকটের ছয় বছর পর পরমপূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী শ্রীভগবতী দেবী ভক্তিভবনে অন্তর্ধানলীলা প্রকট করলেন।
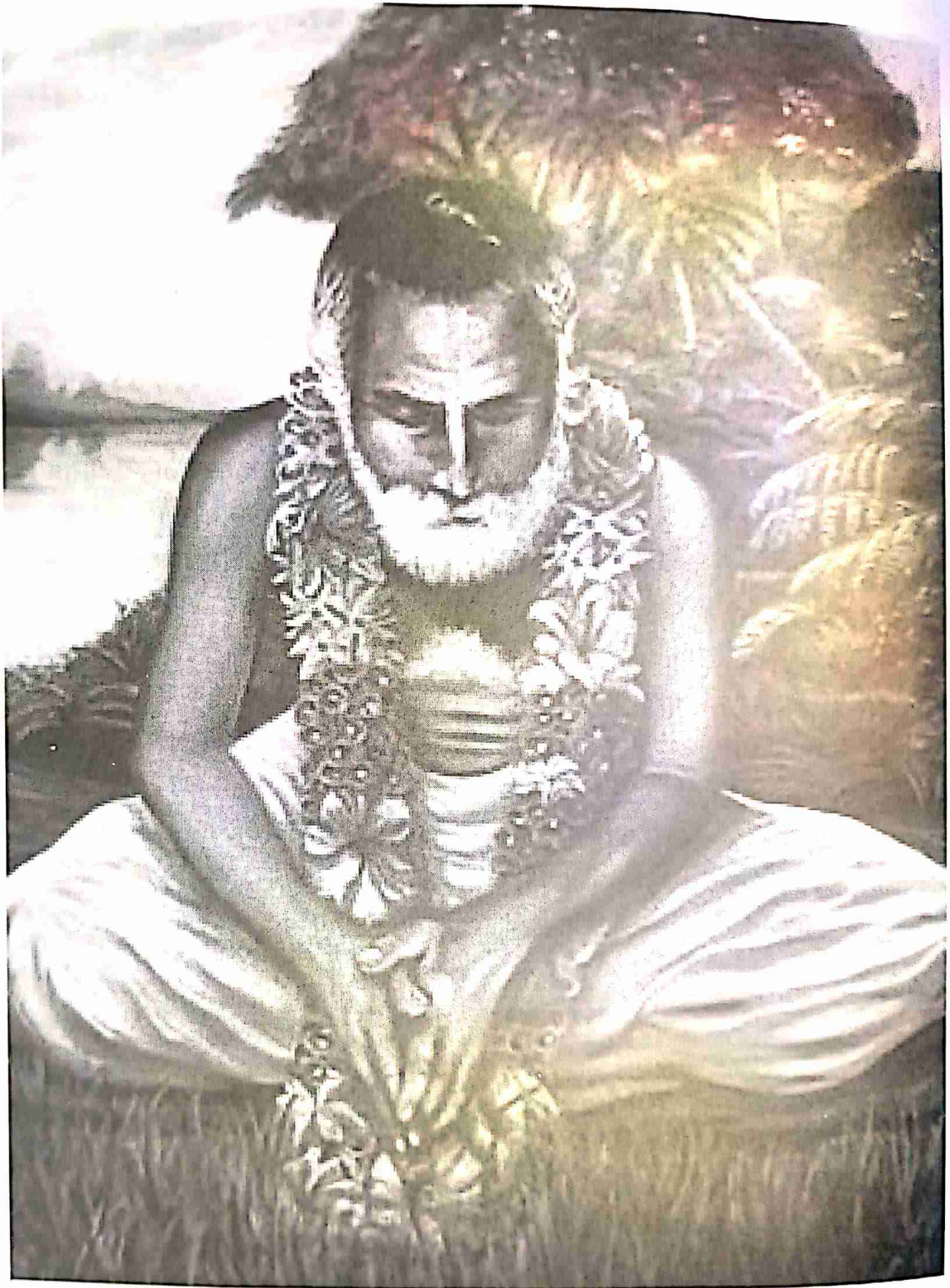
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ

জন্ম ও পরিচয়

পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের আবির্ভাব স্থান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলার নিকটে পদ্মানদীর তটবর্তী 'বাগযান' গ্রামে। তাঁর আর্বিভাবকাল অষ্টবিংশ শতাব্দীতে, প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে। তাঁর পিতা-মাতার নাম জানা যায়নি। বাবাজি মহারাজের পিতার দেয়া পূর্বনাম ছিল 'বংশীদাস'। তাঁর বিশেষ পরিচয়- তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দীক্ষাগুরু।

সমাজের তৎকালীন প্রথা অনুসারে পিতামাতা বাল্যকালেই বংশীদাসের বিবাহকার্য সম্পাদন করলেও বংশীদাস সর্বদা সংসারবিরক্ত ও ভগবদ্‌বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় গৃহে অবস্থান করতেন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি কঠোর বৈরাগ্যের সাথে ভজনানন্দী ঠাকুরের ন্যায় ভগবদ্ভজনের জন্য শ্রীমৎ ভাগবতদাস বাবাজি মহারাজের নিকট পরমহংস বাবাজির বেশ গ্রহণ করে 'শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ' নামে খ্যাত হন। শ্রীমৎ ভাগবতদাস বাবাজি মহারাজ- বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের বেশ-শিষ্য ছিলেন। বেশাশ্রয়ের পর শ্রীল বাবাজি মহারাজ ত্রিশ বছরব্যাপী ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কঠোর ভজন-সাধন করেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি উত্তর ভারতের ও গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ দর্শন করে আসতেন। তীর্থ-পর্যটনকালে বাবাজি মহারাজের সাথে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজি, কালনায় শ্রীভগবানদাস বাবাজি ও কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির সাক্ষাৎ হয়।

বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন

১৩০০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠের প্রকাশ হয়, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজি মহারাজের নির্দেশক্রমে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ ব্রজমণ্ডল থেকে গৌড়মণ্ডলে আসেন। তাঁর অপ্রকটকাল পর্যন্ত তিনি মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি অপ্রাকৃত নেত্রে নবদ্বীপমণ্ডলের অধিবাসীদের ধামবাসীরূপে দর্শন করে মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁদের পরিত্যক্ত মৃৎভাণ্ডে রন্ধন করে কোনোমতে জীবনধারণ করতেন। এরূপ শোনা যায় যে, তিনি কখনো গঙ্গাজলে, কখনো গঙ্গামৃত্তিকা, কখনোবা অভুক্ত অবস্থায় থেকেও নিরন্তর হরিনাম করতেন। বিবিক্তানন্দী ত্যক্তাশ্রমী জীবনের আদর্শস্বরূপ তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করতেন। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজের অসামান্য বৈরাগ্য, শুদ্ধভক্তি ও ভগবদনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাবাজি মহারাজ মাঝে মাঝে গোদ্রুমদ্বীপস্থ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলয় স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে

এসে বাস করতেন এবং ঠাকুরের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করতেন।

বাবাজি মহারাজ কখনো কারো কাছ থেকে কোনো সেবা গ্রহণ করতেন না। তিনি সর্বক্ষণ– কখনো তুলসীর মালা, কখনোবা ছিন্নবস্ত্রগ্রন্থিযুক্ত মালা ধারণ করে হরিনাম করতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থ তাঁর যথাসর্বস্ব ছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের ন্যায় বাবাজি মহারাজের বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য– কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ।

সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দীক্ষাদান

১৮৯৮ সালে গোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের সাথে সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে সময় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের শ্রীমুখে ব্যাকুল হৃদয়ে কীর্তিত গান শুনে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মুগ্ধ ও প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি সেই গানটি লিখে রাখায় পরবর্তীতে ভক্তগণ তা পেয়ে কৃতার্থ হন। গানটি ছিল এরূপ–

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে। রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে। তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে ॥
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনি রাধে রাধে। রাধে কানুমনোমোহিনী রাধে রাধে ॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে। রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে ॥

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশক্রমে গোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের একমাত্র শিষ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। বিবিক্তানন্দী শ্রীল বাবাজি মহারাজের সঙ্কল্প ছিল কাউকে মন্ত্র দিবেন না। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুরের অনন্য ভক্তিনিষ্ঠায় তিনি তাঁর সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শোনা যায় যে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বাবাজি মহারাজের নিকট দীক্ষার জন্য বারবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে বাবাজি মহারাজ প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি হলে মন্ত্র দিবেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, মহাপ্রভুকে তিনি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন। সরস্বতী ঠাকুর হতাশ না হয়ে তৃতীয়বার এসে নিবেদন করলেন। বাবাজি মহারাজ বললেন, "সুনীতি, পাণ্ডিত্য এসবের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, দীক্ষা গ্রহণে অধিকার হয় না।" বাবাজি মহারাজের দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও সরস্বতী ঠাকুর তাঁর নিষ্ঠা পরিত্যাগ করলেন না। শ্রীরামানুজাচার্য আঠারোবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গোষ্ঠীপূর্ণের কৃপা লাভ করেছিলেন। তদ্রূপ সরস্বতী ঠাকুরও অসীম ধৈর্য ধারণপূর্বক বারবার দৈন্য-আর্তি জ্ঞাপন করতে থাকলে বাবাজি মহারাজ অবশেষে সুপ্রসন্নচিত্তে স্নেহাবিষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত করে দীক্ষা প্রদান করলেন। কপট বিষয়ী ব্যক্তিগণ শ্রীল বাবাজি মহারাজের চরণ স্পর্শ করলে, বাবাজি মহারাজ ক্রোধলীলা প্রদর্শন করে বলতেন, "তোর সর্বনাশ হবে।" এজন্য অনেকে ভয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করতেন না। কিন্তু তিনি স্নেহাবিষ্ট হয়ে

আজ নিজের পদধূলি নিয়ে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অঙ্গে লেপন করলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিজজনদের কাছ থেকে শোনা যায় যে, তিনি ১২ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ত্রয়োদশ বারে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের কৃপা লাভ করেছিলেন। এ স্থলে বিবিক্তানন্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ লীলার স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। গুরুতে অনন্যনিষ্ঠাই সৎ শিষ্যের লক্ষণ। শ্রীল বাবাজি মহারাজ সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে যোগ্য বিবেচনায় আশীর্বাদ করে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য আদেশ প্রদান করলেন।

বাবাজি মহারাজ সম্বন্ধে সরস্বতী ঠাকুরের উক্তি

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অত্যন্ত দৈন্যোক্তি দ্বারা জগদ্বাসীকে নিশ্চিত মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজ গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ সম্বন্ধে লিখেছিলেন– "আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ভ অনেক বিষয় হস্তগত করতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করতাম, বিষয় পেলেই আমার অভাব পুরণ হবে। অনেক সময় অনেক দুর্লভ বিষয় লাভ করলাম, কিন্তু আমার অভাব দূর হলো না। জগতে অনেক মহৎচরিত্র ব্যক্তি পেলাম; কিন্তু তাঁদের নানা অভাব দেখে তাঁদের সম্মান দিতে পারলাম না। এমন দুর্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হবার অনুমতি দিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়েও জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করতে করতে নিজমঙ্গলময়-শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পেয়েছিলাম। তাঁর কাছেই আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করতেন এবং অনেক সময় তাঁর নিকট থাকতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হয়ে আমার প্রভুকে দেখিয়ে দেন। প্রভুকে দেখার পর থেকেই আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস পেতে থাকে। আমি জানতাম, নরাকার ধারণ করে সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম, কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে আমি ক্রমশ জানতে পারলাম যে, আদর্শ বৈষ্ণব জড়জগতেও থাকতে পারেন।"

তিনি আরো লিখেছেন– "তাঁকে দেখার পরও অনেক অর্বাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁর দর্শন লাভ করতে পারেনি। এটিই কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। শত শত অন্যাভিলাষী তাঁর নিকট নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পেতেন সত্য; কিন্তু সেই উপদেশগুলোই তাদের বঞ্চনাকারক। অসংখ্য লোক সাধু বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হতে বহুদূরে অবস্থান করে থাকে। আমার প্রভু তাদের মতো কপট ছিলেন না। নির্বলীকতাই (অকপটতাই) যে সত্য, তা তাঁর অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয়, যা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর প্রতিদ্বন্দী বা বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রকার বিতৃষ্ণা ছিল না, কৃপাপাত্রের প্রতিও কোনো বাহ্য অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলতেন– 'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেউ নেই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরো এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তি-ধর্মবিরোধী ছলপরায়ণ অনেকগুলো প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝে সর্বদা তাঁকে বেষ্টন করে থাকত এবং নিজেদের

সেসব সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করে কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকত। কিন্তু তিনি তাদের প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেননি, আবার তাদের কোনো প্রকারে গ্রহণও করেননি।"

বাবাজি মহারাজের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রবল। তিনি বহু দূরের ঘটনাসমূহ দর্শন করতেন এবং লোকচরিত্র বুঝতে পারতেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক বাবাজির সমাধিকৃত্য

১৩২২ বঙ্গাব্দ ৩০ কার্তিক শেষরাতে পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজি মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। বাবাজি মহারাজ অপ্রকটের পূর্বে কুলিয়ায় রাণীর ধর্মশালায় অবস্থান করতেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত সংবাদ পেয়ে বিরহব্যাকুল হৃদয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন বিভিন্ন আখড়ার মহান্ত বাবাজিগণ শ্রীল বাবাজি মহারাজের সমাধি কীভাবে হবে তা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছেন। ভেকধারী বাবাজিগণের অভিপ্রায়– যদি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের মতো মহাপুরুষের সমাধি দিতে তাঁরা সমর্থ হন এবং তাতে সমাধিমন্দির নির্মিত হয়, তাহলে তাঁদের অর্থাগমের একটি রাস্তা হবে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একাকী দণ্ডায়মান হয়ে এ অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। গোলযোগ বৃদ্ধি হলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় নবদ্বীপের দারোগা রায়বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় উপস্থিত হলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তখনও ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেননি। ভেকধারী বাবাজিগণের যুক্তি– তাঁরা ত্যক্তাশ্রমী বাবাজি, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের সামাধিকৃত্য সম্পাদন করার অধিকার কেবল তাঁদেরই। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সন্ন্যাসী নন, তাঁর অধিকার নেই। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁর মহাপুরুষোচিত মহাতেজস্বী রূপ প্রকাশ করে বললেন, তিনিই একমাত্র বাবাজি মহারাজের শিষ্য। যদি ভেকধারী বাবাজিগণ গত এক বছরের মধ্যে, গত ছয় মাসের মধ্যে, গত তিন মাসের মধ্যে অথবা একমাসের মধ্যে, কিংবা তিন দিনের মধ্যেও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে থাকেন তাহলে তাঁরা শ্রীল গুরুদেবের চিন্ময় কলেবর স্পর্শ করবেন না, করলে তাদের সর্বনাশ হবে। এ কথা শুনে দারোগা যতীন্দ্রবাবু বললেন– "মহান্ত বাবাজিগণ স্ত্রীসঙ্গ করেছেন কিনা তার প্রমাণ কী?" সরস্বতী ঠাকুর বললেন– "তাঁদের কথাই আমি বিশ্বাস করব।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের মহাতেজস্বী রূপ দেখে বাবাজিগণ সেখান থেকে ধীরে ধীরে পলায়ন করলেন। দারোগাবাবু তা দর্শনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলে গেলেন।

কুলিয়ার কতিপয় ব্যক্তি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বাবাজি মহারাজের শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে বললেন– বাবাজি মহারাজ অপ্রকটের পূর্বে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন যে, তাঁর কলেবরকে নবদ্বীপধামের রাস্তা দিয়ে টেনে টেনে যেন ধামের ধূলিতে অভিষিক্ত করা হয়। তা শ্রবণ করে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বললেন– "আমার গুরুদেব, যাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্কন্ধে, মস্তকে ধারণ করলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহির্মুখ লোকের দাম্ভিকতা বিনাশের জন্য দৈন্যভরে যেসকল কথা বলেছেন– আমরা মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হয়েও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বিমুখ হব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের

নির্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ দেহ কোলে করে নৃত্য করেছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করেছিলেন। সুতরাং আমরাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাবাজি মহারাজের চিদানন্দ দেহ মস্তকে বহন করব।"

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কুলিয়ার নতুন চড়ার উপর ১৩২২ বঙ্গাব্দ ১ অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থান একাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধান অনুসারে স্বহস্তে বাবাজি মহারাজের সমাধিকৃত্য সমাপন করলেন। যশোর জেলার লোহাগড়ানিবাসী পোদ্দার মহাশয় সমাধির স্থানটি প্রদানকালে বলেছিলেন, উক্ত স্থানের প্রতি তাঁর কোনো অধিকার থাকবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাক্য বিস্মৃত হয়ে উক্ত স্থানের প্রতি আধিপত্য স্থাপন করে নানা প্রকার অবৈধ কার্যের ইন্ধন দিলে দৈববশত সমাধিস্থানটি ক্রমশ গঙ্গাগর্ভে চলে যেতে থাকে। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ৫ ভাদ্র শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের চিন্ময় সমাধি গঙ্গাগর্ভ হতে উত্তোলন করে শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডের তটে আনয়ন করলে ২ আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সেখানে পুনঃসংস্থাপিত হয়। সেখানে ক্রমশ সমাধিমন্দির নির্মিত ও বাবাজি মহারাজের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন থেকে সেই মন্দিরে নিত্যপূজা সম্পাদিত হচ্ছে।

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিজগণের নিকট শ্রুত বাবাজি মহারাজের শিক্ষামূলক অলৌকিক চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কতিপয় ঘটনাবলী–

(১) কুলিয়া-নবদ্বীপের এক বৈষ্ণববেশধারী ব্যক্তিকে সঙ্গে করে তাঁর অনুগত কতিপয় সঙ্গী গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের নিকট এসে উক্ত ব্যক্তির মহিমা বর্ণন-মুখে বললেন– "আমাদের প্রভু পতিত জীবদের উদ্ধারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে থাকেন, কত কষ্ট করেন। তিনি যদি অন্য দেশে যান, সেই স্থানের গতি কী হবে?" বাবাজি মহারাজ তা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উত্তর করলেন– "লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জগৎ উদ্ধার করার অভিনয় করলে জগতের উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজেই পতিত হবেন, জগৎ-কে বঞ্চনা করবেন।"

(২) কতিপয় ব্যক্তি একজন প্রসিদ্ধ ভাগবতব্যাখ্যাকারের মহিমা কীর্তন করলে বাবাজি মহারাজ অন্তর্যামীসূত্রে সেই ব্যাখ্যাকারের অর্থের বিনিময়ে পাঠ করার উদ্দেশ্য অবগত হয়ে বলেছিলেন– "তিনি ভাগবতশাস্ত্র, গোস্বামীশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণ–শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে থাকেন। তিনি 'গৌর' 'গৌর' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলেন না, তিনি 'টাকা' 'টাকা' বলেন, ওটা কখনো ভজন নয়। এর দ্বারা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম আবৃত হচ্ছে, জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোনো উপকারই হচ্ছে না।"

(৩) একদিন বাবাজি মহারাজ নবদ্বীপমণ্ডলে বসে হরিনাম করছেন, রাত ১০টায় হঠাৎ বলে উঠলেন– "দেখেছ! দেখেছ! একজন পাঠক পাবনা জেলায় গিয়ে এই রাত্রিকালে এক বিধবার ধর্ম নষ্ট করছে। হায়! হায়! এই দুর্দান্ত লোকগুলো ধর্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করছে।" বাবাজি মহারাজ কথাগুলো এমনভাবে বলছিলেন যেন তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করছেন।

(৪) নবদ্বীপে ধর্মশালার অধিকারী গিরিশবাবুর স্ত্রী বাবাজি মহারাজের জন্য একটি কুটির নির্মাণ করে দিতে চাইলে বাবাজি মহারাজ বললেন– "নৌকার ছইয়ের নিচে থাকতে আমার কোনো কষ্ট হয় না। আমার একটা কষ্ট আছে। বহু লোক কপটতা করে আমার কাছে এসে সর্বদা 'কৃপা করো' 'কৃপা করো' বলে আমাকে ভজন করতে দেয় না। তারা নিজের মঙ্গল চায় না, অন্যের ভজনের বিঘ্ন করে। আপনাদের পায়খানার কুটিরটি দিলে আমি সেখানে নিশ্চিন্তে ভজন করতে পারি, কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না।" বাবাজি মহারাজ পায়খানার কুটিরটিতে যাবেন এরূপ মনস্থ করলে গিরীশবাবু গোময়াদির দ্বারা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করে রাজমিস্ত্রীর দ্বারা সেটি সম্পূর্ণ নতুন করে দিলেন।

(৫) কোনো এক ব্যক্তি শীতে কষ্ট হবে বলে বাবাজি মহারাজকে একটি লেপ দিয়েছিলেন। বাবাজি মহারাজ তা ছইয়ের উপর ঝুলিয়ে রাখলেন। তাতে ঐ ব্যক্তি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বাবাজি মহারাজ বললেন, এটা দেখলেই শীত পালাবে।

(৬) এক সময় কাশিমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ স্যার শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীবাহাদুর গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজকে কাশিমবাজারে নিজপ্রাসাদে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে আহ্বান করলে বাবাজি মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন–

"আপনি যদি আমার সঙ্গ কামনা করেন, তাহলে আপনার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে গঙ্গার পাড়ে ছই বেঁধে আমার সঙ্গে বাস করুন। আপনার আহারের চিন্তা করতে হবে না। আমি মাধুকরী করে আপনাকে খাওয়াব। কিন্তু যদি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আমি আমার প্রাসাদে যাই, কয়েকদিন পরই আমার মধ্যে বিষয়প্রবৃত্তি আসবে। অনেক ভূমি সংগ্রহের জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ব। ফলে কী হবে– আমি আপনার হিংসার পাত্র হয়ে উঠব। আপনার সাথে নিত্য প্রণয় রাখতে হলে এবং বৈষ্ণববন্ধু হিসেবে আপনি যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, তাহলে আমাদের উভয়েরই এখানে অপ্রাকৃত ধামে বাস করে মাধুকরী দ্বারা কোনোপ্রকারে জীবন নির্বাহ করে হরিভজন করা কর্তব্য।"

নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলীকীর্তন বাবাজি মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একটি কীর্তন তিনি প্রায়ই করতেন। সমস্ত শিক্ষার সার সেই কীর্তনে রয়েছে।

গোড়া পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম রতনধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপন করমোদোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধফাঁস ॥
বিষয় বিষম-বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কী সুখ লাগিয়া। নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥
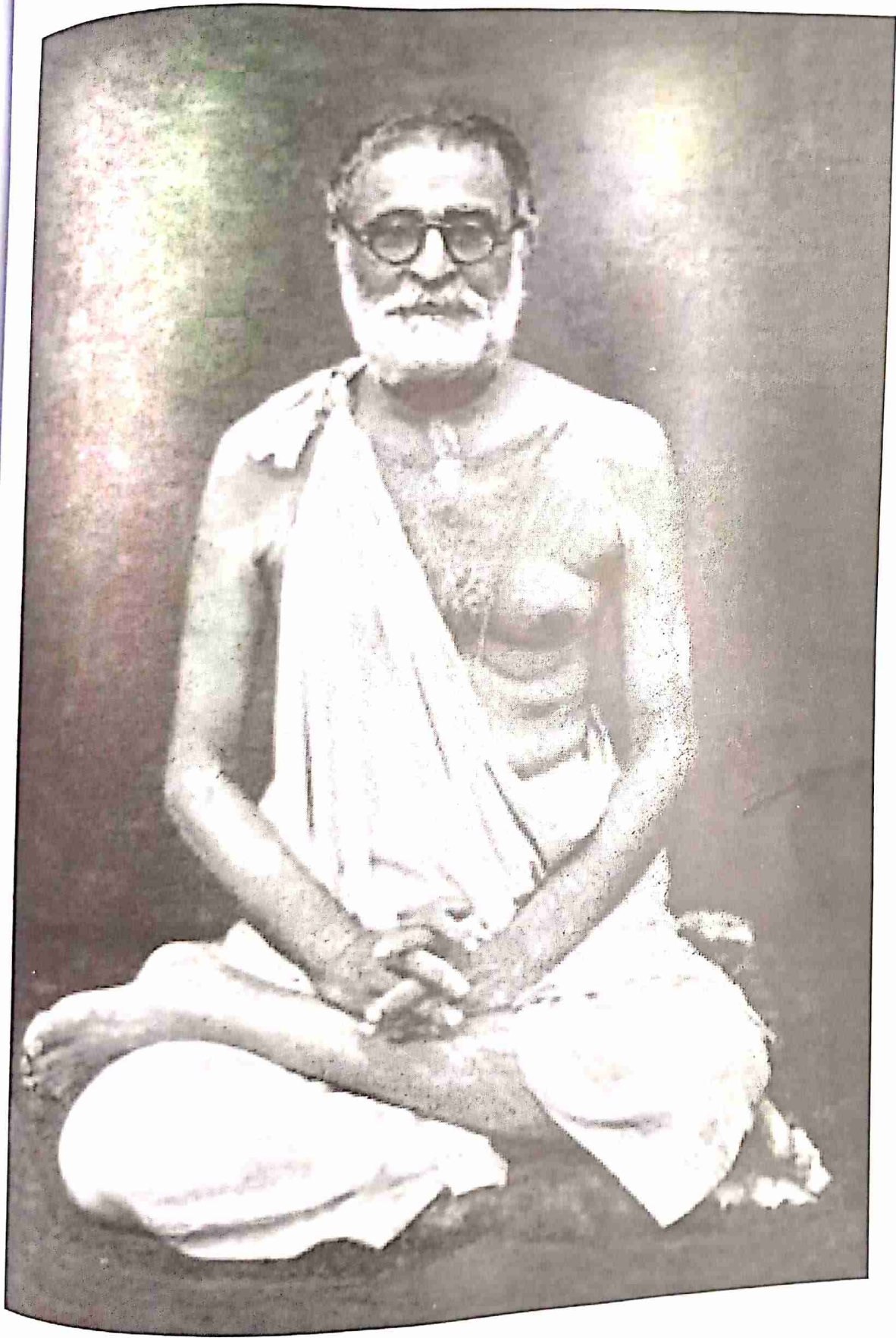
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্তুতে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত হারিণে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে যাঁদের নিত্য সম্পর্ক ছিল তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত ভজনশীল জীবনের কথা বলতে পারেন। জাগতিক কর্মবীর কিংবা ধর্মবীরের মতো তাঁর জীবন গঠিত হয়নি। শিশুকাল থেকে শুদ্ধ ভাগবত সঙ্গে ভাগবত জীবন গঠিত হয়েছিল। জাগতিক চমৎকারিতায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। কিন্তু তিনি এরূপ জড় বিভূতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরং তা ঘৃণা করতেন। সর্ববিভূতিময় ভগবান যাঁদের বশীভূত হন, তাঁদের কোনো বিভূতি লাভ করতে কি আর বাকি থাকে? "সর্বসিদ্ধি তাঁর করতলে।"

পরিচয় ও শৈশবকাল

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করার সময় যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরীধামে শ্রীমন্দির-নিকটে নারায়ণ ছাতা নামক ভবনে বাস করছিলেন, তাঁর গৃহে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। তাঁর মায়ের নাম ছিল শ্রীমতি ভগবতী দেবী। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবিমলা দেবীর প্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়ে নামকরণ করলেন বিমলাপ্রসাদ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয় মাস পর ছিল রথযাত্রা। এই রথযাত্রার সময় তিন দিন শ্রীজগন্নাথের রথ বড় দাঁড়ের উপর সরস্বতী ঠাকুরের জন্মগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন মাতা ভগবতী দেবী শিশুকে নিয়ে রথোপরি আরোহণ করলেন এবং তাকে শ্রীজগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মমূলে ছেড়ে দিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে শিশুটি জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক সে সময় শ্রীজগন্নাথদেবের কণ্ঠ থেকে একটি ফুলের মালা ছিন্ন হয়ে শিশুটির মাথায় এসে পড়লো। তা দেখে পূজারী পাণ্ডাগণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করে উঠলেন। বললেন– "মা, তোমার এ শিশু কালক্রমে মহাপুরুষে পরিণত হবে। শ্রীজগন্নাথদেব একে আশীর্বাদী মালা দিয়েছেন। এ শিশুটিই

জগন্নাথের কথা জগতে প্রচার করবে"। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শুনে মা আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিশুকে কোলে নিলেন এবং বারবার ব্রাহ্মণ এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে বন্দনা করতে লাগলেন। আবির্ভাবের পর শিশুটি তাঁর মায়ের সাথে ছয় মাস পুরীতে থাকার পর পালকিতে চড়ে স্থল পথে রানাঘাটে উপনীত হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান সদাচারসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীভগবতী দেবীও তেমনি সদগুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁরা ছেলেমেয়েদের কখনো ভগবত প্রসাদ ছাড়া অন্যকিছু খেতে দিতেন না। কোনো অসৎ সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। ১৮৮১ সালে কলকাতার রামবাগানে ভক্তি ভবনের ভিত্তি খননকালে শ্রীকূর্মদেবের একটি বিগ্রহ প্রকট হয়। সাত বছর বয়স্ক শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম ও মন্ত্র দিয়ে সেই কূর্মদেবের সেবা করার নির্দেশ দিলেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

১৮৮৪ সালের ১ এপ্রিল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরামপুরের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। এ সময় সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করানো হয়। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি বিকৃন্তি বা Bicanto নামে এক নতুন লেখন প্রণালী আবিষ্কার করেন। এ সময় তিনি পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চূড়ামণির নিকট গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তিনি লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন দর্শন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। এ সময় তিনি পৃথ্বীধর শর্মার নিকট বেদ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বেশিদিন কলেজে অধ্যয়ন করতে পারলেন না। কলেজ ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন– "আমি যদি মনোযোগ সহকারে বিদ্যালয়ে পাঠ শিক্ষা করিতে থাকি তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে। আর যদি মূর্খ অকর্মণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে না।" ছাত্র জীবনে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমার্থিক প্রবন্ধাদি লিখতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে গৌড়মন্ডলে বিভিন্ন গৌরপার্ষদদের শ্রীপাট দর্শন করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করার সময় পৃথকভাবে 'ভক্তিভবনে' পণ্ডিত পৃথ্বীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়ন করেন। অল্প কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি ভক্তিভবনে স্বতন্ত্র একটি সারস্বত 'চতুষ্পাঠী' স্থাপন করেন। তাতে ছাত্রদের 'জ্যোতির্বিদ', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কিছুদিন স্বাধীন ত্রিপুরা এস্টেটে কর্মরত থেকে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের জীবন চরিত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ প্রকাশের সম্পাদনা করতে লাগলেন। পরে তিনি যুবরাজ ব্রজেন্দ্র কিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কার্য পরিদর্শনের ভার নেন। বৈষয়িক কাজের মধ্যে বিবিধ

প্রকারের হিংসা-দ্বেষ, মাৎসর্য প্রভৃতি দেখে তিনি তা শীঘ্রই ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুর তা অনুমোদন করে তাঁকে পূর্ণ বেতনে পেনশন প্রদান করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তিন বছর পেনশন নিয়ে তা নিজেই বন্ধ করে দেন।

সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান ও কৃপা প্রাপ্তি

১৮৯৮ সালের অক্টোবরে তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে কাশী, প্রয়াগ ও গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কাশীতে শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রীর সাথে রামানুজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে নানা আলাপ-আলোচনা হয়। তখন থেকে তাঁর অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবন বিকশিত হতে থাকে। তিনি মনে মনে সদ্‌গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সিদ্ধবাবা শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করার নির্দেশ দিলেন।

পিতার নির্দেশানুসারে তিনি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজির নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। প্রথম দিন শ্রীল বাবাজি মহারাজ বললেন– "আমি আপনাকে কৃপা করতে পারি কি না মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস না করে বলতে পারব না।" দ্বিতীয় দিন সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল বাবাজি মহারাজের নিকট উপস্থিত হলেন। বাবাজি মহারাজ বললেন– "আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।" তৃতীয় দিন সরস্বতী ঠাকুর উপস্থিত হলে বাবাজি মহারাজ বললেন– "আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন– সুনীতি ও পাণ্ডিত্য ভগবদ্ভক্তির কাছে অতি তুচ্ছ।" তা শুনে সরস্বতী ঠাকুর বললেন– "আপনি কপট চূড়ামণির সেবা করেন তাই বঞ্চনা করছেন, আমায় কৃপা করতে চাননা। গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজ আচার্য আঠারো বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন। আমিও একদিন না একদিন আপনার কৃপা লাভ করব। শ্রীল বাবাজি মহারাজ সরস্বতী ঠাকুরের নিষ্ঠা দেখে গোদ্রুমের স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে তাঁকে ভাগবতী দীক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ সাক্ষাৎ বৈরাগ্য মূর্তি। কাউকে মন্ত্র দীক্ষাদি দিতে চাননি। তিনি গঙ্গার তীরবর্তী বৃক্ষের নিচে বাস করতেন। গঙ্গায় পরিত্যক্ত মৃত ব্যক্তির বস্ত্র কৌপিন রূপে ব্যবহার করতেন। কখনো গঙ্গাজলে চাল ভিজিয়ে লঙ্কা ও লবণ দিয়ে তা খেতেন। কখনো পরিত্যক্ত মাটির পাত্র গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে রান্না করে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে তা গ্রহণ করতেন।

১৯০০ সালের মার্চে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি বালেশ্বর, রেমুনা, ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। স্থানে স্থানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশমতো শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ব্যাখ্যা করেন।

প্রচার কার্যক্রম

১৩২১ বঙ্গাব্দের ৯ আষাঢ় (১৯১৬ খ্রি.) গৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথির দিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলায় প্রবেশ করার পূর্বে সরস্বতী ঠাকুরকে বললেন– "ষড় গোস্বামী গ্রন্থ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা বিশেষভাবে সর্বত্র প্রচার করো। মহাপ্রভুর জন্মস্থানের উন্নতিও করা চাই।" জননী শ্রীভগবতী দেবীও কয়েক বছর

পর পরলোকগমন করেন। যাবার সময় তাঁর হাত ধরে বললেন– "তুমি অবশ্যই আমার গৌরসুন্দরের কথা ও ধাম শ্রীমায়াপুরের সর্বত্রই প্রচার করবে।" শ্রীসরস্বতী ঠাকুর পিতৃমাতৃ আজ্ঞা শিরে ধারণ করে বিপুল উদ্যমে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

ইতোপূর্বে সরস্বতী ঠাকুর মায়াপুরে অবস্থান করে শতকোটি মহামন্ত্র জপ-ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশে আচার্য-সন্তানগণ স্মার্তবাদ দিয়ে বৈষ্ণবদের অবজ্ঞা ও নির্যাতন করছিল। এ বিষয়ে মেদিনীপুর বালীঘাই নামক স্থানে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সভাতে শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীমধুসূদন দাস গোস্বামী ও গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গোস্বামীদের আহ্বানে সরস্বতী ঠাকুরও উপস্থিত হন। সভার কার্য আরম্ভ হলো। স্মার্ত পণ্ডিতগণ নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে থাকলে গোস্বামীদ্বয়ের অনমতিক্রমে সরস্বতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-তত্ত্ব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সরস্বতী ঠাকুরের যথার্থ শাস্ত্রযুক্তিসম্পন্ন সে বক্তৃতা শুনে স্মার্ত আচার্য-সন্তানগণ মোহিত ও আশ্চর্যান্বিত হন। সকলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন।

১৯১২ সালে কাশিম বাজারের মহারাজ শ্রীমনীন্দ্র নন্দী তাঁর গৃহে একটি বৃহৎ বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে মহারাজ সরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সরস্বতী ঠাকুর চারদিন যাবৎ শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু সেখানে তথাকথিত প্রাকৃত সহজিয়াদের সমাবেশ ও কেবল লোকদেখানো ভাব দেখে তিনি চারদিন কিছু ভোজন করেননি। এ চারদিন উপবাস শেষে শ্রীমায়াপুরে এসে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। সেখানে কোনো কোনো লোক তাঁকে ভোজনের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি বলেছিলেন– "অভক্তি বিচার পর বারোয়ারী স্থানে ভোজন করতে নেই।" পরে মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী বিষয়টি বুঝতে পেরে দুঃখিত হন এবং মায়াপুরে আগমন করে তাঁর চরণে অনেক অনুনয় বিনয় করেন।

স্বপ্নযোগে মহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামীর দর্শন লাভ

তখন সারা বাংলাদেশ আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া-নেড়ী, দরবেশ ও সাঁই প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়ারূপ অপসম্প্রদায়ের খুব বাড়াবাড়ি ছিল। সরস্বতী ঠাকুর এসব অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করেন। মহাপ্রভুর নামের কলঙ্ককারী এসব অপসম্প্রদায়কে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দিতেন না। এ সময় অনেক প্রসিদ্ধ গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিও এই প্রাকৃত সহজিয়াদের প্রশ্রয় দিতেন। প্রাকৃত সহজিয়াবাদীর দল যখন পরমহংস গোস্বামী গুরুবর্গের পরমহংস বেশ ধারণপূর্বক জগতকে প্রবঞ্চনা করতে লাগল, তখন সরস্বতী ঠাকুর দুঃখে অসৎসঙ্গ বর্জনপূর্বক নির্জনে ভজন করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন দিব্য মূর্তিতে মহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামী তথা পূর্বতন আচার্যগণ আবির্ভূত হয়ে বললেন– "তুমি নিরুৎসাহী হয়ো না। উৎসাহের সাথে পুনরায় দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করো ও বৈধমার্গের ক্রমবিধিতে ভগবৎ-ভজন প্রণালী প্রচার করো। তিনি সেই দিব্য প্রেরণা পেয়ে সেদিন থেকে বিপুল

উদ্যমে জগতে গৌরবাণী পুনরায় প্রচার করতে শুরু করলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ শ্রীগৌর জয়ন্তীবাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসলীলা প্রবর্তন করলেন। সেদিন শ্রী চন্দ্রশেখর ভবনে 'শ্রীচৈতন্য মঠ' স্থাপন করলেন ও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করলেন।

ঠাকুরের অলৌকিক লীলা

বরিশালের ভোলা নিবাসী হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরোহিনী কুমার ঘোষ হরিভজন করার আশায় সংসার ত্যাগ করে নবদ্বীপের কুলিয়ায় আসেন এবং এক বাউলের চরণাশ্রয় করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষানুসারে চলতে লাগলেন। কিন্তু বাউলদের সেবাদাসীর ব্যাপার দেখে তাঁর মনে ঘৃণা হতে লাগল। রোহিনীবাবু একদিন মায়াপুরে যোগপীঠ দর্শনে এলেন। সেদিন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যোগপীঠে হরিকথা বলছিলেন। রোহিনীবাবু সরস্বতী ঠাকুরের অপূর্ব তেজপুঞ্জ বিশিষ্ট শ্রীমূর্তি এবং অদ্ভুত সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন। সেদিন সরস্বতী ঠাকুরের সমস্ত কথা শুনে তিনি কুলিয়ার বাউল গুরুর আশ্রমে ফিরে এলেন। একটু রাত হয়েছিল। রোহিনীবাবু সরস্বতী ঠাকুরের কাছে যেসসব শুদ্ধভক্তিময়ী কথা শুনেছেন তা চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়লেন। কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নে দেখছেন সেই বাউলটি একটি বাঘ ও সেবাদাসী বাঘিনী হয়ে তাঁকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। রোহিনী বাবু ভয়ে কম্পিত কলেবরে মহাপ্রভুকে ডাকছেন। এমন সময় দেখলেন শ্রীসরস্বতী ঠাকুর তাঁকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করছেন। রোহিনীবাবু সেদিনই চিরতরে বাউল গুরুকে ত্যাগ করে সরস্বতী ঠাকুরের চরণকমলে আশ্রয় করলেন।

শ্রীশ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত (সরস্বতী ঠাকুরের বড় ভাই) দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে ভীষণ মাথাব্যথায় আক্রান্ত হন। তাঁর নির্যাণ দিবসে সরস্বতী ঠাকুর সারা রাত তাঁর কাছে থেকে তাঁকে হরিনাম শুনান। তারপর দেহত্যাগের কিছুপূর্বে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তখন তিনি সরস্বতী ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে শ্রীহরির স্মরণ করতে বললেন। সে সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। অন্নদাপ্রসাদ বাবুর ললাটে এক অপূর্ব রামানুজীয় তিলক চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল। তিনি সকলের সামনে পূর্ব জীবনের কথা বলতে লাগলেন। তিনি রামানুজীয় বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের চরণে কিছু অপরাধ থাকার ফলে তাঁর আবার জন্ম হয়। পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘরে আগমন হয়। এসব কথা বলার পর অন্নদাপ্রসাদ বাবু দেহত্যাগ করেন।

একসময় মায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভজন করছিলেন। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর আগের দিন ঠাকুরের নৈবেদ্য দুগ্ধাদির কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। সরস্বতী ঠাকুর চিন্তা করতে লাগলেন– "আজ দুধ পাওয়া গেলে মহাপ্রভুকে ভোগ দেয়া যেত। পরক্ষণেই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আমার নিজের জন্য এ চিন্তা হলো নাকি? অন্যায় হলো।" তখন ছিল বর্ষাকাল। গৌর জন্মভিটা জলমগ্ন। নৌকা ছাড়া চলা দুষ্কর। এ অবস্থায় দুপুরবেলায় এক গোয়ালা সেই জল-কাদা ভেঙে প্রচুর পরিমাণে দুধ, ক্ষীর, মাখন

ও ছানা প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হলো। জানা গেল যে, গোয়ালিটিকে জমিদার হরিনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় মহাপ্রভুর প্রেরণা দিয়ে এসব জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের ভোগের পর সেই প্রসাদ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের কাছে নেয়া হলো। এত প্রসাদ দেখে তিনি অবাক হলেন। তারপর সব কথা শুনলেন। তারপর তিনি প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন– "আমি আপনাকে কত কষ্টই না দিলাম। কেন আমার এ দুর্বুদ্ধির উদয় হলো? আপনি আমার জন্য অন্যের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে এ সকল দ্রব্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।"

গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে জগৎ মুগ্ধ হলো। তাঁর আকর্ষণে বহু সম্ভ্রান্ত কুলের বিদ্যান ব্যক্তি শ্রীগৌরসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ, মায়াপুর, কলকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রেমুনা, বালেশ্বর, পুরী, আলালনাথ, মাদ্রাজ, কভুর, দিল্লি, পাটনা, গয়া, লক্ষ্মৌ, কাশী, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আসাম, কুরুক্ষেত্র, ভারতের বহির্দেশে রেঙ্গুন ও লন্ডন প্রভৃতি স্থানে ৬৪টি গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। মন্দার পর্বতোপরি শ্রীনৃসিংহাচল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানেও শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করেন। প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ জন ব্যক্তিকে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনি জগতে বৈকুণ্ঠবাণী প্রচারের জন্য বহু শুদ্ধভক্তিময় পত্রিকা প্রকাশ করেন। যেমন: (১) সজ্জনতোষণী বা (The Harmonist) পাক্ষিক পত্রিকা, (২) সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা, (৩) হিন্দি পাক্ষিক ভাগবত নামক পত্রিকা, (৪) দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, (৫) আসামি ভাষায় মাসিক কীর্তন নামক পত্রিকা, (৬) উড়িষ্যা ভাষায় পরমার্থী নামক পত্রিকা। এছাড়াও বহু বৈষ্ণব গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তিনি পারমার্থিক জগতে এক নতুন যুগ আনয়ন করেছিলেন।

নিত্যলীলায় প্রবেশ

তিনি পৃথিবীর সর্বত্র গৌরবাণী প্রচারের জন্য শুদ্ধ-আচরণশীল ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদের প্রেরণ করলেন। মহা উদ্যমে শ্রীগৌরকৃষ্ণের বাণী পৃথিবীতে প্রচার হতে লাগল। তিনি ছয় বছর পর্যন্ত এভাবে উদ্যমে গৌরবাণী প্রচার করে যখন সংকল্প কিছুটা সিদ্ধি হয়েছে দেখলেন তখন হৃষ্ট মনে শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্য সেবায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন। নিত্যলীলায় প্রবেশ করার কিছুদিন পূর্বে তিনি প্রধান শিষ্যগণকে সমবেত করে তাঁদের অনেক আশীর্বাদ প্রদান করলেন। পরিশেষে উপস্থিত অনুপস্থিত ভক্তগণকে আশীর্বাদ করে বললেন– "সকলে রূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সাথে প্রচার করবেন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্ম ধূলি হওয়া আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষা। আপনারা সকলে এক অদ্বয় জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন।" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ এভাবে বহু মূল্যবান উপদেশ, নিয়মনীতি প্রভৃতি প্রদান করে, ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫০, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১ জানুয়ারি ১৯৩৭ সালের শুক্রবার নিশান্তকালে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।
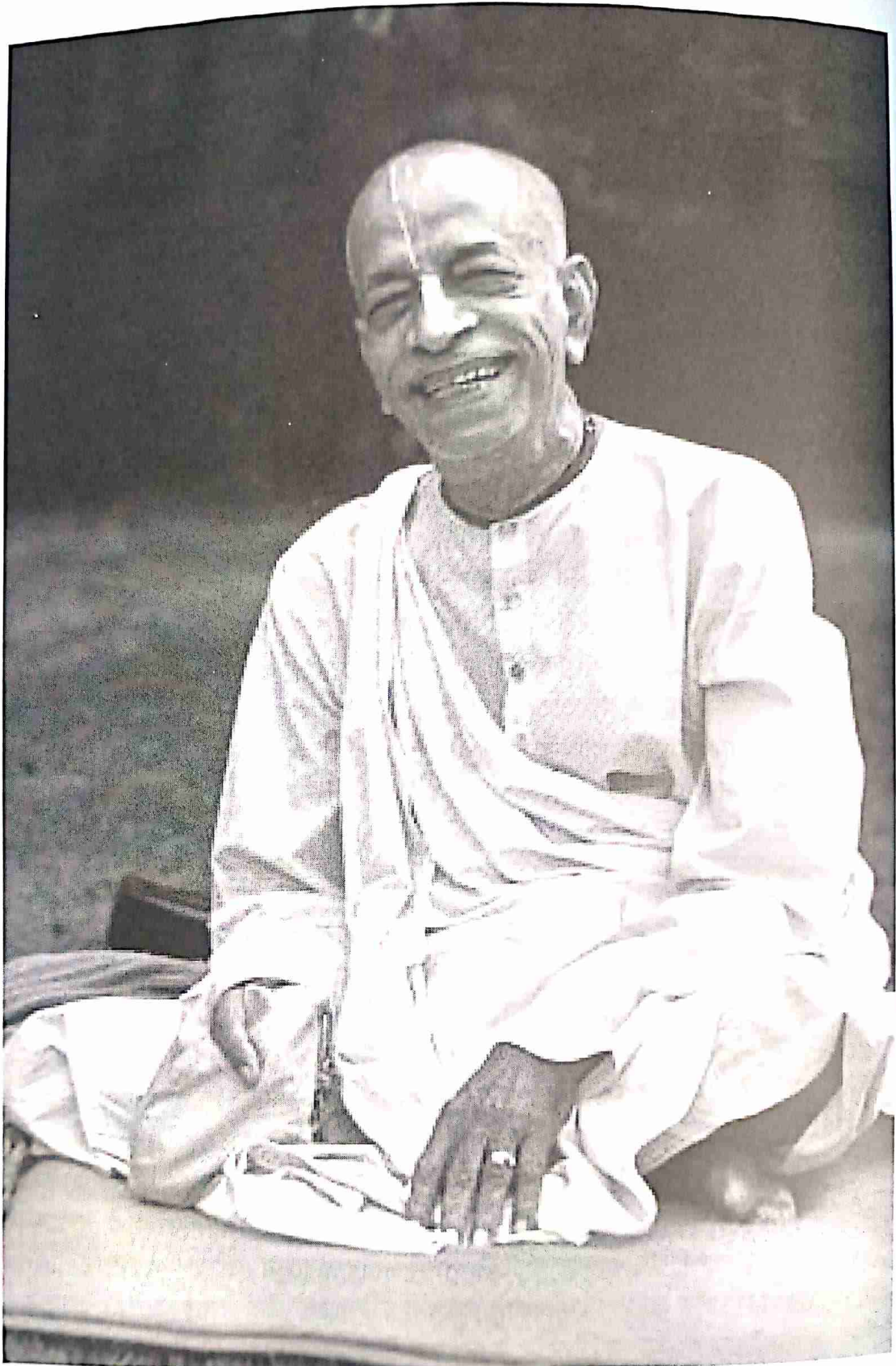
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

সূর্যের যেমন জন্ম-মৃত্যু নেই, তেমনি শ্রীভগবান ও তাঁর পার্ষদদেরও জন্ম-মৃত্যু নেই। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করতে ভগবানেরই আদেশে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হলেন এমনই একজন শুদ্ধ ভক্ত। ১৮৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় তিনি আবির্ভূত হন। অভয়চরণের ১৫১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়িটি ছিল উত্তর কলকাতায়। তাঁর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দে সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক সমাজের একজন সচ্ছল কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল রজনী দেবী। আর তাঁর নাম রাখা হয় অভয়চরণ দে। বাঙালি ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর পিতামাতা এক জ্যোতিষীকে দিয়ে শিশুপুত্রের ঠিকুজি করিয়েছিলেন। সেই জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর বয়স যখন ৭০ বছর হবে তখন তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাবেন, এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি লাভ করবেন এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

বাল্যকাল

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাঁর পুত্রকেও তিনি কৃষ্ণভক্তরূপে মানুষ করে তুলেছিলেন। অভয় ছোট থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবছর কলকাতায় যখন জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব হতো, তা দেখে অভয়চরণ গভীরভাবে অভিভূত হতেন। অভয়চরণ শুনেছিলেন যে, কীভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর রথযাত্রা মহোৎসবে তাঁর পার্ষদদের নিয়ে কীর্তন ও নৃত্য করতেন।

একদিন অভয়চরণের নিজেরই রথযাত্রা মহোৎসব করার ইচ্ছে হলো। পিতা গৌরমোহন তাঁকে তিন ফুট উঁচু একটি ব্যবহৃত রথ এনে দেন। পিতা-পুত্র মিলিত প্রচেষ্টায় ষোলটি কাঠের থাম তাতে জুড়ে দেন এবং তার উপর একটি চাঁদোয়া লাগিয়ে দেন। সেটি যেন ঠিক পুরীর রথেরই একটি ছোট সংস্করণ হয়েছিল।

অভয়চরণের বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর অনুরোধে গৌরমোহন দে ছোট রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তি তাঁকে কিনে দেন এবং তখন থেকে তিনি রাধাকৃষ্ণের পূজা শুরু করেন। ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন নগরীতে রথযাত্রা মহোৎসবের প্রচলন করেন এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর ইস্‌কনের মন্দিরগুলোতে 'রাধাকৃষ্ণ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, যা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে শিখেছিলেন।

শিক্ষাজীবন

অভয়ের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখনই গৌরমোহন দে তাঁকে কলকাতার 'মতিলাল শীল ফ্রি স্কুল'-এ ভর্তি করে দেন। বিদ্যালয়ের গণ্ডী সসম্মানে পার হওয়ার পর তিনি কলকাতার

স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'স্কটিশ চার্চ কলেজ'-এ ভর্তি হন। সুভাষচন্দ্র বসুর এক ক্লাশ নিচে পড়তেন অভয়চরণ। লেখাপড়ার মাঝেই অভয় তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা, প্রবন্ধ রচনা ও সাধুসঙ্গ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

গান্ধীজীর অনাড়ম্বর সরল জীবন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি অনুরাগ অভয়চরণকে আকৃষ্ট করেছিল। কলেজে অধ্যয়নকালেই অভয়চরণের পিতা পরিচিত এক বণিক পরিবারের কন্যা রাধারাণী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। ১৯২০ সালে তিনি কলেজে তাঁর চতুর্থ বর্ষের পাঠ শেষ করে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর প্রাপ্য ডিগ্রী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

গুরুদেবের সাথে সাক্ষাৎ

১৯২২ সালে অভয়চরণের সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর গুরুদেব মহা তেজস্বী বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন– "তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা কেন সারা পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছ না?" তিনি অভয়কে দেখেই বুঝেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে এক বিশাল সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে, যা একদিন পৃথিবীব্যাপী এক মহান বিপ্লবের সূচনা করবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অভয় তখন প্রশ্ন করেছিলেন– "আপনার চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী কে শুনবে? আমরা পরাধীন দেশের অধিবাসী; প্রথমে ভারতকে স্বাধীন হতে হবে।" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন– "কৃষ্ণভাবনামৃত ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের অপেক্ষা করে না, আর তা কোনো শাসকের ওপর নির্ভরশীলও নয়।" অভয় এর আগে কখনো এত সহজ অথচ নির্ভীকভাবে কাউকে বৈষ্ণব দর্শন বিশ্লেষণ করতে শোনেননি।

১৯৩৫-এর নভেম্বরে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে অভয়চরণের সঙ্গে তাঁর গুরুমহারাজের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। তিনি অভয়কে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন– "আমার কিছু বই প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। যদি তুমি কোনোদিন অর্থ সংগ্রহ করতে পারো, পারমার্থিক বই ছাপিও"। কথাগুলো অভয়ের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

গ্রন্থ রচনা

১৯৩৯ সালে অভয়চরণের প্রথম গ্রন্থ "গীতোপনিষদের সূচনা" তাঁর গুরুভ্রাতাদের স্বীকৃতি লাভ করে; তাঁরা অভয়কে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। সে সময় ভারতের নির্মল আকাশে ঘনিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ। যুদ্ধপীড়িত নাগরিকদের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের এক বিশেষ বার্তা প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন অভয়চরণ।

তিনি একাই একটি পত্রিকা প্রকাশনার কাজে লেগে গেলেন। তা ছিল ইংরেজিতে, কারণ তাঁর বার্তা ছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তিনি তার নাম দিলেন 'ব্যাক টু গডহেড'। তাঁর আত্মবিশ্বাসও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, তাই যুদ্ধের সময় ধ্বংস আর মৃত্যুর মধ্যেও তিনি তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

তিনি লেখালেখি করে কালাতিপাত করেছিলেন এবং যাদের কাছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী প্রচার করেছিলেন, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। মুদ্রকের কাছ থেকে ছাপা পত্রিকাগুলো নিয়ে তিনি সেগুলো বিতরণের জন্য শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। একটি চায়ের দোকানের কাছে তিনি সেগুলো নিয়ে বসতেন; কেউ যখন তাঁর কাছে এসে বসত, তিনি তাকে সে পত্রিকা কেনার জন্য অনুরোধ করতেন।

দিল্লীতে 'ব্যাক টু গডহেড' ছাপাবার এবং বিক্রির জন্য অভয়চরণ স্থির করেছিলেন যে, তিনি নয়া দিল্লীর আশি মাইল দক্ষিণে পবিত্র বৃন্দাবন ধামে থাকবেন এবং বৃন্দাবনের শান্ত, আধ্যাত্মিক পরিবেশে থেকে তিনি তাঁর রচনার কাজ চালিয়ে যাবেন।

একদিন নিঃস্ব এবং অসহায় অভয়চরণ 'বৃন্দাবনে ভজন নামে একটি বাংলা কবিতা লিখেছিলেন। তার কতগুলো পঙক্তি খুবই মর্মস্পর্শী। যেমন–

অর্থহীন দেখি মোরে ছেড়েছে সবাই।
কুটুম্ব, আত্মীয় আর বন্ধুজন ভাই ॥
দুঃখ হয় হাসি পায়, একা বসে হাসি।
মায়ার সংসার এই কাকে ভালবাসি?

বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদ

বৃন্দাবনে যমুনার তীরে বংশী গোপালজীর মন্দিরে তিনি খুব স্বল্প ভাড়ায় সাধারণ একটি ঘর নিয়েছিলেন, আর বৃন্দাবনেই তিনি এক বৈশিষ্টপূর্ণ জীবন শুরু করেছিলেন। এক রাতে অভয়চরণ সেই স্বপ্নটি দেখলেন যা পূর্বে গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থানকালে কয়েকবার তিনি দেখেছিলেন। স্বপ্নে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে তিনি তাঁকে জানতেন– সরাসরি পারমার্থিক জগৎ থেকে আগত সুপুরুষ সুপণ্ডিত এক সন্ন্যাসী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এসেছিলেন। তিনি এসে অভয়চরণারবিন্দ প্রভুকে বলেছিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। বারবার তিনি তাঁকে ডেকেছিলেন। তিনি তাঁকে সন্ন্যাস নেয়ার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন– "এসো, সন্ন্যাস গ্রহণ করো।" অভয়চরণ চমকে জেগে উঠলেন। এ স্বপ্নটিকে তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদেশ বলে মনে করেছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মথুরার কেশবজী গৌড়ীয় মঠে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী।

বৃন্দাবনে কিছুকাল থাকার পর তিনি পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী বৃন্দাবন এবং নয়া দিল্লী উভয় জায়গাতেই কাজ করতে পারছিলেন। কিছু সাহায্য সংগ্রহ করে তিনি পূর্ণোদ্যমে 'ব্যাক টু গডহেড' প্রকাশ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজি অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা শুরু করেছিলেন।

তারপর তিনি বৃন্দাবনে রাধাদামোদর মন্দিরে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রী রাধাদামোদর মন্দিরেই তিনি ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ধারণা লাভ করেন। সেখানে তিনি একান্তে ভজন করতেন এবং কৃষ্ণভাবনা প্রচারের জন্য আচার্যদের কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর দর্শন লাভ

বৃন্দাবনে রাধা দামোদর মন্দিরে অবস্থানকালে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামীর দর্শন লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সচিব শ্রীহরিসৌরি প্রভুর সাথে তৎকালীন রাধাদামোদর মন্দিরের গোবিন্দচাঁদ নামে এক ভক্তের সাক্ষাৎকারে নিম্নোক্ত ঘটনার কথা জানা যায় :

গোবিন্দ চাঁদ তখন তরুণ ছিলেন। শ্রীশ্রী রাধা দামোদর মন্দিরের যে ঘরে শ্রীল প্রভুপাদ থাকতেন সে ঘরের বারান্দায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই জপ করতেন। একদিন তিনি দেখতে পান একটি ছেলে মন্দিরের প্রণামী বক্স থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাকে টাকা চুরির কারণ জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি বলে, তার মিষ্টি খেতে ভালো লাগে, তাই সে মিষ্টি কেনার জন্য সেখান থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেন– "আমি যদি তোমায় মিষ্টি বানিয়ে দিই তবে কী তুমি আবার চুরি করবে?" তখন ছেলেটি চুরি না করতে রাজি হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন শ্রীল প্রভুপাদ ছেলেটিকে মিষ্টি (প্যারা) তৈরি করে খাওয়াতেন। তখন থেকে ছেলেটি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত হয়ে যায়।

একদিন সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর কক্ষে শুয়ে আছেন, তাঁর শরীর ততটা ভালো ছিল না। ছেলেটি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করে, তাঁর কিছু লাগবে কি না। প্রভুপাদ বলেন, কিছু লাগবে না।

সে রাতে রাধাদামোদর মন্দিরের প্রধান দরজা লাগানো হয়ে গেছে। সাধারণত মন্দির লাগানোর পর কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। যে ঘরগুলো মন্দিরের ভেতরে ছিল, সেখানকার সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন ছেলেটি (গোরাচাঁদ গোস্বামী) শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষ থেকে শ্রীল প্রভুপাদ ছাড়াও অপরিচিত আরেকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। তখন ছেলেটি দেখলো শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষের দরজার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

পরদিন ছেলেটি শ্রীল প্রভুপাদের কাছে সে রাতের ঘটনা সম্বন্ধে জানতে চাইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, "গতরাতে শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃপা করে আমাকে দর্শন দিয়েছেন।" শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের কী কথা হয়েছিল জানতে চাইলে শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে, রূপ গোস্বামী তাঁকে বলেছেন–

"তুমি কোনো চিন্তা করো না। পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করার জন্য এগিয়ে যাও। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী তথা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিশ্বব্যাপী প্রচার করো। আমি কথা দিচ্ছি তুমি অবশ্যই সফল হবে; কারণ, আমি সর্বদাই তোমার পাশে থাকব।"

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের এ আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে আরো উৎসাহের সাথে নিযুক্ত হলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক দিগভ্রান্ত সমাজে শ্রীমদ্ভাগবত এক বিপ্লব বয়ে আনবে। ক্রমে ক্রমে চাঁদা ও দান সংগ্রহ করে নিজের খরচেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেছিলেন। টাকার অভাব সত্ত্বেও শুধু তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে দুবছরেরও কম সময়ে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তৃতীয় খণ্ডটি ছাপা হবার পর তাঁর মনে হয়েছিল– তিনি এখন

যাবার জন্য প্রস্তুত; যদিও তিনি তখন প্রায় কপর্দকহীন এবং তাঁর বয়স তখন উনসত্তর বছর, তথাপি তখনই তিনি যাত্রা করতে চেয়েছিলেন।

আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা

গোলোকবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্র কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে–

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের প্রতিটি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। তারপর শত শত বছর কেটে গেছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে, কবে এবং কীভাবে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হবে।

তারপর ১৯৬৫ সালের ১৩ আগস্ট, বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক এবং সন্ন্যাসী শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর ঊনসত্তরতম জন্ম দিবসের কয়েকদিন পূর্বে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করার লক্ষ্যে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানির কাছ থেকে সৌজন্য হিসেবে একটি টিকিট সংগ্রহ করে তিনি 'জলদূত' নামক একটি মালবাহী জাহাজের একমাত্র যাত্রীরূপে আরোহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি স্যুটকেস, একটি ছাতা, কিছু শুকনো চিড়া, প্রায় সাত ডলার মূল্যের ভারতীয় মুদ্রা এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থপূর্ণ তোরঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ

যাত্রাপথে ত্রয়োদশ দিনে জলদূত জাহাজ যখন আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তাল সমুদ্র পার হচ্ছিল, তখন দু'দিনে দুবার শ্রীল প্রভুপাদের হার্ট এ্যাটাক হয়। তিনি ভাবছিলেন আবার যদি এমন হয় তবে তা আর তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। রাতে স্বপ্নে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ একটি নৌকা বাইছেন এবং তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর কাছে আসতে বলছেন। প্রভুপাদ উপলব্ধি করলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করছেন এবং সেই যাত্রায় আর সে রকম 'হার্ট-এ্যাটাক' হয়নি। প্রভুপাদ তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন :

"আটলান্টিক যদি তার স্বাভাবিক রূপ ধারণ করতো, তাহলে হয়তো আর বেঁচে থাকতাম না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন জাহাজটির কাণ্ডারি।

সাঁইত্রিশ দিন পর যখন জলদূত নিউইয়র্ক বন্দরে গিয়ে পৌঁছায়, তখন ভক্তিবেদান্ত স্বামী ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। পরিচিত কারো সন্ধান ছাড়া, কারো প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া, নিতান্তই অল্প কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী নিয়ে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে তেমন টাকা-পয়সা ছিল না, কোনো বন্ধু-বান্ধব বা অনুগামী ছিল না, ছিল না যৌবন, ভালো স্বাস্থ্য, এমনকি তাঁর সুদূরপ্রসারী যে লক্ষ্য– বেদের পারমার্থিক জ্ঞান কীভাবে পাশ্চাত্যে বিতরণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

আমেরিকায় পৌঁছানোর ঠিক পরেই বাংলা ভাষায় রচিত একটি কবিতায় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও তাঁর গুরুদেব প্রদত্ত বিশেষ উপদেশ– ইংরেজিভাষী জগতে কৃষ্ণভাবনার বাণী প্রচার করার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছিলেন–

কীভাবে বোঝালে তারা বোঝে সেই রস। এত [illegible] করো প্রভু করি নিজ বশ ॥
রজস্তমো হ'তে তবে পাইবে নিস্তার। হৃদয়ের অভদ্র সব ঘুচিবে তাহার ॥
তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার। বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার ॥
কী করে বুঝাবো কথা বর সেই চাহি। ক্ষুদ্র আমি দীন হীন কোনো শক্তি নাহি ॥

১৯৬৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বিস্ময়কর সাফল্য

ঠিক বারো বছর পর, ১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী ৮২ বছর বয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। সেই বারো বছরের মধ্যে কী ঘটেছিল? এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও বৃদ্ধ অবস্থায় শুরু করে, যখন প্রায় সকলেই কর্মজীবন থেকে অবসরের কথা চিন্তা করে; কী এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন! নিঃসন্দেহে তা অভাবনীয় ও অনবদ্য।

এ এক অলৌকিক ঘটনা। তা না হলে একজন বৃদ্ধ, যাঁর সম্বল ছিল কেবল বিক্রি করার জন্য কয়েকটিমাত্র গ্রন্থ এবং ছিল না অন্ন-বস্ত্রের কোনো সংস্থান, তবুও কীভাবে এরকম জড়বাদী এক সমাজকে এভাবে ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন? সংক্ষেপে বলতে গেলে, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পৃথিবীর প্রতিটি প্রধান শহরে কৃষ্ণভাবনার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং হাজার হাজার উৎসর্গপ্রাণ সদস্য সমন্বিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করেছিলেন যার নাম দেয়া হয় "আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ"। তিনি ছ'টি মহাদেশ জুড়ে বিশাল ও অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যমণ্ডিত ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান সংস্থার সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে পথপ্রদর্শনের জন্য সমগ্র পৃথিবী ১৪বার প্রদক্ষিণ করেছিলেন। ৭০ বছর থেকে শুরু করে ৮২ বছর পর্যন্ত এ বিশাল কার্য সম্পাদন করার পাশাপাশি শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা করে ৬০ খণ্ডে ৬৪টি ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, যার কোটি কোটি কপি সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সভায় হাজার হাজার ভাষণ প্রদান করেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার পত্র প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর অনুগামী, গুণগ্রাহী ও সমালোচকদের সঙ্গে হাজার হাজার আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন। ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান স্বীকৃতি দিয়েছেন এমন বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বারো বছরে শ্রীল প্রভুপাদ কীভাবে এ বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলেন, সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী এ ক্ষুদ্র পরিসরে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবুও তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা এবং সাফল্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ তথ্য এখানে প্রদান করা হলো।

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছানোর পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভগবৎ-চেতনাময় সংঘ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথম বছর একাকী তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন, যখন যেখানে সুযোগ পেতেন ভাষণ দিতেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর শিক্ষার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকে।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক শহরের লোয়ার ইস্ট সাইড-এ অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত দোকান ঘরে থেকে যখন তিনি একাকী তাঁর প্রচারকার্য সম্পাদন করেছিলেন, তখন তিনি সারা পৃথিবীতে ভগবানের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে একটি পারমার্থিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সে সংস্থার নাম দেন "ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাস্‌নেস" বা "আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ", সংক্ষেপে "ইস্‌কন"।

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে পূর্ণরূপে যুক্ত একজন অনুগামীও ছিল না। নিরুৎসাহিত না হয়ে তিনি তাঁর সান্ধ্য ভাষণের সভায় উপস্থিত কতিপয় শ্রোতার মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক মনোনয়ন করে ইস্‌কনের প্রথম ট্রাস্টিপদে তাদের নিয়োগ করেন। সেটি ছিল তখনকার অবস্থা, আর এখন সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ৩০০টিরও অধিক মন্দির, পল্লী-সমাজ, বিদ্যালয়, বিশেষ প্রকল্প এবং লক্ষ লক্ষ অনুগামী রয়েছে যারা প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বৈদিক জ্ঞান প্রদান এবং ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি ইস্‌কন সমগ্র জগতে বিনামূল্যে পারমার্থিক খাদ্য বিতরণও করে থাকে। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহার্য বস্তু আত্মা ও মনকে পবিত্র করে, যেমনটি দর্শন এবং কীর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এভাবে জীবের ভগবৎ-চেতনা জাগরণের কাজে তা সহায়তা করে থাকে। এভাবে "ফুড ফর লাইফ" নামে পরিচিত ইস্‌কনের পারমার্থিক খাদ্য বিতরণ প্রকল্প গ্রহীতার শরীর ও আত্মার প্রভূত কল্যাণ সাধন করে চলছে।

তাঁর উপদেশ

শ্রীল প্রভুপাদ এক জায়গায় বলেছেন যে, "এ বৃদ্ধ বয়সে আমি এখানে দর্শনীয় স্থান দর্শন বা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে আসিনি। মানুষের প্রকৃত সুখ বিধান করতে পারে যে কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান, তা প্রদান করার জন্যই আমি এসেছি"।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সমস্ত অবদানের মধ্যে গ্রন্থকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, বৈদিক শাস্ত্রসমূহের অনুবাদ এবং তাৎপর্য রচনার কার্য তাঁর প্রাণস্বরূপ। ১৯৭০ সালে শ্রীল প্রভুপাদ বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশনায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' স্থাপন করেন। গত পাঁচ দশক ধরে এ সংস্থার গ্রন্থ প্রকাশনার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রীল প্রভুপাদের অন্তত একটি গ্রন্থও পড়ার সুযোগ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদান করা হলো।

এ জগতে নানা প্রকার প্রাণী রয়েছে। তার মধ্যে মনুষ্য জাতি একটি। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, মনুষ্য জীবনে এমন কতগুলো বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে যা অন্য প্রাণীদের থেকে তার পার্থক্য নিরূপণ করে। সে বিশেষ ক্ষমতাগুলো প্রকৃতপক্ষে কী? আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে। একটি সজীব বস্তুর সঙ্গে একটি নির্জীব বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয় কীভাবে? উত্তর হলো চেতনা।

কিন্তু আমাদের সেই চেতনা কী, যা পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, এমনকি বানরের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য নিরূপণ করে? এ প্রাণীগুলোও খায়, আমরাও খাই; তারা ঘুমায়, আমরাও ঘুমাই: তারা প্রজনন করে, আমরাও তাই করি; তারা আত্মরক্ষার্থে প্রচেষ্টা করে, আমরাও আত্মরক্ষা করি। এ কাজগুলো হয়তো আমরা তাদের থেকে অনেক উন্নত উপায়ে করে থাকি। কিন্তু কেবল সেটিই অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবদের থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করে না।

তাই বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ মনুষ্য জীবনে– আমরা কে? ব্রহ্মাণ্ড কী? ভগবান কী? আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড ও ভগবানের সম্পর্ক কী? সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করা উচিত। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সমন্বিত জীবনের চরম সমস্যার সমাধান লাভের জন্য আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। কুকুর-বিড়ালেরা এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত মানুষের হৃদয়ে তা অবশ্যই জাগরিত হওয়া উচিত।

কৃষ্ণভাবনামৃত কোনো সাধারণ ধর্মবিশ্বাস নয়, ব্যবহারিক বিজ্ঞান– যা প্রাচীন ভারতের বৈদিক সাহিত্যে পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদুপলব্ধির সর্বজনীন নীতির বিষয়ে অবহিত করা, যাতে তারা পারমার্থিক উপলব্ধি, ঐক্য ও শান্তি লাভের মাধ্যমে সর্বতোভাবে উপকৃত হতে পারে। বর্তমান যুগে আত্মোপলব্ধি এবং ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সর্বমঙ্গলময় ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা বলে বেদে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁর অসংখ্য নাম রয়েছে। 'কৃষ্ণ' তাঁর একটি, যার অর্থ হলো 'সর্বাকর্ষক'। তাঁর আরেকটি নাম 'রাম', অর্থাৎ 'তিনি সমস্ত আনন্দের আধারস্বরূপ'। আর 'হরে' ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে সম্বোধন করে। বেদের এ সিদ্ধান্তের অনুসরণে ইস্‌কনের সদস্যদের সর্বদাই "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" –এ মহামন্ত্র কীর্তন করতে দেখা যায়। পরম মহিমান্বিত এ কীর্তন ভগবানের দিব্য নামের শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং নিত্য সম্পর্কের স্মৃতি ধীরে ধীরে জাগরিত করে।

শ্রীল প্রভুপাদের রচনাবলি প্রধানত তিনটি গ্রন্থে আধারিত। এ তিন গ্রন্থ হলো– শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। সামগ্রিকভাবে শ্রীল প্রভুপাদের এ সাহিত্য-সম্ভার ভাগবত-ধর্ম বা ভগবদুপলব্ধির আদি বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত বিস্তৃত তথ্যসমূহে পরিপূর্ণ ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিশদ ব্যাখ্যাসহ ইংরেজিতে সেগুলোর অনুবাদ জগতের আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রীল প্রভুপাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান।

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি ভগবদুপলব্ধির সর্বজনীন বিজ্ঞান প্রদান করে

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থে বর্ণিত জ্ঞান সবাইকে ভগবদুপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম করে তোলে এবং তা ধর্মীয়, জাতীয় বা সাংস্কৃতিক পটভূমির সম্পর্ক পরিবর্তন না করেই সম্ভব হয়। ভগবানকে জানার বিজ্ঞান, তাঁর সঙ্গে জীবের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি প্রেম বর্ধিত করার যে বিজ্ঞান, তার সঙ্গে খ্রিষ্টান, হিন্দু বা ইহুদি আদি সাম্প্রদায়িক পরিচিতি বা সংকীর্ণতার কোনোই সম্পর্ক নেই। এগুলো এমন বিষয় যা বিশ্বের কোনো ধর্মেই তা অস্বীকার করতে পারে না। উপরন্তু সেগুলো হচ্ছে ধর্মের সার ও সর্বজনীন বিষয়, যার মাধ্যমে সমস্ত ধর্মের কথা বোঝা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধর্মে ভগবানের নাম বিভিন্ন হতে পারে, উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, আচার-অনুষ্ঠান এবং মতবাদ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু বিচার্য বিষয় হলো ধর্ম যাজন করার মাধ্যমে যাজক প্রকৃতপক্ষে কতটা ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করছে এবং ভগবৎ-প্রেম লাভ করছে। প্রকৃত ধর্ম হলো ভগবানকে ভালোবাসার শিক্ষা অর্জন করা। আর কীভাবে ভগবানকে ভালোবাসতে হয়, তা-ই শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থে প্রদত্ত শিক্ষার সারাংশ।

মন্দির নির্মাণ

পৃথিবীজুড়ে বৈদিক শিক্ষা প্রসারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের মুখ্য পরিকল্পনা ছিল বড় বড় মন্দির নির্মাণ। প্রতিটি কেন্দ্রে সংঘের সদস্যরা প্রত্যহ পারমার্থিক শিক্ষা প্রদান করার জন্য একত্রে পাঠের ব্যবস্থা করেন, কীর্তন করেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান বিষয়ে জনে জনে উপদেশ প্রদান করেন। কেন্দ্রগুলোতে সাপ্তাহিক উৎসব ও নিরামিষ ভোজসভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া সারা বছর ধরে বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে সারা বিশ্বে বিগ্রহ আরাধনার রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এ আন্দোলন যেহেতু ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, সেজন্য আশা করা যায় যে এ গ্রহটি একদিন অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম তথা বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হবে, সেখানে প্রতি নগরে ও গ্রামে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করবেন এবং তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করবেন।

বাংলদেশের অকৃত্রিম বন্ধু জর্জ হ্যারিসন

বাংলাদেশের দুখী মানুষের প্রতি এ হৃদয়বান মহামানবের হৃদয় কেঁদেছিল ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতার সেই কষ্টের সময় বাঙালি জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জর্জ, সঙ্গে তাঁর বিটল্‌স্ দল। বাঙালি জাতির প্রতি সেদিন যে সহমর্মিতা এবং হৃদয়ের সকল দরোজা এঁরা খুলে দিয়েছিলেন, অনন্তকাল ধরে সমগ্র বাঙালি জাতি তার জন্য কৃতজ্ঞ। শ্রীল

প্রভুপাদের অনুপ্রেরণায় নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন করে তাঁরা সেদিন সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের দুঃখ-যন্ত্রণা, দুর্দশা ও আকুতির কথা তুলে ধরেছিলেন। তার কিছুদিন পূর্বে তাঁরা শ্রীল প্রভুপাদের সান্নিধ্যে আসেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধীকে শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি

প্রিয় গান্ধীজী,

আমি আপনার একজন সচেতন বন্ধু হিসেবে লিখছি, যদি আপনি খুব কলঙ্কজনকভাবে মৃত্যুবরণ করতে না চান, তাহলে শীঘ্রই রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ না করছেন ততক্ষণ সবই মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে অন্তত একটি মাস গীতা আলোচনা করুন।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী

অভয়চরণ দাস

দিল্লী, ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭

এর একমাস পরই (৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮) আততায়ীদের গুলিতে গান্ধীজী মৃত্যুবরণ করেন।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজকে পারমার্থিক মৃত্যু থেকে রক্ষা করা। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব সমাজকে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে আলোকদান করার চেষ্টা করছে।

এটা কোনো সংকীর্ণ গোষ্ঠী নয়। যে কেউ এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। যেমন বিদ্যালয়ে যে কেউ ভর্তি হতে পারে, তা সে মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান হোক বা হিন্দু হোক তাতে কিছু যায় আসে না। কৃষ্ণভাবনামৃত এক মহান বিজ্ঞান। দুর্ভাগ্যবশত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ সে বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার কোনো বিভাগ নেই। তাই যারা মানব সমাজের হিত সাধনে আগ্রহী তাদের এ সংস্থায় আহ্বান জানানো হয় এ আন্দোলনকে জানতে এবং সহযোগিতা করতে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ধর্মের চারটি মূল স্তম্ভ– সত্য, শৌচ, দয়া ও তপ চারটি পাপকর্মের ফলে নষ্ট হয়; তা হলো আমিষ আহার, অবৈধ সঙ্গ, নেশা গ্রহণ ও দ্যূতক্রীড়া (তাস, পাশা, জুয়া)। এ সংস্থার সদস্যদের এ বিধিনিষেধগুলো পালনপূর্বক জপমালায় 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করতে হয়। আর এর মাধ্যমে প্রতিটি জীবকে যথার্থ ভক্তিমার্গে অধিষ্ঠিত করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এ সংস্থার উদ্দেশ্য।

বিশ্বব্যাপী ক্লান্তিহীন প্রচার

১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রভুপাদ বিশ্বময় ব্যাপকভাবে কৃষ্ণভাবনা প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। বিশ্বময় সংঘের মন্দিরগুলোর পরিচালনার জন্য তাঁর প্রধান শিষ্যদের নিয়ে তিনি একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করেন। ১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিমা বিশ্বে বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেন। পরবর্তীতে তা স্কুল, কলেজ পর্যায়ে প্রসারিত হয়। একই সালে শ্রীল প্রভুপাদ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত প্রফেসর কটভ্স্কির আমন্ত্রণে রাশিয়ায় যান।

তিনি রাশিয়াতে মাত্র তিনদিন ছিলেন এবং সে সময়ের মধ্যে একজনকেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর রোপিত সেই কৃষ্ণভক্তির বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আজ রুশ দেশগুলোতে হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছেন। তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচার ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধ সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর কতিপয় বিজ্ঞানী-শিষ্যকে নিয়ে ইস্কনের বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগ 'ভক্তিবেদান্ত ইন্স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মধ্যে তাঁকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও মামলার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত– এই ইস্কনের বিরোধীদের যুক্তি নাকচ করে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে একটি বৈধ ধর্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে (সূত্র খণ্ড, ১২/৫৬২-৫৬২) বর্ণনা করেছেন– পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করে বলছেন–

নাম গুণ সংকীর্তন বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আমি নিজ প্রেমভক্তি ॥
এই মতে কলি পাপ করিবে সংহার।
সবে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥
এবে নাম সংকীর্তন তীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া।
অন্তর অসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূরদেশে যায়।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গঙ্গা দেবীর সাথে এক কথোপকথনে কৃষ্ণ বলেছেন– "কলিযুগের ৫০০০ বছর অতিক্রান্ত হলে তাঁর এক মন্ত্র উপাসক আবির্ভূত হয়ে ভগবানের দিব্য নাম (হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র) কেবল ভারতভূমিতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রচার করবেন। এ দিব্য নাম কীর্তনের ফলে বিশ্ববাসী হরিভক্তে পরিণত হয়ে ভগবনের সেবায় যুক্ত হবে। এ সকল শুদ্ধভক্ত বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং নদীসমূহে ভ্রমণ করে সে সকল তীর্থকে পবিত্র করবে এবং যারাই তাঁদের সংস্পর্শে আসবে তাঁরাও সকলকে পবিত্র করবে।"

১৮০০ সনে প্রকাশিত সজ্জন তোষণী পত্রিকায় 'নিত্যধর্ম সূর্যোদয়' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন– "এবম্ভূত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম সংকীর্তনরূপ পরম ধর্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে।

আহা! যেদিন ইংল্যান্ডে, প্রান্সে, রাশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্বক হরিনাম কীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন। সে দিন কবে হইবে! আহা যেদিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক থেকে জয় শচীনন্দন কী জয়' এইরূপ ধ্বনি করতে প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন সেদিন কবে হইবে।"

চৈতন্যমঙ্গল, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীতে শ্রীল প্রভুপাদ এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর দ্বারা প্রচারিত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কথাই নির্দেশ করছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এ সেনাপতি ভক্তই সমগ্র বিশ্বে বর্তমান এই পারমার্থিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন।

তিরোধান

১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে শ্রীধাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণবলরাম মন্দিরে দেহরক্ষা করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আগে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করেন। জগতের যে কল্যাণ সাধন করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আজ তা সম্পূর্ণ হয়েছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গম্ভীর, শান্ত, সমাহিত ছিলেন এবং শিষ্যদের কৃষ্ণোপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রী ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শাখাবিস্তার
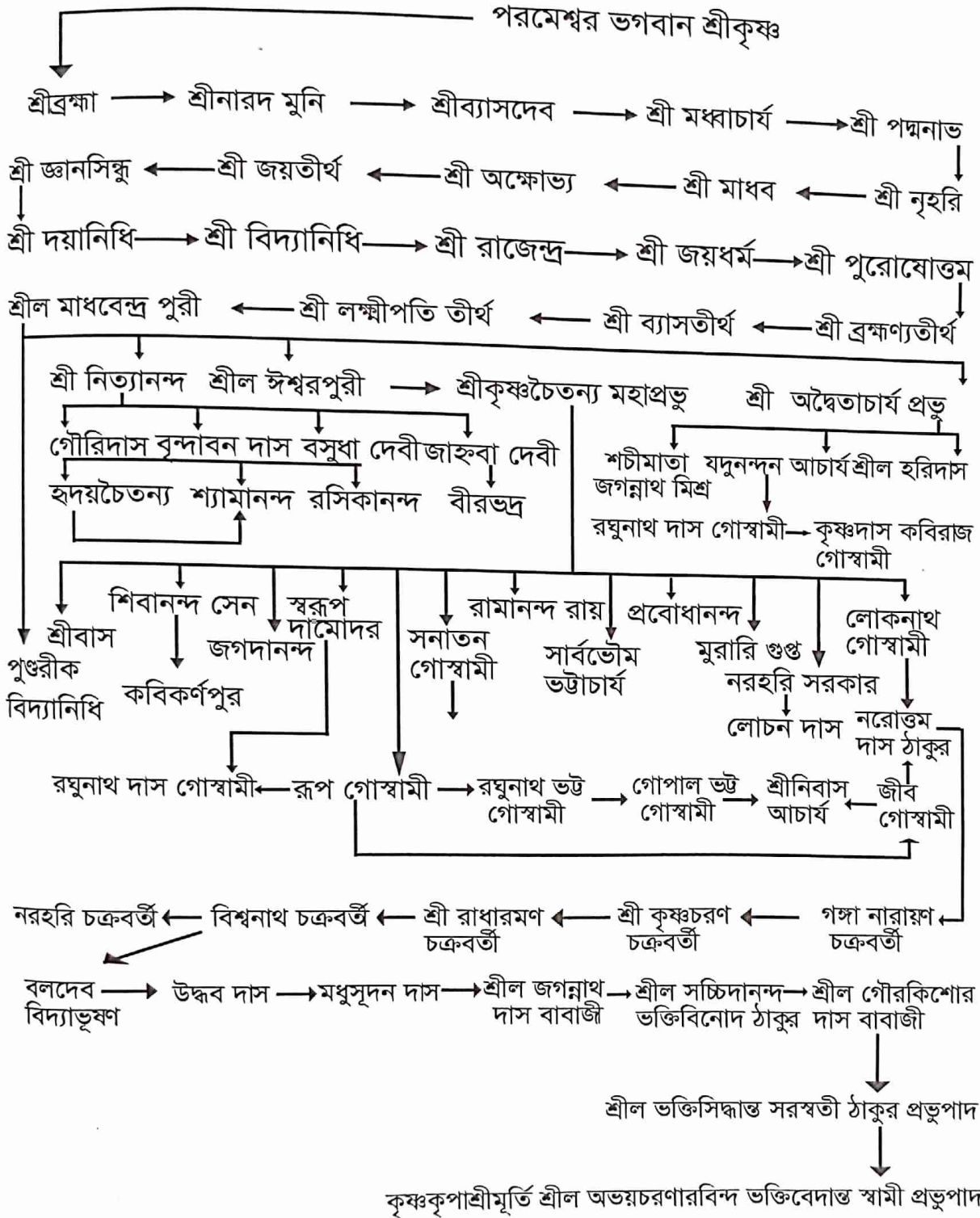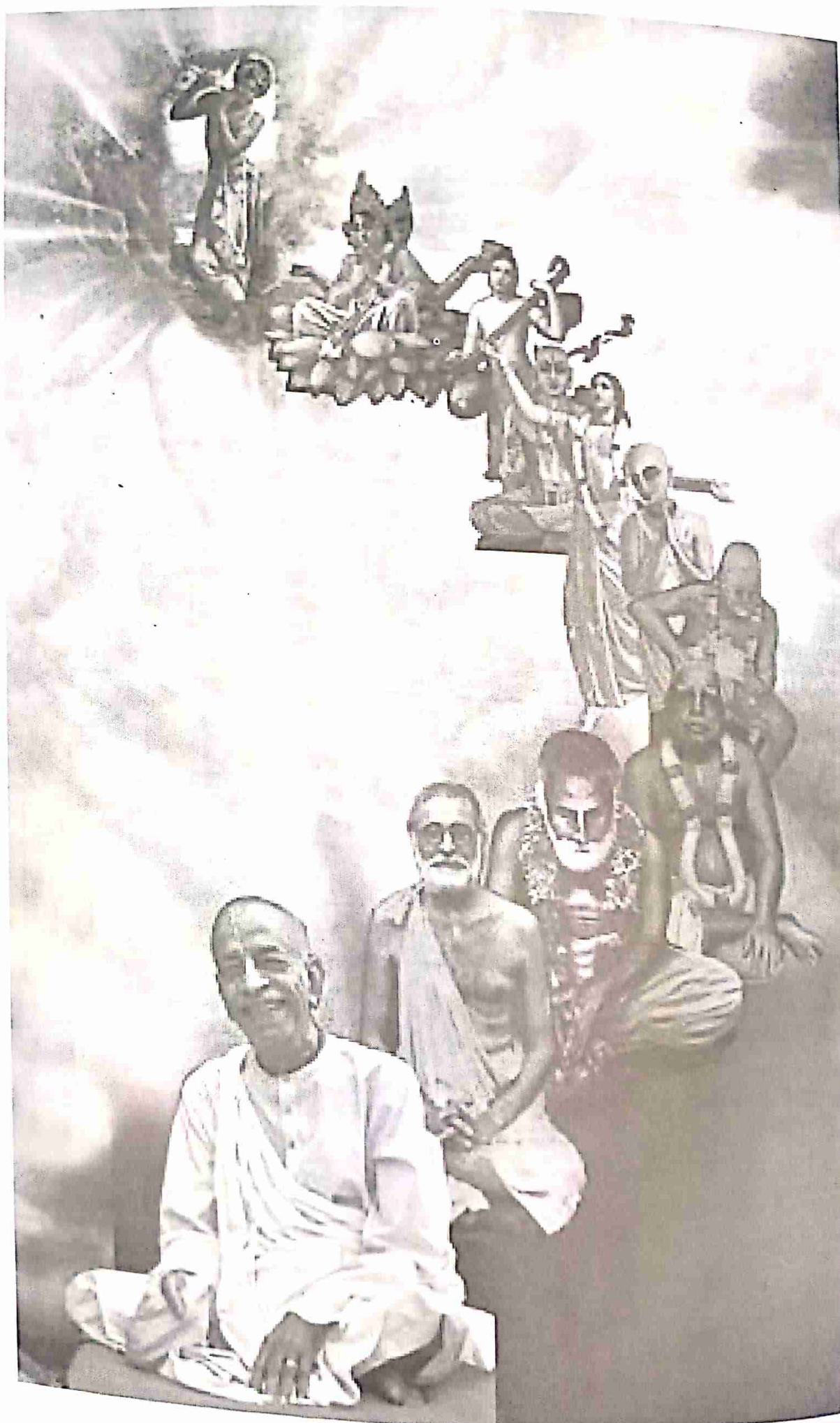
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে

পরম্পরা ধারায় আগত শিক্ষা প্রদান করাই গুরু-পরম্পরার উদ্দেশ্য। অন্যথায় গুরু-পরম্পরা কেবল একটি শারীরিক পরম্পরা বলে গণ্য হবে। তখন জাত ব্রাহ্মণ, জাতগোসাইসহ বিভিন্ন অপসম্প্রদায়গুলো তাদের গুরু নামধারী ব্যবসা চালিয়ে যাবে। কারণ, বংশগতভাবে তারা একের পর এক মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে যাবে, কিন্তু তাদের মন্ত্রে কোনো ক্রিয়া হবে না। তাই গুরু নির্বাচনের পূর্বে আমাদের অবশ্যই গুরুদেবের পরম্পরা বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ